ইউক্রেনের ইতিকথা

ভাষা, জাতীয়তা, জীবন অভিজ্ঞতা

বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০২০

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড,
কলকাতা- ৭০০০৪৭

মুদ্রণ
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা,
কলকাতা- ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ
শমীন্দ্র নাথ মজুমদার

বিনিময়
১৫০ টাকা

সূচি

১.	ইউক্রেন: পথ পরিক্রমার আয়োজন	৭
২.	ধূসর প্রত্যূষ: শহর কিয়েভ, কিয়েভিয় রুস	৯
৩.	কিয়েভিয় রুস-য়ের উত্তরাধিকার	১৩
৪.	ইতিহাস নিয়ে যুদ্ধ	১৮
৫.	ইউক্রেনের ইতিহাসের ধারা: কসাক ইতিবৃত্ত	২৭
৬.	কসাক হেটমানরাজের উত্থান ও পতন	৩৫
৭.	ইউক্রেনিয় ভাষার পায়ে শৃঙ্খল	৪১
৮.	ইউক্রেনিয় জাতীয় পরিচয় নির্মাণ	৪৬
৯.	বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লব, স্বশাসনের উদ্যোগপর্ব	৫৩
১০.	অধরা স্বাধীনতা, বলশেভিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা	৬১
১১.	দমন ও দুর্ভিক্ষ	৭১
১২.	আপাত সমঝোতা	৮২
১৩.	সিঁদুরে মেঘ, পোড়া ঘর	৯২
১৪.	নিভন্ত চুল্লির আগুন	১০৭
১৫.	হোলোদোমোর: অভুক্ত রেখে গণহত্যা	১২০
১৬.	সাহিত্যের সাক্ষ্য: জনৈক কম্যুনিস্ট অ্যাকটিভিস্টের ফিরে দেখা	১৩২
১৭.	সোভিয়েত সর্বাত্মকতাবাদী শাসন	১৬২
১৮.	শিল্পায়ন-নগরায়ন	১৭২
১৯.	জনৈক রুশ শ্রমিকের দুটি কবিতা	১৮০
২০.	হিটলার-স্তালিন সন্ধি, সোভিয়েত সাম্রাজ্য বিস্তার	১৮৫
২১.	হিটলারের দখলে ইউক্রেন: নরক দর্শন পুনর্বার	১৯০
২২.	সোভিয়েত শাসনের প্রত্যাবর্তন	২০৩
২৩.	উৎপাদন-অতিকথা	২২২
২৪.	স্তালিনের মৃত্যু, অতঃপর	২২৫

২৫. ভয়ংকর চেরনোবিল ২৩৬
২৬. জাতীয় আন্দোলনে জোয়ারের টান ২৪১
২৭. পাড় ভাঙার শব্দ ২৫১
২৮. ইউক্রেনের স্বাধীনতা ঘোষণা ২৫৮
২৯. লাল জামা গায়, নীল-হলুদ জামা গায় ২৬৬
৩০. কমলা বিপ্লব ২৮২

ছবির মালা ২৯০ ও ২৯১ পৃষ্ঠার মাঝে
ব্যবহৃত বইয়ের তালিকা ২৯১
নির্ঘণ্ট ২৯৪

অচিন মানুষ, সে ডোবে কৃষ্ণসাগরে
দয়া চায় হেঁকে, কারও কানে না পৌঁছয় তা

—কৃষ্ণসাগরে ঝড় (প্রচলিত ইউক্রেনিয় লোকগান)

সবকিছু বহমান, সব বদলে যায়। একই জেলখানার ট্রেনে দুবার সওয়ার হওয়া যায় না।

—ভাসিলি গ্রসমান, এভরিথিঙ ফ্লোজ

ইউক্রেন ও তার পড়শি দেশ

১

ইউক্রেন: পথ পরিক্রমার আয়োজন

এশিয়া থেকে ইউরোপে ঢোকার মুখে কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরের দেশটি হল ইউক্রেন। নিপার নদী পূর্ব-পশ্চিম মোটামুটি দুটো সমানভাগে ভাগ করে দিয়েছে দেশটাকে। এই কৃষ্ণমৃত্তিকার সমতলভূমি ইউরোপের সবচেয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রগুলোর অন্যতম। স্তেপ তৃণাঞ্চলের মাঝে চাষের খেতে ঘেরা বহু পুরানো গ্রামগুলো ছড়িয়ে আছে। এইসব গ্রামের কৃষক, কারিগর, ভবঘুরে গায়কদের ভাষা ইউক্রেনিয় ভাষা, ভাষার পরিবার-বিভাগে যাকে স্লাভ পরিবারের ভাষা হিসেবে ধরা হয়। ধূসর অতীত কাল থেকে অতিকথা, লোককথা, গান ও লোকজ্ঞানের ধারা এই ভাষার খাত বেয়ে বহমান। আর আছে কিয়েভের মতো অতি প্রাচীন শহর। পশ্চিমদিকে আছে পর্বতাঞ্চল।

বহু রাজা ও রাষ্ট্রনায়ক এ দেশকে নিজেদের দখলে রাখতে চেয়েছে, একে টুকরো করেছে, আধিপত্য ও সন্ত্রাসে বেঁধেছে, ইউক্রেনিয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। পোল রাজতন্ত্র, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি রাজতন্ত্র ও রুশ জারতন্ত্র এক সময় এই দেশকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে। তেমনই আবার রুশ কম্যুনিস্ট শাসন ও অল্প দিনের জন্য হলেও জার্মান নাজি শাসন একে ভেঙেচুরে নিজেদের মতো করে রূপ দিতে চেয়েছে। মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে শাসকজাতির ভাষা চাপানো হয়েছে। চাপিয়ে দেওয়া দুর্ভিক্ষ গ্রামগুলোকে মৃত্যুউপত্যকায় পরিণত করেছে। তবু ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি মরেনি। নিজ মাতৃভাষা ও জাতীয় আত্মপরিচয় নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্য স্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের সংগ্রাম নিভে যায়নি। ভাষিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে অফুরান জীবনীশক্তির উৎসার বন্ধ হয়নি। ১৯৯১ সালে পৃথক রাষ্ট্রগঠন ও ২০০৪ সালের 'কমলা বিপ্লব'-য়ের মধ্য দিয়ে আবারও তা জগৎসভার নজর কেড়েছে। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকার অর্জনের এই বন্ধুর পথ পরিক্রমার ইতিহাসপথে এখন আমরা পরিক্রমা করতে চলেছি।

ইতিহাস এখন জ্ঞানের চেহারা ধরেছে। রূপকথা, লোককথা, অতিকথা বা মুখে-মুখে প্রবাহিত হওয়া পরিবর্তমান অতীতকাহিনীর মেঠো জগতের ধুলো-মাটি থেকে নিজেকে পৃথক করে যথাযথ জ্ঞানের সাজানো অট্টালিকায় বাস গেড়ে ইতিহাস এখন অতীতে 'প্রকৃত কী ঘটেছিল' সেই অপরিবর্তনীয় সত্য উচ্চারণ করার দাবিদার। ইতিহাসের মান বয়ান উৎপাদন করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র তার ছত্রছায়ায় বিবিধ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠান খুলে রেখেছে। কড়া শিক্ষকের মতো তারা চোখ রাঙিয়ে সত্য কী তা ঘোষণা করছে। কিন্তু সত্য যখন চোখ রাঙিয়ে নিজেকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চায়, তখন স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও সন্দেহ কিছু থেকে যায় বই কি। ইউক্রেনের ইতিহাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সোভিয়েত রাষ্ট্র ইউক্রেনের যে মান ইতিহাস উৎপাদন করেছিল, তাতে ছিল বেশ কিছু কৃষ্ণ গহ্বর। যেমন, ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে ইউক্রেনের গ্রামগুলোর ইতিবৃত্ত এমনই এক কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত শাসন পতনের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোপন সরকারি নথি থেকেই এক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র-সৃষ্ট মহামারীর হদিশ মেলে। সোভিয়েত ইতিহাসের সৃষ্ট কৃষ্ণগহ্বর থেকে অতীতের কিছু আলো আবার বেরিয়ে আসে। ইতিহাসের মান সত্য পাল্টে যায়। তাই ইতিহাসপথে পরিক্রমা করতে গিয়ে আমরা ওই রাষ্ট্রসৃষ্ট জ্ঞানের অট্টালিকাগুলোকে দূর থেকে সমীহ করে সন্দেহের চোখে কিছুটা এড়িয়েই চলব। পথের ধারের ধুলোমাটি ভরা পান্থনিবাসে যেখানে সাধারণ মানুষদের স্মৃতিবাহিত মৌখিক ইতিহাস কিছুটা সংরক্ষিত, গান-গীতিকাব্য-আখ্যানের অবশিষ্ট কিছুটা পড়ে আছে, আবেগ-আনন্দ-বেদনা যেখানে বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার ভান করে মুখ লুকায় না, সেইসবই প্রধানত আমাদের গন্তব্য। আর সে যাত্রার বর্ণনাকে আমরা 'সত্য ইতিহাস' নামে গরীয়ান করতেও চাই না। এ যাত্রার বর্ণনাকে বরং ইতিকথা বলা যাক। ইতিহাসের সত্য নির্ধারণকারী কোনও বিজ্ঞানীর কাজ এ নয়, এ নেহাত এক সাধারণ কথকের কথকতা।

২

ধূসর প্রত্যূষ: শহর কিয়েভ, কিয়েভিয় রুস

নিপরো নদীর ধারে শহর কিয়েভ। ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান শহর। ইউরোপের প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইউক্রেনিয় লোককথায় এই শহরের উৎপত্তির আখ্যান আছে। সেই আখ্যান বলে যে এ শহরের জন্ম খৃস্টাব্দ পঞ্চম শতকে। তিন ভাই ও এক বোন হানাদারদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে পালাতে নিপরো নদীর ধারে এসে পৌঁছয়। কি, শ্চেক ও খোরিভ হল তিন ভাই, আর তাদের বোন লিবিড। তারা নিপরোর কোলেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় এবং এখানেই তারা জনবসতির সূচনা করে। বড়ভাইয়ের নামে তারা সেই জনবসতির নাম দিয়েছিল 'কিয়েভ'। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অবশ্য হদিশ দিয়েছে যে কিয়েভ শহরের আশেপাশে খৃস্টপূর্ব ৩০০০ নাগাদ সময়কাল থেকেই জনবসতির চিহ্ন মেলে। তাই অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলে আগেও মানুষ বাস করলেও স্লাভ জনগোষ্ঠীর মানুষ এখানে আসতে ও বাস করতে শুরু করে খৃস্টাব্দ পঞ্চম শতকে এবং তখনই কিয়েভ শহরের পত্তন হয়।

নিপরো নদীর মধ্য অববাহিকার পশ্চিমে বসবাসকারী স্লাভ জনগোষ্ঠীর মানুষের কথ্যভাষা অন্যান্য স্লাভগোষ্ঠীর ভাষা থেকে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নিয়ে আলাদা ভাষারূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতক থেকে এগারো শতকের মাঝামাঝি অবধি সময়কালের মধ্যে। ভাষাবিদরা এই প্রাচীন ভাষার নাম দিয়েছেন 'প্রোটো-ইউক্রেনিয় ভাষা'। এই প্রাচীন ভাষা থেকেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের মান্য ইউক্রেনিয় ভাষা গড়ে উঠেছে। এই বিবর্তনের পর্যায়কে সাধারণত তিনটে ভাগ করা হয়— পুরানো ইউক্রেনিয়, মধ্য ইউক্রেনিয় এবং আধুনিক ইউক্রেনিয়। সেই বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা কিয়েভ শহরের দিকে আবার নজর ফেরাই। কারণ, এই সময়ে কিয়েভকে ঘিরেই সেই স্লাভ জনগোষ্ঠীর জীবন আবর্তিত হয়েছিল।

কিয়েভ শহর পত্তনের প্রায় ৪০০ বছর পর খ্রিস্টিয় নবম শতকে স্লাভ জনজাতিগুলোর উপর ভাইকিং (স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশ থেকে আসা বণিক বা দস্যু, খ্রিস্টিয় অষ্টম থেকে দশম শতক অবধি এদের প্রতিপত্তির কাল) অভিজাতদের আধিপত্য নির্মাণ এক বিশেষ রাষ্ট্রের জন্ম দিল, যা 'কিয়েভিয় রুস' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক আখ্যান ও লোককথার মধ্য দিয়ে এই কিয়েভিয় রুস-য়ের কথা প্রবাদরঞ্জিত অতীত গৌরবগাথা হয়ে উঠেছে। ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কিয়েভিয় রুস-য়ের পত্তনের পরের ১০০ বছর বিভিন্ন রাজা ও রাণীর আধিপত্যবিস্তারের অভিযানের মধ্য দিয়ে কিয়েভিয় রুস-য়ের প্রতাপ ক্রমশ বাড়ছিল। যেমন, ৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাজা ওলেহ কনস্তানতিনোপল আক্রমণ করে, ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাণী ওলহা র দৌত্যে কনস্তানতিনোপল-য়ের সঙ্গে বাঁধন দৃঢ় হয়, ৯৬৫ থেকে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজা স্বিয়াতোস্লাভ খাজার জনগোষ্ঠীকে এবং ভোলগা-র বুলগেরিয় জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে পরাজিত করে। এরপর ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভোলোদিমির (মহান ভোলোদিমির নামে ইতিহাসে পরিচিত) রাজা হন। শাসনের মধ্যে আসা বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে দৃঢ়তর বন্ধনে বাঁধতে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কথিত আছে যে সেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম বাছাই করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশে সন্ধানীদল পাঠিয়েছিলেন। একটি দল গিয়েছিল ইসলাম-অবলম্বী ভোলগা বুলগেরিয়দের দেশে, একটি দল জার্মান দেশে ও আরেকটি দল গ্রিসে। ১০৪০ থেকে ১১১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কিয়েভিয় খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের দ্বারা সংকলিত রাজনৈতিক আখ্যানের বিবরণ 'চলে যাওয়া বছরগুলোর গল্প'-য় বলা হয়েছে যে গ্রিসে যাওয়া দল যখন কনস্তানতিনোপলে পৌঁছয়, তখন সেখানে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজানতিয়ামের ঘরানার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তাঁদের এতটাই মোহিত করে যে এখানেই মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করছেন বলে তাঁদের অনুভূতি হয়। তাঁরা ধর্মাচরণের এই রূপকেই সকল সেরা বলে স্থির করেন। সেই অনুযায়ী ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে নিপরো নদীর কূলে কিয়েভের সমস্ত মানুষকে রাষ্ট্র-প্রযোজিত ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন স্লাভ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় আচারকে 'বিধর্মীদের আচার' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। রাজঅনুগ্রহে জাঁকজমকের সঙ্গে খ্রিস্টান উপাসনাগৃহ ও সন্ন্যাসীদের মঠ তৈরি হয়। বাইজানতিয়াম (বা কনস্তানতিনোপল) ঘরানার খ্রিস্টান ধর্ম এভাবে উপর থেকে আরোপিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে গেলেও, জনগোষ্ঠীর আদি ধর্ম পুরো নিশ্চিহ্ন হয়েছে কি ? আজও

ইউক্রেনের গ্রামবাসীরা নানা খ্রিস্টান পরবে যে আচার পালন করেন, তার মধ্যে মিশে থাকে তাঁদের আদি ধর্মের নানা আচার।

রাজা মহান ভোলোদোমিরের খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দরবারে কিয়েভিয় রুস-য়ের মর্যাদা বাড়ল কিনা বলা অসম্ভব, কিন্তু, জাগতিক শাসনক্ষমতার ইউরোপিয় দরবারে তার মর্যাদা বাড়ল বৈকি। বাইজানতিয়াম ঘরানাকে বাছার মধ্যে হয়ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের প্রতিফলনে রঞ্জিত হওয়ার আকাঙ্খাও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা জাহিরের এই বহিরঙ্গ পেরিয়ে ভিতরে আরো অনেক কিছু ঘটতে শুরু করেছিল। স্থানীয় মানুষের কাছে ধর্মপ্রচারের জন্য লাতিন বা গ্রিক ভাষার ধর্মোপদেশের উপর নির্ভর করা যায়না, তাই কিয়েভের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা স্থানীয় ভাষায় ধর্মোপদেশ, ঈশ্বরের বাণী, প্রার্থনাগান রচনা করতে শুরু করলেন। কনস্তানতিনোপল থেকে নিয়ে আসা বহু গ্রিক ভাষার তাত্ত্বিক পুঁথিও কিয়েভের মঠের সন্ন্যাসীরা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রোটো ইউক্রেনিয় ভাষা থেকে পুরানো ইউক্রেনিয় ভাষার চেহারা গড়ে উঠল। শব্দসম্ভারে ও শৈলীতে ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

মহান ভোলোদিমিরের মৃত্যুর ২১ বছর পর কিয়েভিয় রুস-য়ের রাজা হন ইয়ারোস্লাভ, যিনি 'বুদ্ধিমান ইয়ারোস্লাভ' নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকাল ১০৩৬ থেকে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ। ইউরোপের বিভিন্ন রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইয়ারোস্লাভ কিয়েভিয় রুস-য়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও প্রভাবের বৃত্ত প্রসারিত করেছিলেন। কিয়েভ হয়ে উঠেছিল খ্রিস্টান বিশ্বে শিল্প-সংস্কৃতি-পঠনপাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাইজানটিয়ামের পূর্ব রোমান স্থাপত্যশিল্পের প্রভাবে গড়া কিয়েভের গির্জা, মঠ, প্রাসাদগুলোর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এরপর ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যের ধাপবন্দি কাঠামো ও মতবাদের টানাপোড়েনে খ্রিস্টান-বিশ্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায়— পশ্চিম ভাগটি রোম-কেন্দ্রীক লাতিন ভাষার অধীনে 'রোমান ক্যাথলিক' আর পূর্ব ভাগটি কনস্তানতিনোপল-কেন্দ্রীক গ্রিক ভাষার অধীনে 'গ্রিক অর্থোডক্স'। স্বভাবতই কিয়েভ পূর্ব ভাগে পড়ে এবং গোঁড়া গ্রিক খ্রিস্টানপন্থার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কিন্তু কিয়েভিয় রুস-য়ের গৌরবসূর্য এরপর মধ্যগগন পেরিয়ে ক্রমশ অস্তাচলে ঢলতে থাকে। ইয়ারোস্লাভের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ক্ষমতার

ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কলহ ও সংঘাত ক্রমশ রাষ্ট্রশক্তির শক্তিক্ষয় করতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে কিয়েভ ছিল পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, এখন বাণিজ্যপথের বদলের ফলে কিয়েভের সেই সুবিধা আর থাকল না। কনস্তানতিনোপল ও বাগদাদের সঙ্গে বাণিজ্যসঙ্গীর সম্পর্কও ঘুচে গেল। এই অর্থনৈতিক পতন তার রাষ্ট্রশক্তিকে আরো খর্বিত করল। এই সময়েই আঘাত হানল মঙ্গোলরা। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল হানাদার বাহিনীর আক্রমণে কিয়েভিয় রুস পর্যুদস্ত হল। কিয়েভ শহর দখল করে নিল মঙ্গোলরা। এরপর কিয়েভ প্রথমে লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রের দখলে, তারপর পোল্যান্ডের দখলে এবং অবশেষে রাশিয়ার দখলে শতকের পর শতক হৃতগৌরব অস্তিত্বযাপনে বাধ্য হবে। সেই কথায় যাওয়ার আগে অন্য এক আখ্যানে যাওয়া যাক, তা হল কিয়েভিয় রুস-য়ের উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াইয়ের এক আখ্যান।

৩

কিয়েভিয় রুস-য়ের উত্তরাধিকার

তখন ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ। রাশিয়ার দুজন ভাষাতত্ত্ববিৎ ইজমাইল স্নেজনেভস্কি এবং পিটর লাভরোভস্কি কিয়েভিয় রুস-য়ের ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভগুলোর গায়ে খোদাই করা লেখার ভাষা নিয়ে এক অভিনব মতামত পেশ করলেন। তাঁরা বললেন যে এই ভাষা ছোট রুশ ভাষার থেকে অনেক বেশি বৃহৎ রুশ ভাষার কাছাকাছি বলে তাঁদের মনে হয়েছে। তাঁদের মহলে 'ছোট রুশ' ভাষা নামে ইউক্রেনিয় ভাষাকে আর 'বৃহৎ রুশ' নামে রাশিয়ার ভাষা অর্থাৎ রুশ ভাষাকে অভিহিত করা হত। কেবল ভাষা নয়, গোটা জনগোষ্ঠীর জন্যই এহেন নাম বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ, রাশিয়ার জনগোষ্ঠীকে 'বৃহৎ রুশ' ও ইউক্রেনিয় জনগোষ্ঠীকে 'ছোট রুশ' বলা হত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে কেবল ইউক্রেনিয়দেরই নয়, বেলারুশিয়দেরও 'শ্বেত রুশ' বলা হত। এই মনোভাব থেকে এমন নামকরণ হয়েছিল যে রাশিয়ার রুশ জাতিই পূর্ব-স্লাভ জনজাতিদের মধ্যে প্রধান জাতি, ইউক্রেনিয় ও বেলারুশিয়দের মতো বাকিরা তুলনায় অপ্রধান, অবিকশিত বা পশ্চাৎপদ। সুতরাং রুশ জাতির নেতৃত্ব মেনে, রুশ জাতিকে অনুসরণ করেই সমগ্র স্লাভ ঐক্য ও বিকাশের পথ গড়ে উঠবে। স্বভাবতই এই মতবাদ রুশ জারতন্ত্রী রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের অধীনে এই সমস্ত জনজাতিদের বাঁধার পক্ষে সওয়াল করত। ধাপবন্দি কাঠামোয় রুশ জনজাতিকে সবার উপরে রেখে বাকি সব জনজাতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হেয় করে দেখার এই মতবাদের সবচেয়ে কড়াপাক নিদর্শনে রুশ ছাড়া অন্য জনজাতিদের 'সম্পূর্ণ মানুষ' বলেই মনে করা হত না— অসভ্য অবিকশিত তারা যেন মনুষ্যত্বের খণ্ডিত রূপ, 'রুশায়নের' মধ্য দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে।

এই অন্ধ আত্মম্ভরী রুশ মানসিকতার উদাহরণস্বরূপ ১৮৫০ সালেরই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাক। নিকোলাই গোগোলের জন্মদিনপালনের ঘটনা। নিকোলাই গোগোল তখন রুশ ভাষার সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত।

রাশিয়ার শহরে তাঁর বাসভবনে ব্যক্তিগত বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সেখানে তাঁর জন্মভূমি ইউক্রেন থেকে ইউক্রেনিয় কিছু বন্ধু এসেছেন, তিনজন রুশ বন্ধুও এসেছেন। এই রুশ বন্ধু তিনজন হলেন খোমিয়াকভ, সোলোভেভ এবং আকসাকভ, যাঁরা সবাই 'সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিবান' মহলের মানুষ। আকসাকভের লেখা একটা চিঠি থেকে অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায় (চিঠিটি জিপ্পিয়াস রচিত গোগোল-জীবনীর প্রথম খণ্ডে ২১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা আছে)। আকসাকভ সমবেত ইউক্রেনিয় অতিথিদের ইউক্রেনিয় বলেননি, 'ছোট রুশ'-ও বলেননি, বলেছেন 'খোখলি'। আত্মাভিমানী রুশরা বিদ্রূপার্থে ইউক্রেনিয়দের এভাবে ডাকত। এই অতিথিরা গোগোল ও তাদের নিজেদের জন্মভূমির সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা উদযাপনের জন্য ইউক্রেনিয় ভাষার কিছু প্রচলিত পল্লীগীতি গেয়েছিল। আকসাকভ তার অতি বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। আকসাকভের কানে সেই গানের কথা বাঁদরের হুপ-হুপ ডাকের মতো মনে হচ্ছিল, তাঁর চোখে গায়কদের গায়কী ও অঙ্গভঙ্গি এমন 'ঝাঁপাঝাঁপি ও চোখ-মুখ বাঁকানো' বলে বোধ হচ্ছিল যা তাঁর মনে 'অসভ্য এশিয় প্রজা'-দের তুলনা এনে দিচ্ছিল। আকসাকভ তাঁর বর্ণনা শেষ করেছেন এভাবে:

> খোমিয়াকভ, সোলোভেভ আর আমি চোখ ভরে এই জাতীয় পরিচয়ের প্রদর্শনী দেখলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন কোনও সহানুভূতি জাগল না। সোলোভেভ-য়ের মুখে ভেসে ওঠা হাসির আড়ালে বিদ্রূপ ও ঘৃণা টের পাওয়া যাচ্ছিল, খোমিয়াকোভের উদাত্ত অট্টহাস্যেও তাই— ভালো মনের উপহাস ছাড়া কিছু নয়, আর আমার সবটাই এত অদ্ভুত ও হাস্যকর মনে হচ্ছিল যেনবা কিছু চুভাস বা চেরেমিজ-য়ের অসভ্য বুনো আদিবাসীদের মধ্যে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে...।

ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই অন্ধ অসহিষ্ণুতার মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনিক পরিসরেও বহাল ছিল। ইউক্রেনিয় ভাষাকে একটি পরিপূর্ণ ভাষার মর্যাদাই দেওয়া হত না। রুশ বিদ্যাচর্চাকারী ও ছোট বড় আমলা-আধিকারিকরা মনে করত যে ইউক্রেনিয় ভাষা হল 'গ্রামীণ ছোটলোকদের মুখের ভাষা', শিক্ষা-বিদ্যাচর্চা বা জীবনের উন্নত বৃত্তি এ ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। এমনকি রুশ ভাষাবিদরাও একইরকম বলতেন, উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যায় ইউক্রেনিয় ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিদ আলেকজান্দ্রা এফিনেস্কো-র বক্তব্য:

> এ হল একটা উপভাষা (dialect), বা উপভাষা বললেও বাড়তি বলা হয়, এ নিছক অর্ধ-উপভাষা (half a dialect)। সমগ্র রুশ ভাষার এ এক আঞ্চলিক

কথ্য রূপ মাত্র। এক কথায় বললে এ হল ব্রাত্যভাষা বা নিচুবুলি (patois)। পৃথক স্বাধীন ভাষা হিসেবে অস্তিত্বের অধিকার এর নেই।

[আলেকজান্দ্রা এফিনেস্কো, ইয়ুঝনাইয়া রুস: ওচেরকি ইজলেদোভানিয়া ই জামেতকি, খণ্ড-২, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯০৫, ২১৯ পৃষ্ঠা]

পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের আধিকার হারানো এই ভাষাকে রুশ নাট্যকাররা মাঝেমধ্যে ব্যবহার করতেন গ্রামের 'অশিক্ষিত চাষাভুষো' চরিত্রের বুলি হিসেবে। গোগোল-য়ের মতো নিজ জন্মভূমির সংস্কৃতি সম্পর্কে দরদি মানুষরাও তাই রুশ জারতন্ত্রী রাষ্ট্রে উঁচু মাইনের ও উঁচু সম্মানের পদের অন্বেষণে রুশ ভাষা শেখা ও রুশ ভাষাতেই কথা বলা, লেখা ও সমস্ত কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ইউক্রেনের শহরগুলোয় অভিজাত ধনী পরিবার, সরকার-প্রশাসন, আইন-আদালত, দপ্তর-কাছারি থেকে ইউক্রেনিয় ভাষা মুছে গিয়েছিল। রুশ জার-ও বিভিন্ন সময় ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে নানা ফরমান জারি করেছিলেন। সেসব ফরমানের কথায় আমরা আবার পরে আসব। তার আগে ফিরে যাওয়া যাক দুই ভাষাতত্ত্ববিৎ স্নেজনেভস্কি এবং লাভরোভস্কি-র ১৮৫০ সালে উপস্থাপিত পূর্বোক্ত মতের প্রসঙ্গে।

ইউক্রেনিয় ভাষার পূর্বইতিহাস থেকে কিয়েভিয় রুস-য়ের কীর্তিস্তম্ভ-লিপিকে তুলে এনে রুশ ভাষার পূর্বইতিহাসে স্থাপনের এই প্রচেষ্টার পিছনে কারণ কী ? এ তো ঘুঁটেকুড়ুনি দুয়োরাণীর ঘরের ধুলোমলিন কুলুঙ্গি থেকে পট তুলে এনে সুয়োরাণীর মণিমাণিক্যখচিত উপাসনামন্দিরে স্থাপন করার মতো বিষয়। প্রবল প্রতিপত্তিশালী রুশ ভাষার এখন কিয়েভিয় রুস লিপির সঙ্গে আত্মীয়তাস্থাপনের প্রয়োজন পড়ল কেন ?

আসলে ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতিকে আধিপত্যকারী চোখে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করলেও রুশ অভিজাতবর্গের কাছে কিয়েভিয় রুস-য়ের গৌরবময় অতীতের অন্য উপযোগিতা হাজির হয়েছিল। সেই উপযোগিতা হল রুশ জাতীয়তাবাদ নির্মাণের পোক্ত ভিত্তি হিসাবে রুশ জাতির ইতিহাসের উৎসবিন্দু হিসেবে ব্যবহার। ইতিহাসের উৎসবিন্দু অতীতের গর্ভে যত সুদূরে স্থাপিত হবে এবং সেই ধূসর অতীতের গৌরবগাথা যত প্রবাদপ্রতিম হবে, জাতির মান ততই বাড়বে, মানুষ ততই গর্বের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী হতে পারবে। এই চাহিদা কীভাবে হাজির হল এক ঝলকে তা দেখে নেওয়া যাক।

ফরাসি শব্দ 'ন্যাশনালিতে ' বা ইংরেজি শব্দ 'ন্যাশনালিটি'-র সমার্থক কোনও শব্দ রুশ ভাষায় উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক অবধিও ছিলনা। বোঝা

যায় যে শব্দটির আধারে আশ্রিত ভাবনাটির সঙ্গে রুশদের পূর্বপরিচয় ছিলনা। ১৮১৯ সালে প্রিন্স ভি এ ভিয়াজেমস্কি ন্যাশনালিটি বা জাতীয়তা-র রুশ প্রতিশব্দ হিসেবে 'নারোদনোস্ত' শব্দটি প্রস্তাব করেন। বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

> 'ন্যাশনালিতে' শব্দটির অনুবাদ 'নারোদনোস্ত' করলে কেমন হয় ? পোল-রা তো এ শব্দের অনুবাদ করেছে 'নারোদোয়োস্ক'। পোলরা আমাদের মতো খুঁতখুঁতে নয়। যে শব্দ তাদের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়না, তাকে তারা চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে টেনে আনে, ব্যাস খেল খতম।
>
> [এদিতা এম বোজানোস্কা রচিত 'নিকোলাই গোগোল বিটুইন ইউক্রেনিয়ানইজম অ্যান্ড রাশিয়ান ন্যাশনালিজম' বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

তাঁর কথার রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদ রুশদের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়নি, তাকে চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে টেনে আনতে হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষ থেকে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গঠনের নতুন প্রবণতার হাত ধরে বিকশিত জাতীয়তাবাদী মতবাদ রাশিয়ার জারতন্ত্রের জমিতে রুশ আধিপত্যবাদী মতবাদের চেহারায় জারতন্ত্রী রাষ্ট্রের খুঁটি হিসেবে নির্মিত হচ্ছিল। জারের শাসন নিজ সাম্রাজ্যের ভিতর থেকেই নানা প্রতিস্পর্ধী বিক্ষোভের মুখোমুখি হচ্ছিল। ফিন, তাতার, আজেরি ও ক্রিমিয়ার মুসলমানদের মতো অ-স্লাভ জনগোষ্ঠী বা পোল ও ইউক্রেনিয়দের মতো স্লাভ জনগোষ্ঠী স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার নানা মাত্রার আকাঙ্খায় অস্থির ছিল। রুশ জাতীয়তাবাদী মতবাদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে রুশ ছাড়া অন্য সব জনজাতির জাতীয়তা অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে ও জারতন্ত্রী রাষ্ট্রকে এই জাতীয়তাবাদের রক্ষক হিসেবে খাড়া করে এই অস্থিরতা দমন বা প্রশমন করতে চাওয়া হয়েছিল। তাছাড়াও এই আধিপত্যকামী রুশ জাতীয়তাবাদকে সর্ব-স্লাভবাদ (Pan-Slavism)-য়ের মোড়কে মুড়ে আন্তর্জাতিক আধিপত্য বিস্তারের আগ্রাসী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করারও সুযোগ ছিল। এই আগ্রাসী সর্ব-স্লাভবাদের অন্যতম প্রবর্তক দানিলেভস্কি ১৮৬৯ সালে এই স্বপ্ন ফেরি করেছিলেন যে গোটা ইউরোপে পুরানো হয়ে ওঠা লাতিন-জার্মান সভ্যতার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে রুশ পৌরোহিত্যে স্লাভ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দিন এসে গেছে। এই আধিপত্য বিস্তারের অভিযানে চেক, বসনিয়, রুথেনিয়-রা অনুগামী স্লাভ ভাই হিসেবে রুশ-দের সহায় হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল।

এই মহান রুশ জাতীয়তাবাদ নির্মাণের জন্য জাতীয় ইতিহাসকেও তো অতীতে এমন গৌরবময় আধিপত্যের নিদর্শন ধারণ করতে হবে, ভবিষ্যতে যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাতীয়তাবাদীদের শিরা-ধমনী দিয়ে আগুনের স্রোত বইয়ে দিতে পারবে। স্লাভ অতীতের সুদূর ধূসরতায় কিয়েভিয় রুস তেমনই এক প্রবাদপ্রতিম বিন্দু। তাই সুয়োরাণীর তাকে চাই।

১৮৫০ সালে দুই ভাষাতত্ত্ববিৎ স্নেজনেভস্কি এবং লাভরোভস্কি-র মতজ্ঞাপনের পরেই তাই দেখা গেল রুশ বিদ্যায়তনিক মহলের ইতিহাসবিদরা এই নতুন আবিষ্কারটিকে কাজে লাগাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ পোগোদিন এই ভাষার মিলের সূত্র ধরে কিয়েভিয় রুস-য়ের উপর রুশদের একক উত্তরাধিকার দাবি করলেন। ইউক্রেনিয় ইতিহাস তার উৎসমুখ হারিয়ে মাথাকাটা কবন্ধে পরিণত হল। ইউক্রেনিয় ইতিহাসবিদদের সবাই তা মেনে নিতে পারল না। শুরু হল ইতিহাস নিয়ে লড়াই। এবার সেই লড়াইয়ের দিকেই নজর দেওয়া যাক।

৪

ইতিহাস নিয়ে যুদ্ধ

স্লেজনেভনেস্কি ও লাভরোভস্কি-র অনুমানকে প্রমাণ মেনে পোগোদিন দাবি করলেন কিয়েভিয় রুস-য়ের বাসিন্দারা বৃহৎ রুশ জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। তাহলে এখন সেখানে ছোট রুশ জনগোষ্ঠীর বাস হল কী করে ? তা ব্যাখ্যা করার জন্য পোগোদিন এক গণ-স্থানান্তরের তত্ত্ব খাড়া করলেন। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, মোঙ্গল হানায় ধ্বংস এড়াতে কিয়েভিয় রুস-য়ের বৃহৎ রুশ জনগোষ্ঠী কিয়েভ এলাকা ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অভিবাসন করে। নিপরোর ধার থেকে সরে এসে তারা ভোলগার তীরে বসতি গড়ে। তারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চর্চা এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখে। ফলে কিয়েভিয় রুস-য়ের ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোলগা পারের ভ্লাদিমির-সুজদাল রাজতন্ত্র হয়ে রুশ জারতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বহমান। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে কিয়েভ অঞ্চলের বর্তমান বাসিন্দা ছোট রুশ জনগোষ্ঠীর কোনও সম্পর্ক নেই। বৃহৎ রুশ মানুষরা কিয়েভ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনেক পরে সেই পরিত্যক্ত স্থানে পশ্চিম থেকে আসা কিছু পরিযায়ী নতুন করে মানুষের বসত গড়ে তোলে। বৃহৎ রুশদের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ এই পরিযায়ী জনগোষ্ঠীদের ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজরূপের ধারাবাহিকতাই ছোট রুশ বা শ্বেত রুশ-দের মতো অন্য স্লাভ জনগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবে অতীত গৌরবের পূর্ণকুম্ভ শরিকহীনভাবে নিজেদের করায়ত্ত করার পথ বাতলানো তত্ত্ব রুশ জারতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা মহলে সাদরে গৃহীত হয়ে মান্য ইতিহাসের রূপ নিয়ে নিল অতি দ্রুত।

রুশ ইতিহাসের গরিমা বাড়াতে ইউক্রেনিয় ইতিহাসের এই 'ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে' অবস্থা ইউক্রেনিয় বিদ্যাচর্চাকারীরা সবাই মেনে নিতে পারলেন না। ইউক্রেনিয় ভাষাতত্ত্ববিৎ ম্যাক্সিমোভিচ কিয়েভিয় রুস কীর্তিস্তম্ভলিপির বিশদ বিশ্লেষণ হাজির করলেন। তিনি দেখালেন যে

স্নেজনেভস্কি ও লাভরোভস্কি-র অনুমানের কোনও যথার্থতা নেই, সেই শিলালিপির পুরানো ইউক্রেনিয় ভাষা বিবর্তনের সূত্রে মধ্য ইউক্রেনিয় ভাষা হয়ে আধুনিক ইউক্রেনিয় ভাষার সঙ্গেই সংযুক্ত, রুশ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ফলে পোগোদিনের তত্ত্বের ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিটি নিখাদ ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। পোগোদিন এই সমালোচনা এড়িয়ে গেলেন কেবল এইটুকু বলে যে তিনি ইতিহাসবিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ নন, সুতরাং ভাষাতত্ত্বের বিশদীকরণ তাঁর কাজ নয়। অর্থাৎ তিনি ম্যাক্সিমোভিচকে জবাব দেওয়ার কাজটা রুশ ভাষাতত্ত্ববিদদের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন।

পোগোদিনের চাপানো এই দায়িত্ব স্বীকার করে এগিয়ে এলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্যাচর্চার রুশ প্রাতষ্ঠানিক পরিসরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আলেক্সেই সোবোলেভস্কি। ১৮৮০ সালে তিনি স্নেজনেভস্কি-লাভরোভস্কির সিদ্ধান্ত ও পোগোদিন-তত্ত্বের ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তি সমর্থন করে জোর সওয়াল শুরু করলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় একদল ইউক্রেনিয় ভাষাতত্ত্ববিৎ ও ইতিহাসবিৎ বিতর্কে অংশ নিলেন। বিতর্ক বেশ তীব্র রূপ ধারণ করল। ইউক্রেনিয় তার্কিকরা ভাষার প্রসঙ্গ ছাড়াও পোগোদিন-তত্ত্বের অন্তর্গত অন্যান্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ হাজির করতে শুরু করলেন। কিয়েভিয় রুস-য়ের ঐতিহাসিক আখ্যান সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ 'চলে যাওয়া বছরগুলোর গল্প'-র লেখক-সংকলক হিসেবে স্বীকৃত কিয়েভ গুহা মঠের সন্ন্যাসী নেস্টর-য়ের নামে নামাঙ্কিত 'কিয়েভ ইতিহাস সমাজ'-য়ের ১৮৮২-র সম্মেলনে উপস্থাপিত সন্দর্ভে দুপক্ষের যুক্তি ও প্রতিযুক্তি মুখোমুখি হল। এই সন্দর্ভগুলোর লিখিত রূপ ১৮৮০-র দশকের শেষে ইউক্রেনে প্রকাশিত হয় এবং বিতর্ককে আরও বিস্তৃত পরিধিতে ছড়িয়ে দিল।

যে তরুণ ইউক্রেনিয়দের মন তা নাড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হলেন মিখাইলো হ্রুসেভস্কি। তিনি তখন কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের গবেষক-ছাত্র। তাঁর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ভোলোদিমির আনতোনোভিচ ওই বিতর্কে ইউক্রেনিয়দের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্বপূর্ণ একজন ছিলেন। আনতোনোভিচের পরামর্শে হ্রুসেভস্কি তাঁর গবেষণার বিষয় করলেন কিয়েভিয় ভূমির ১১ শতক থেকে ১৪ শতকের ইতিহাস, যা পোগোদিনের গণ-অভিবাসন তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ছাত্রাবস্থায় হ্রুসেভস্কির লেখা দিনলিপি প্রায় ১০০ বছরেরও পর মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে হ্রুসেভস্কি এই বিতর্কের মূল নিয়ে চিন্তা

করছেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে ইউক্রেনিয় ঐতিহ্য রক্ষার এই বিদ্যায়তনিক আন্দোলন কোনও রুশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র নয় (যেমনটা রুশপন্থীরা অভিযোগ করত), বরং তা ইউক্রেনিয় সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিত অভিজাত বর্গের একাংশের মাতৃভূমির জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে উৎসাহের ফল। নিঃসন্দেহে এহেন উৎসাহ তরুণ হ্রুসেভস্কিকে চালিত করত। ইউক্রেনের অভিজাত পরিবারদের মতো তাঁর পরিবারেও শৈশবে তাঁকে ইউক্রেনিয় ভাষা শেখানো হয়নি, রুশ ভাষা শেখানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল রুশ শহরে রুশ ভাষামাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কিন্তু বাবা ইউক্রেনিয় ইতিহাস ও জনসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর জানার কৌতূহলকে রসদ জুগিয়ে তীব্র করে তুলেছিলেন। রুশ শহরের রুশ ভাষামাধ্যম শিক্ষার মধ্যে বাঁধা পড়েও ইউক্রেনের গ্রামের গান, লোককথা, ঐতিহাসিক আখ্যান সংগ্রহ করতেন এবং তা ভালোকরে বোঝার জন্য নিজের উদ্যোগে ইউক্রেনিয় ভাষা শেখার কাজ চালাতেন। ভাষা শেখার পাশাপাশি সেই ভাষায় বিভিন্ন চিন্তা লেখার চেষ্টা করে ভাষাব্যবহারে সড়গড় হতে চাইতেন। এই কাজ করতে গিয়ে শব্দভাণ্ডারের দীনতায় আটকে যাওয়া, আবার অনুসন্ধান ও চর্চার মধ্য দিয়ে তা পার হওয়ার নানা উদাহরণ কিশোর হ্রুসেভস্কির দিনলিপিতে ছড়িয়ে আছে। এই সময়েই তিনি ইউক্রেনিয় ভাষায় তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন:

> মানুষের মুখে কাপড় ঠেসে বেঁধে তারপর তাকে দেখিয়ে বলা হয়: 'দেখ, এ অপদার্থ কথা বলতেই পারেনা, কিছু একটা ভাবনা কথায় প্রকাশ করার জন্য সে কেবল ছটফট করে, অস্ফুটভাবে গোঙায় শুধু।' এ খুব বড় ব্যাপার হলনা। ওরা কেবল ইউক্রেনকে তার স্বাধীনতা ফেরত দিক। তাহলেই দেখতে পাবে কী চমৎকার সব ফুল ফুটিয়ে ইউক্রেনিয় সাহিত্য জগৎসভায় তার গর্বের স্থান করে নিয়েছে।

গোগোলের মতো সাহিত্যিক যে ইউক্রেনিয় ভাষাকে অবজ্ঞা করে রুশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন তা নিয়ে হ্রুসেভস্কির অনুযোগ ছিল। রুশ জারতন্ত্রের আধারে রুশ আধিপত্যবাদের শাসন সেই কিশোর চেতনায় অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে ধরা দিয়েছিল। হ্রুসেভস্কি মনে করতেন যে এই আধিপত্যবাদী রুশ প্রবণতা ইউক্রেনের ব্যাপক সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইউক্রেনের অভিজাতদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সুযোগ নিয়ে ইউক্রেনিয়দের স্বশাসনকে ছাঁটতে ছাঁটতে রুশ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ বাড়িয়ে তোলে। যে ইউক্রেনিয় অভিজাতরা সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতা ভোগের মোহে রুশ প্রবণতার দাসত্ব করে, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভও

দিনলিপির বহু জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। কেবল রুশদের অনুসরণ করার বিরুদ্ধেই তিনি ছিলেন না, একইসঙ্গে তিনি পশ্চিমের ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুসরণ করারও বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন:

> ইউরোপিয় শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে শ্রদ্ধার গদগদভাব দেখলে আমার বেশ বিরক্ত হয়। আশঙ্কা জাগে যে চলতি রীতির মতোই আবার মিথ্যা ও দুর্বল মেধার ভ্রান্ত আরাধনা দিয়ে তার মধ্যের প্রকৃত ভালো দিকগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে।

স্বাধীন স্বনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তির এই ইউক্রেন ভাষা-সংস্কৃতির অনুরাগী ইতিহাস গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ১৯০৪ সালে প্রকাশ করলেন 'রুশ ইতিহাসের প্রচলিত ছক এবং পূর্ব স্লাভদের ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ বিন্যাসের সমস্যা' নামে। রুশ বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে প্রকাশিত একটি সংকলনে তা মুদ্রিত হয়। প্রথম যে বৈশিষ্ট্য ইউক্রেন সম্পর্কিত অন্য সমস্ত লেখা থেকে তাকে পৃথক করে দিয়েছিল তা হল তার ভাষা। এ প্রবন্ধ ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা। জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনায় এই প্রথম ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ছাপা হল। শুধু বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনায় নয়, রাশিয়ার মধ্যে যে কোনও প্রকাশনাতেই জারের নির্দেশে দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনিয় ভাষা নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা, অবজ্ঞা, অবহেলার বিরুদ্ধে হ্রুসেভস্কি ও তাঁর সহযোগী ইউক্রেনিয় গবেষকদলের দীর্ঘ প্রতিবাদ, বিরোধিতা এবং ইউক্রেনিয় ভাষায় লাগাতার বিদ্যাচর্চার ধারা তৈরি করার ফলশ্রুতি হিসেবেই রুশ বিদ্যায়তনের প্রকাশনাক্ষেত্রের বেড়া ভেঙে ইউক্রেনিয় ভাষা সসম্মানে প্রবেশ করল।

তবে এই প্রবন্ধের চমৎকারিত্ব কেবল তার ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়। পোগোদিন অনুপ্রাণিত রুশ আধিপত্যবাদী ইতিহাস নির্মাণকেই হ্রুসেভস্কি এখানে 'রুশ ইতিহাসের প্রচলিত ছক' বলেছেন এবং বিশদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাষাতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক যুক্তি-প্রমাণ হাজির করে সেই ছককে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন। দেখা যাক হ্রুসেভস্কি কীভাবে তাঁর যুক্তি-প্রমাণ বিন্যাস করেছিলেন।

রুশ-আধিপত্য-পন্থী ভাষাতত্ত্ববিৎরা কিয়েভের কীর্তিস্তম্ভলিপির সঙ্গে ইউক্রেনিয় ভাষার ফারাক নিয়ে যা বলছিলেন তা ভাষাবিকাশের ঐতিহাসিক ধারাকে অবজ্ঞা করছে এবং সে কারণেই পূর্বনির্ধারিত কিছু ধারণাকে অনৈতিহাসিকভাবে উপস্থাপিত করে যাচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ্রুসেভস্কি কিয়েভিয় রুস-য়ের ভাষা থেকে ভাষাবিকাশের ধারা নানা

খাতে বয়ে কীভাবে ইউক্রেনিয় ভাষা-উপত্যকা তৈরি করেছে তার বেশ কিছু নিদর্শন আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে ১১ শতক ও তার পরবর্তী সময়ের কিয়েভিয় লিখিত সাহিত্য পূর্ব ইউক্রেনের পূর্ব স্লাভ সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেছিল। হ্রুসেভস্কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কিয়েভিয় লিখিত সাহিত্যের ধারা কেবল কিয়েভকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিলনা, বরং ইউক্রেনের আরো বিভিন্ন অঞ্চলের জনপদকে কেন্দ্র করে প্রবাহের টানাপোড়েন তৈরি করেছিল। এই প্রবাহের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষিক বৈচিত্র্য থেকে সাধারণ একটি ভাষা গড়ে উঠেছিল। এই সাধারণ ইউক্রেনিয় ভাষাটি ভাষিক চরিত্রে গ্রীস দেশের 'কোইনে (koine)'-র সঙ্গে তুলনীয়।

পোগোদিন-অনুসারীদের তত্ত্বের ঐতিহাসিক যুক্তিকে হ্রুসেভস্কি তিনটি ভাগে ভেঙে সমালোচনা করেছিলেন। প্রথম ভাগে তিনি আলোচনা করেছিলেন কিয়েভিয় রুস-য়ের মূল দুই জনজাতি পোলোনিয় ও সিভেরিয়ানিয়-দের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে তিনি বিচার করেছিলেন মোঙ্গোলদের হাতে কিয়েভের ধ্বংসের মাত্রা কতটা ছিল, বাসিন্দাদের বসতচ্যুত করার মধ্য দিয়ে গোটা কিয়েভকে জনশূন্য করে দেওয়ার মতো ছিল কিনা। আর তৃতীয় ভাগে তিনি আলোচনা করেছিলেন কিয়েভ থেকে সবার উত্তর-পূর্বে ভোলগা তীরে চলে যাওয়া ও পরবর্তীকালে অন্যত্র থেকে আসা পরিযায়ীদের দিয়ে কিয়েভে নতুন করে বসত স্থাপন হওয়ার তত্ত্ব কতটা গ্রহণযোগ্য। এই তিন ভাগে হ্রুসেভস্কির মূল বক্তব্য কী ছিল দেখা যাক।

কিয়েভিয় রুস-য়ের মূল দুই জনজাতি পোলোনিয় ও সিভেরিয়ানিয়দের রুশ-আধিপত্য-পন্থীরা প্রথমে বৃহৎ রুশ জনগোষ্ঠী বলে দাবি করেছিল। পরবর্তীকালে ইউক্রেনিয় ভাষাতত্ত্ববিৎ ও ইতিহাসবিৎ-দের প্রতিবাদের চাপে কিছুটা পিছু হটে তারা বলতে থাকে যে পোলোনিয়রা ছোট রুশ (অর্থাৎ ইউক্রেনিয়) হলেও সিভেরিয়ানিয়রা বৃহৎ রুশ। হ্রুসেভস্কি পুরাতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য সংকলন ও আলোচনা করে দেখান যে পোলোনিয় ও সিভেরিয়ানিয়-দের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না, অপরদিকে, বৃহৎ রুশ-দের উৎস হিসেবে সর্বস্বীকৃত সমকালীন ভিয়াতিচিয় জনজাতির সঙ্গে সিভেরিয়ানিয়দের বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মৃতকে কবর দেওয়ার আচার-অনুষ্ঠান পোলোনিয় ও সিভেরিয়ানিয়দের মধ্যে একই রকম, অথচ সিভেরিয়ানিয় ও ভিয়াতিচিয়-দের মধ্যে তা বড় মাপেই আলাদা।

সিভেরিয়ানিয়দের আদি বসত এলাকা দেসনা অঞ্চলে প্রাচীন ইউক্রেনিয় উপভাষার অস্তিত্বের নিদর্শন তুলে এনেও সিভেরিয়ানিয়দের ইউক্রেনিয় পরিচয়ের পক্ষে প্রমাণ হাজির করেছিলেন হ্রুসেভস্কি। এরকম আরও নানা ভাবে হ্রুসেভস্কি প্রায় তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে সিভেরিয়ানিয়রা পোলোনিয়দের মতোই ছোট রুশ, অর্থাৎ, ইউক্রেনিয় চরিত্রের জনজাতি। তার মধ্য দিয়ে কিয়েভিয় রুস-য়ের মানুষরা যে ইউক্রেনিয় জনজাতির মানুষ ছিলেন তা-ই সাব্যস্ত হয়।

কিয়েভিয় রুস-য়ের বাসিন্দাদের বৃহৎ রুশ জনজাতি বলে দাবি করাকে এভাবে নস্যাৎ করে হ্রুসেভস্কি আলোচনায় ঢুকেছিলেন রুশ-আধিপত্য-পন্থীদের পরবর্তী তত্ত্ব, অর্থাৎ, মোঙ্গল হানায় কিয়েভ ধ্বংস ও সমগ্র বাসিন্দাদের উত্তর-পূর্বে স্থানান্তরের তত্ত্ব নিয়ে। এ বিষয়ে অবশ্য হ্রুসেভস্কির অগ্রজ গবেষক মিখাইলোভস্কি ও আনতোনোভিচ পূর্বেই নির্ধারক সমালোচনা হাজির করেছিলেন। পোগোদিন তাঁর ধ্বংস-তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে দুটি ঐতিহাসিক নথি হাজির করেছিলেন। তার প্রথমটি হল 'সুজদাল আখ্যান'-য়ের লেখকের দ্বারা উপস্থাপিত ইউক্রেনিয় অঞ্চল ধ্বংসের বিবরণ। আর দ্বিতীয়টি হল পোপের দূত হিসেবে ১২৪৫ থেকে ১২৪৭ সালের মধ্যে ইউক্রেনে আসা জিওভানি দা পিয়াঁ দেল কারপিনি-র রেখে যাওয়া টীকা-টিপ্পনী। ম্যাক্সিমোভিচ এই ঐতিহাসিক নথিগুলো পুনর্বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে সেগুলোয় কোথাও কিয়েভিয় রুস থেকে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে বসতি স্থানান্তরের কথা বলা হয়নি, মোঙ্গল বাহিনীর হানাপথে অন্যান্য অঞ্চল যতটা ধ্বংস হয়েছিল কিয়েভে তার চেয়ে বেশি কোনও মাত্রায় ধ্বংসের কথা বলা হয়নি, এবং তার থেকে এমন কোনও সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় না যে ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া জনপদগুলো সেখানকার বাসিন্দারা আবারও গড়ে তুলে সেখানেই বসত চালিয়ে যায়নি।

ম্যাক্সিমোভিচের এই সমালোচনাকে আনতোনোভিচ আরও বিকশিত করেন ১৮৮২ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল ১৪ থেকে ১৬ শতকের কিয়েভের ইতিহাস। বিভিন্ন পুরানো ঐতিহাসিক আখ্যানে হাজির মোঙ্গল হানার বিবরণ তিনি পুনর্বিচার করেন। হাইপেশিয় ও লরেনসিয় হাতে-লেখা পুঁথি, ভোকরেসেনস্ক ও হুস্তিনিয়া ঘটনাপঞ্জী এবং ১৬৭৪ সালে কিয়েভের মঠের সন্ন্যাসীদের সংকলন করা 'সিনপসিস' খুঁটিয়ে বিচার করে তিনি দেখান যে মোঙ্গল হানায় ধ্বংসের বিবরণ প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়েছে, কিন্তু তবু কোথাও এমন বলা হয়নি যে সেই হানায় কোনও জনপদ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে গোটা

বসতির স্থানান্তর হয়েছে। বরং সর্বত্রই হানার আগে ও পরে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতার কথা পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঐতিহাসিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে কিয়েভের রাজনৈতিক গুরুত্ব পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু পোগোদিন-কল্পিত গণ বসবাস স্থানান্তরের কণামাত্র ইঙ্গিতও পাওয়া যায়না।

আনতোনোভিচের ছাত্র ফ্রসেভিচ ১৮৯১ সালে কিয়েভিয় ভূমির ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গবেষণাগ্রন্থে আনতোনোভিচের উপরোক্ত বক্তব্যকে ঐতিহাসিক তথ্যের আরো বিশদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হাজির করার পাশাপাশি ফ্রসেভস্কি একটি নতুন প্রসারণও হাজির করেন। মঙ্গোলিয় হানার ফলে কিয়েভের রাজনৈতিক গুরুত্বের পতন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রসেভস্কি বলেন যে মঙ্গোল হানা কিয়েভিয় রুস-য়ের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দেয়, যার ফলে এই অঞ্চলের প্রধান জনপদ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের আখ্যান-রচনাকারীরা রাষ্ট্রকেন্দ্র কিয়েভকে ঘিরে আখ্যান তৈরির উৎসাহ হারায়। এর ফলে কিয়েভ-কেন্দ্রীক ঐতিহাসিক আখ্যান বিরল হয়ে ওঠে। কিয়েভ-কেন্দ্রীক আখ্যানের ধারা এভাবে শুকিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিকদের সামনে ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা হাজির করেছে বটে, কিন্তু তা যদি কাউকে পোগোদিন-কল্পিত সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়, তবে তা নেহাতই ভ্রান্তিবিলাস হবে।

মঙ্গোলিয় হানার ফলে অঞ্চলের বাসিন্দাদের রাজনৈতিক-সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের এই দিককে বিবেচনায় নিয়ে ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ বোঝার চেষ্টায় ফ্রসেভস্কি গুরুত্ব দেন। সাময়িকভাবে মোঙ্গলদের দখলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কিয়েভিয় রুস অঞ্চলের শহর ও জনপদগুলো কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের শাসনকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মোঙ্গল হানার ঝড় স্তিমিত হওয়ার পর এই জনপদগুলোয় বিভিন্ন ধরনের গণশাসন বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী জন্ম নেয়। কোনও রাজা-রাণী-রাজপরিবারের প্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী স্বশাসনের বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। জনজীবনের উপর মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। জনজীবন প্রায় মুক্তভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ অস্তিত্বের নতুন পরিসর গড়ে তুলেছিল। বোহ অঞ্চলের উপরদিকে বোলোখিভ ভূমির মানুষদের গোষ্ঠীসমাজকে ফ্রসেভস্কি এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

১৯০৪ সালের 'রুশ ইতিহাসের প্রচলিত ছক এবং পূর্ব স্লাভদের ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ বিন্যাসের সমস্যা' প্রবন্ধে ফ্রসেভস্কি এই সমস্ত যুক্তিবিন্যাসই সংহত

রূপে হাজির করেন। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনি মোঙ্গল হানায় ধ্বংস ও বসবাস স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে কিয়েভ অঞ্চলে কিয়েভিয় রুস সভ্যতার সমাপ্তির অতিকথাকে ধ্বংস করেন, অন্যদিকে তেমনি ইউক্রেনিয় অঞ্চলে এই সভ্যতার ধারাপ্রবাহ অন্বেষণেরও পথ খুলে দেন। আরেকটি দিকও নজর করা যায়। পোগোদিন যেখানে কিয়েভিয় রুস-য়ের ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোলগা পারের ভ্লাদিমির-সুজদাল রাজতন্ত্র হয়ে রুশ জারতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বহমান বলে দেখাতে চেয়েছেন, হ্রুসেভস্কি সেখানে সেই ঐতিহ্যকে বাঁক নিয়ে গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বশাসনের পরিসরের মধ্য দিয়ে বহমান হতে দেখেছেন। অর্থাৎ, পোগোদিন ও রুশ-আধিপত্য-পন্থীদের যাত্রা আরও কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনের দিকে আর হ্রুসেভস্কির যাত্রা বিকেন্দ্রীভূত স্বশাসনের দিকে। যেভাবে হ্রুসেভস্কি তাঁর বিখ্যাত 'ইউক্রেনের ইতিহাস' মহাগ্রন্থে পরবর্তীকালের ইউক্রেনিয় কসাকদের ইতিহাস তুলে আনবেন তা তাঁর এই যাত্রা-অভিমুখকে আরও স্পষ্ট করবে। সে বিষয়ে আমরা একটু পরে যাব। তার আগে দেখে নেওয়া যাক তৃতীয় ভাগে কিয়েভ থেকে সব অধিবাসীর উত্তর-পূর্বে ভোলগা তীরে চলে যাওয়া ও পরবর্তীকালে অন্যত্র থেকে আসা পরিযায়ীদের দিয়ে কিয়েভে নতুন করে বসত স্থাপন হওয়ার তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কী আলোচনা করেছিলেন।

ভোলোদিমির আনতোনোভিচ এবং মিখাইল ভ্লাদিমিরস্কি-বুদানভ ইউক্রেনের নিপরো অববাহিকা নিয়ে তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্য দিয়ে আগেই প্রমাণ করেছিলেন যে গালিসিয়া বা ভোলহিনিয়া, কোনও অঞ্চল থেকেই মোঙ্গল হানার পরের দুই শতাব্দী জুড়ে মানুষের ইউক্রেনে এসে বসতি গড়ার বড় মাপের ঘটনা ঘটেনি। তারপরে ১৫ ও ১৬ শতকে বড় সংখ্যায় পরিযায়ী এসে ইউক্রেনে বাস স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু পোগোদিনের কথা মতো পশ্চিম দিক থেকে (অর্থাৎ, গালিসিয়া বা ভোলহিনিয়া থেকে) আসেনি, বরং উত্তরের প্রিপিয়াত জঙ্গল ও জলাভূমি থেকে এসেছিল। এই তথ্য পুনরাবৃত্তি করা ছাড়াও হ্রুসেভস্কি স্বকীয় পর্যবেক্ষণও যুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ১৪ ও ১৫ শতকে ভোলহিনিয়া ছেড়ে মানুষ বড় সংখ্যায় চলে যায়নি, কিন্তু ১৬ শতকে তা গিয়েছিল। এর কারণ ৩০০ বছরেররও আগে ঘটা মোঙ্গল হানা নয়, এর কারণ সমসময়ের সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতা। ভোলহিনিয়ার ভূস্বামীদের আধিপত্য তখন বাড়তে বাড়তে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, কৃষকদের বেগার খাটতে বাধ্য করা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল, তাই তার প্রতিবাদে কৃষকরা ভোলহিনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর ভূস্বামীদের নানা অনুযোগ থেকে

জানা যায় যে কৃষকরা ভোলহিনিয়া ছেড়ে পশ্চিমে পোল্যান্ডে চলে গিয়েছিল, পুবে ইউক্রেনে আসেনি। সুতরাং এক্ষেত্রেও পোগোদিনের কল্পনার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হ্রুসেভস্কি আরও বলেছিলেন যে মোঙ্গল হানার পর কিয়েভিয় রুস থেকে উত্তরপূর্বে ভোলগার তীরে কতিপয় ক্ষমতাচ্যুত রাজপুরুষ গিয়েছিল, কোনও সাধারণ বাসিন্দা যাননি। সাধারণ বাসিন্দারা প্রয়োজনমতো উত্তর ইউক্রেনের বনাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য সরে গিয়ে মোঙ্গল হানার ঝড় সামাল দিয়েছিল। ঝড় কেটে যাওয়ার পর তারা আবার তাদের জনপদে ফিরে এসে জীবন চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এভাবে পোগোদিন ও অন্যান্য রুশ-আধিপত্য-পন্থীদের তত্ত্বের প্রতিটা অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ১৯০৪ সালে ইউক্রেনিয় ভাষায় রাশিয়ায় প্রকাশিত প্রথম গবেষণা সন্দর্ভটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। ইউক্রেনিয় ভাষায় বিদ্যাচর্চার ধার যে বিন্দুমাত্র ভোঁতা হয়না, তা নিয়ে আর সন্দেহের কোনও অবকাশ রইলনা। রুশ-আধিপত্য-পন্থীরা অবশ্য ভুল স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের তত্ত্ব পরিত্যাগ করেননি। কারণ, ইতিহাসের তথ্য-প্রমাণের বিচারনিষ্ঠার সততার চেয়েও যে আধিপত্যবাদী জাতীয়তা নির্মাণের তাড়না অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই পোগোদিনের নাম না করে তাঁর তত্ত্বকেই ঘষেমেজে নতুন বোতলে পুরানো ভোদকার মতো হাজির হল রুশ ইতিহাসশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ক্লিউচেভস্কি-র ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'রুশ ইতিহাসের ধারা' (Course of Russian History) বইয়ের মধ্য দিয়ে এবং রুশ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষণায় তা ইতিহাসের মানগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। অন্যদিকে, এই রুশ-আরোপিত মিথ্যা ইতিহাস খণ্ডনের তাগিদে হ্রুসেভস্কি ও তাঁর সহযোগী ইউক্রেনিয় বিদ্যাচর্চাকারীরা যে গবেষণা চর্চা শুরু করেছিলেন তা ওই মিথ্যা খণ্ডনের পর ইউক্রেনের প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথে এসে দাঁড়াল। ইউক্রেনের স্বকীয় ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজরূপ সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক আগ্রহ তৈরি হল। গ্রামীণ মানুষদের জীবনধারা উপেক্ষার বিষয় থেকে আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হল। এই ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকা নিলেন হ্রুসেভস্কি তাঁর বহু খণ্ডের বিশাল প্রেক্ষাপটের ইউক্রেনিয় ভাষায় লিখিত 'ইউক্রেনের ইতিহাস' (History of Ukraine) গ্রন্থের প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। আমাদের আলোচনাতেও এখন সেদিকেই মোড় নেওয়া যাক।

৫

ইউক্রেনের ইতিহাসের ধারা: কসাক ইতিবৃত্ত

হ্রুসেভস্কি তাঁর 'ইউক্রেনের ইতিহাস' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলেন। সেই উদ্ধৃতিটি খ্রিস্টিয় 'অর্থোডক্স' মতের একটি ধর্মীয় নথি থেকে নেওয়া। নথিটির নাম 'দৃঢ় প্রতিবাদ' (Protestation), রচিত হয়েছিল ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে। উদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছে যে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে 'কসাক'-দের অস্তিত্বের শিকড় সেই কিয়েভিয় রুস আমল অবধি বিস্তৃত, কিয়েভিয় রুস রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তারা, রাজা ওলেহ-র নেতৃত্বে তারা রুস-য়ের হয়ে যুদ্ধে লড়েছিল, রাজা মহান ভোলোদিমিরের সময় তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হ্রুসেভস্কির পূর্ববর্তী গবেষক মিকোলা কোস্তোমারভ, মিখাইলো ম্যাক্সিমোভিচ এবং ভোলোদিমির আনতোনোভিচ তাঁদের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণে ১২ ও ১৩ শতকে কিয়েভিয় অঞ্চলে উপস্থিত গোষ্ঠীতান্ত্রিক যৌথ স্বশাসিত সমাজরূপের সঙ্গে ১৫ শতকের শেষ ও ১৬ শতকের শুরুতে কসাকদের সমাজরূপের মিল ও সম্ভাব্য ঐতিহ্যপ্রবাহের যোগাযোগ চিহ্নিত করেছিলেন। হ্রুসেভস্কি এই মতকে মান্যতা দিয়ে তাঁর 'ইউক্রেনের ইতিহাস'-য়ে লিখেছিলেন:

> সমাজঅস্তিত্বের একটি ধরন হিসেবে ইউক্রেনিয় লোকজীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ১৬ শতাব্দীতে এসে 'কসাকত্ব' (cossackdom/ kozatstvo) বিশেষিকৃত নামে পরিচিত হয়েছে, তা ইউক্রেনের আদি মুহূর্ত থেকেই বর্তমান। ইউক্রেনের মানুষদের বহু শতক প্রাচীন শান্ত কৃষিভিত্তক জীবনচর্যার সঙ্গে স্তেপ-উপত্যকার লোলুপ যাযাবর লুণ্ঠনকারীদের সংঘাতের ফলেই তা রূপ পেয়েছে। ইউক্রেনের মাটিতে শতকের পর শতক ধরে এই সংঘাত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে, প্রতিনিয়ত রূপ বদল করে তা নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমাজরূপের মৌল ধারাবাহিকতাকে এভাবে মান্যতা দেওয়ার পর হ্রুসেভস্কি কসাকত্বের বিশেষ চরিত্র পর্যবেক্ষণে জোর ফেলেছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল যে স্বতন্ত্র সমাজ-সংগঠন হিসেবে কসাকত্ব ইউক্রেনে জাহির হয়েছে ১৬ শতকের শেষের দিকে। তখন গ্রামসমাজে কৃষক, কারিগর ও কসাক যোদ্ধা বা দলপতিদের মধ্যে সামাজিক কোনও ফারাক টানার উপায় ছিলনা। ক্রমশ স্তেপ উপত্যকার বিভিন্ন হানাদার বাহিনী, বিশেষ করে তাতার বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত এবং পড়শি রাজতন্ত্রগুলোর (পোল রাজতন্ত্র, লিথুয়ানিয় রাজতন্ত্র, তুর্কি অটোমান রাজতন্ত্র, রুশ জারতন্ত্র, অস্ট্রিয়ার হাবসবার্গ রাজতন্ত্র) সঙ্গে সম্পর্কের ওঠাপড়ার প্রভাবে নানা বদল ঘটতে থাকে। ১৭ শতকের শেষে এসে দেখা যায় যে সাধারণ কৃষক-কারিগর-দের থেকে স্বতন্ত্র সামাজিক বর্গ হিসেবে 'কসাক আধিকারিক'-দের জন্ম হয়েছে। এই আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে বিভিন্ন রাজতন্ত্র (মূলত পোল রাজতন্ত্র ও রুশ জারতন্ত্র) তার স্বার্থবাহী যুদ্ধে কসাক বাহিনী ব্যবহার করছে।

ইউক্রেনিয় লোকশিল্পীরা কসাক জীবন নিয়ে তখনকার মধ্য ইউক্রেনিয় ভাষার নানা আঞ্চলিক রূপে বহু গান, গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। গ্রামের হাটে বা বারোয়ারি জমায়েতের জায়গায় এগুলো গাইত, অভিনয় করত ভ্রাম্যমান শিল্পীরা। লোকের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ত, বেঁচে থাকত। পরম্পরাবাহিত এমন আখ্যানের উপর ভিত্তি করে নিকোলাই গোগোল ১৮৪২ সালে 'তারাস বুলবা' গল্প রচনা করেছিলেন। সেই গল্পে তিনি লিখেছেন:

> ...কঠোর ১৫ শতকে, ইউরোপের অর্ধ-যাযাবর এক কোণে যখন আদিম ইউক্রেইন তার নৃপতিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মঙ্গোলিয় লুঠেরাদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল; যখন ঘর-বাড়ি হারিয়ে লোকে মরীয়া হয়ে উঠেছিল; যখন এই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা ভীতিপ্রদ প্রতিবেশী ও চিরন্তন বিপদের সরাসরি মুখোমুখি হয়ে ভয় কাকে বলে তারা তা ভুলে গিয়েছিল; যখন চির প্রশান্ত প্রকৃতির স্লাভ জনজাতির তেজ সামরিক শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে রুস চরিত্রের এক উন্মুক্ত উদ্দাম বিকাশ অবারিত করে দিয়েছিল; তখন সব নদীতীর, খেয়াঘাট, ঢালুভূমি ও বাসোপযোগী স্থান ভরে উঠেছিল কসাকে। তাদের সংখ্যা কত কেউ জানতনা। এক সুলতান তাদের সংখ্যা জানতে চাইলে এক সাহসী কসাক সঠিক উত্তরই দিয়েছিল: 'কে জানে কত! সারা স্তেপভূমিতেই আমরা ছড়িয়ে আছি। মাটিতে যতগুলো ঢিপি, ততগুলোই কসাক।'... শিকারী কুকুরপালকে ভরা ছোট ছোট রাজ্য ও ছোট

ছোট শহরের বদলে, নিজেদের শহরকে বাজি রেখে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ও ব্যবসার ফাটকা খেলা ছোট ছোট রাজাদের বদলে মাথা তুলে দাঁড়াল পরাক্রান্ত সব জনবসতি ও কুরেন (গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বশাসনে সংহত জনগোষ্ঠীকে কুরেন বলা হত)— অ-খ্রিস্টিয় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে একই ঘৃণা নিয়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। কীভাবে এদের অবিরাম সংগ্রাম ও নির্ভীক জীবন ইউরোপকে তার অস্তিত্ববিপন্নকারী সেই উপদ্রবের ধারা থেকে রক্ষা করেছিল সে ইতিহাস কারও অজানা নয়। ছোট ছোট রাজাদের বদলে পোল রাজারা তখন এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি। কিন্তু তাঁরা তখনও দুর্বল ও দূরস্থ। তাঁরা কসাকদের সামরিক ও সতর্ক জীবনযাপনের সুবিধা বুঝতেন, তাই কসাকদের কদর করতেন। তাঁরা কসাকদের উৎসাহ দিতেন, কসাক ব্যবস্থার গুণগান করতেন। তাঁদের সুদূর-স্থিত শাসনের অধীনে কসাকদেরই ভিতর থেকে নির্বাচিত কম্যান্ডান্টরা কসাকদের বসতি ও কুরেনগুলোকে রেজিমেন্ট ও সামরিক বিভাগে রূপান্তরিত করে ফেলে। এ কোনও নিয়মিত স্থায়ী বাহিনী নয়, তেমন বাহিনীর চিহ্নমাত্রও কোথাও ছিলনা। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন হলে মাত্র আট দিনের মধ্যেই প্রত্যেক কসাক ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেখা দিত, রাজার কাছ থেকে মাত্র এক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে লড়তে রাজি থাকত। দুই সপ্তাহের মধ্যে এমন সেনাবাহিনী জড়ো হয়ে যেত যা কোনও রাজকীয় আদেশের মধ্যে দিয়ে করা সম্ভব ছিলনা। যুদ্ধাভিযান শেষ হলেই আবার যোদ্ধারা ফিরে যেত তাদের চাষের ক্ষেতে ও চারণভূমিতে, নীপরো নদীর খেয়াঘাটে। তারা মাছ ধরত, বেচাকেনা করত, মদ বানাত, আবার স্বাধীন কসাকের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেত। তাদের অসাধারণ কর্মকুশলতা তখনকার অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষককেই অবাক করেছে। এমন হাতের কাজ ছিল না যা কসাকদের অজানা: মদ বানানো, টানাগাড়ি তৈরি, বারুদ গুঁড়ো করা, কামারের কাজ, সবই তারা করত। আবার একইসঙ্গে জানত কীভাবে উদ্দাম আনন্দ উপভোগ করতে হয়, মাতাল হয়ে এমন মাতামাতি করতে হয় যা কেবল তারাই পারে। সবকিছুই যেন তাদের করায়ত্ত। নিয়মিত সৈন্যদলের তালিকায় নাম-লেখানো কসাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তাছাড়াও সর্বদাই গুরুতর প্রয়োজনে অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকের দল পাওয়া যেত। কসাক ক্যাপ্টেনরা একবার গ্রামের বাজারে ও ময়দানে গিয়ে টানাগাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে হাঁক দিত: 'ওহে সব মদ-চোলাইকারীর দল, থামাও তোমাদের মদ চোলাই করা! চুল্লির ধারে শুয়ে শুয়ে মোটা গতরটাকে মাছিদের ভোজে সঁপে দিয়ে আর কাজ নেই! চলে এস সব, চলে এস! বীরের খ্যাতি আর সম্মান অর্জন করার সময় হয়েছে। আর ওহে

হালঠেলা, গমবোনা, ভেড়ার রাখাল আর মেয়ে-পাগলার দল! লাঙ্গলের পিছু পিছু হাঁটা থামাও, মাটি-কাদায় হলদে জুতো ভরিয়ে তোলা থামাও, থামাও তোমাদের মেয়েদের পিছনে ছুটে ছুটে বীর্য নষ্ট করা! কসাক গৌরব অর্জন করার সময় এখন এসে গেছে!' কথাগুলো হয়ে উঠত যেন শুকনো কাঠের গাদায় আগুনের ফুলকি। চাষী ভেঙে ফেলত তার লাঙল, মদ চোলাইয়ের দল মদের পিপে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফেলে আসত ভাটিখানা, কারিগর ও ব্যবসাদাররা তাদের কলকব্জা মালপত্র জলাঞ্জলি দিয়ে শখের জিনিষ চুরমার করে বেরিয়ে আসত। যে যার ঘোড়ায় চেপে বসত।...

গোগোলের লিখনশৈলী এই বর্ণনার মধ্যে যেন কসাক জীবনের প্রাণস্পন্দনকে ভরে দিয়েছে। সেই প্রাণস্পন্দনকে ১৫ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৬ শতকের প্রথমার্ধ সময়কালের প্রেক্ষিতে একাধিক দ্বন্দ্বকে ঘিরে স্পন্দিত হতে দেখি—সীমান্ত বরাবর ইউরোপিয় ও এশিয় জনজাতির দ্বন্দ্ব, প্রতিষ্ঠিত কৃষক বসতি ও স্তেপভূমির ভ্রাম্যমান বসতির দ্বন্দ্ব, কৃষক ও যাযাবরের দ্বন্দ্ব, খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের দ্বন্দ্ব, আবার, কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিকেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীতন্ত্রের দ্বন্দ্ব।

ভাষার শিকড় খুঁড়লে আমরা দেখতে পাব যে 'কসাক' শব্দটি এসেছে তুর্কি ভাষা থেকে। ইউরোপ ও এশিয়ার সীমানার দুপাশে বিস্তৃত স্তেপভূমিতে তাতার জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রচলিত তুর্কি ভাষারূপে 'কসাক' শব্দ দিয়ে 'মুক্তপুরুষ, প্রহরী ও লুন্ঠনকারী' বোঝানো হত। তুর্কি বা তাতার জনজাতির সশস্ত্র দল যারা যাযাবরের জীবন যাপন করত এবং নিজেদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী বসতি বা বাণিজ্যযাত্রীদের উপর হানা দিয়ে লুট করত, তাদেরই প্রথম কসাক বলা হত। স্লাভ কৃষক জনবসতিগুলো এই তাতার কসাকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়। বেশ কিছু জনবসতি ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে কোনও না কোনও নদীর ধার ধরে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে তা পাহারা দেওয়া, হামলাকারীদের যুদ্ধ করে হঠিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেরাও যুদ্ধপ্রস্তুতি নেয়। এরাই স্লাভ জনগোষ্ঠীর কসাক।

নিপরো অববাহিকার কসাকরা প্রায় সবাই ছিল ইউক্রেনিয় কৃষক-কারিগর। ১৬ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে চারদিকের রাজতন্ত্রগুলো থেকে রাজা ও ভূস্বামীদের উৎপীড়নে জমি থেকে উৎখাত হয়ে আসা বহু কৃষক নিপরো কসাকদের মধ্যে যোগ দেয় কারণ কসাক বসতিগুলো রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর শাসনের অধীন ছিলনা, কৃষকদের মাথার উপর কোনও ভূস্বামীও ছিল না।

১৬ শতকের শেষদিকে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য যখন এই স্লাভ কসাকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরু করে, তখন কসাকদের মধ্যে একটা বড় অংশই এই বিপদ মোকাবিলার কৌশল হিসেবে পড়শি অন্য রাজতন্ত্রের সঙ্গী হয়। তারা ভেবেছিল যে তারা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে, কিন্তু ক্রমেই রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি ও ভূস্বামী অভিজাত অংশের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। কিছু কসাক সমরনেতা সেই অভিজাতদের মহলে ঠাঁই পায়, গণতন্ত্র ও স্বশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, রাজতন্ত্রের ধাপবন্দি সমাজকাঠামোই তাদের শুষে নেয়। কেবল নিম্ন নিপরো অববাহিকার কসাকরা তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, জাপোরোজীয় কসাক নামে তারা কসাক স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

ইউক্রেনিয় ভাষায় 'জাপোরোজ' কথাটার মানে হল 'জলপ্রপাতের ওপারে'। জাপোরোজীয় কসাকরা নিজেদের সামরিক রক্ষণ জোরালো করার জন্য নিপরো নদীর প্রায় অনতিক্রম্য কয়েকটা খাড়া জলপ্রপাতের ওপারে কিছু দ্বীপে নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে, সেখান থেকেই তাদের এমন নাম। বর্তমান ইউক্রেনের দক্ষিণ অংশে তখনকার দিনে 'ছোট তারতারি' নামে পরিচিত সমৃদ্ধ প্রকৃতি থেকে শিকার করে, মাছ ধরে, মধু সংগ্রহ করে তারা দিনযাপন করত এবং মাঝেমধ্যেই তাতার ও তুর্কদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাত। জাপোরোজীয়রা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করাকেই সবার উপরে স্থান দিত। তাদের মধ্যে এসে ভিড়ত বহু সাধারণ মানুষ— স্বৈরতন্ত্রী শাসক বা ভূস্বামীর অত্যাচারে উৎখাত হওয়া কৃষক বা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানুষ, নানারকম করের ঠেলায় সর্বস্বান্ত হওয়া নগরবাসী বা নেহাতই ভবঘুরে। সবাইকেই তারা সাদরে গ্রহণ করত। কেউ কিছুদিন এই মুক্ত জীবনের স্বাদ নিয়ে চলে যেত, আবার কেউ স্থায়ীভাবে থেকে যেত। তারা মূলত গ্রিক অর্থোডক্স ঘরানার খ্রিস্টান ধর্ম পালন করলেও, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষরাও তাদের মধ্যে স্থান পেত। তাদের সামরিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রকে তারা বলত 'সিচ'। এই সিচ ছিল আসলে কাঠের তৈরি এক দুর্গশহর। একটি সিচের জনসমষ্টিকে ৩৮টি ভাগে ভাগ করে একএকটা ভাগকে বলা হত কুরেন। এই কুরেন মানে একসঙ্গে সব কাজ ভাগ করে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করা একটি গোষ্ঠী। মহিলাদের এই সিচে থাকার অধিকার ছিলনা। সবক্ষেত্রে সবার সভায় আলোচনা করে এবং প্রয়োজন হলে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত ও পদাধিকারীদের বাছা হত। এই সাধারণ সভাকে বলা হত 'কোস'। সর্বোচ্চ

সামরিক নেতা 'হেটমান'-কেও বাছা হত এভাবেই এবং যে কোনও কসাকই এই পদের জন্য বিবেচিত হতে পারত। ('হেটমান' কথাটা এসেছে জার্মান শব্দ 'হাউপ্টমান' থেকে। 'হাউপ্টমানের' উচ্চারণের স্লাভিকরণ হওয়ার মধ্য দিয়ে 'হেটমান' পোল ভাষায় প্রবেশ করে, সেখান থেকে ধার-করা-শব্দ হিসেবে তা মধ্য ইউক্রেনিয় ভাষায় জায়গা করে নেয়।) সাধারণত বছরে একবার এই নির্বাচন হত। একটি সিচের অধীন সমস্ত অঞ্চলকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙে প্রতিটি ভাগের দায়িত্ব সব কসাকদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হত।

এই জাপোরোজীয় সিচ-য়েই ১৬৪৮ সালে ছোট এক দল সঙ্গীকে নিয়ে যোগ দিলেন বোহদান খেমেলনিতস্কি। অচিরেই তিনি হেটমান নির্বাচিত হলেন এবংঅভূতপূর্বভাবে ধর্মের বিচার অতিক্রম করে তাতারদের সঙ্গে জোট বেঁধে পোল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। স্বাধীন ইউক্রেনের রূপ যেন ইতিহাসের পটে ভেসে উঠল। সেই কথায় আমরা যাব। তবে যাওয়ার আগে তার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কিয়েভিয় রুস-য়ের পতনের পর থেকে ঘটা রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনগুলোর সংক্ষিপ্তসার স্মরণ করে নেওয়া যাক।

কিয়েভিয় রুস-য়ের পতনের পর অল্প কিছুদিনের জন্য গালিসিয়া-ভোলহিনিয়া রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিস্টান অর্থোডক্স ধারার পোপের প্রতিনিধি এসে রাজা ডানিলোর মাথায় মুকুট তুলে দিয়েছিলেন। তখন ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু তার ১১ বছর পরই রাজা ডানিলো মারা গেলেন এবং এই রাজতন্ত্রও অন্তর্দন্দ্ব ও ভাঙনের পথ ধরল। পার্শ্ববর্তী পোল রাজতন্ত্র এই অঞ্চলকে দখলে আনার দিকে নজর দিল। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের রাজা কাসিমির সামরিক অভিযানে গালিসিয়া জয় করলেন। ইতিমধ্যে পোল রাজতন্ত্রের সঙ্গে লিথুয়ানিয়ার রাজতন্ত্রের এলাকা দখলের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ চলছিল। তার মধ্য দিয়ে একদিকে ১৩৬৬ সাল নাগাদ পোলরা যেমন গালিসিয়ার পুরোটা ও ভোলহিনিয়ার একাংশ দখল করল, অন্যদিকে তেমনই লিথুয়ানিয়ার রাজা আলগিরদাসের বাহিনী ১৩৬৮ সালে কিয়েভ দখল করল এবং কিয়েভিয় রুস অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক নিজেদের দখলে নিয়ে এল। ১৩৮৫ সালে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের মধ্যে 'ক্রেভো ঐক্যচুক্তি' সাক্ষরিত হয়, এবং তার মধ্য দিয়ে লিথুয়ানিয় ও ইউক্রেনিয় অঞ্চল পুরোটাই পোল রাজতন্ত্রের দখলে আসে। ইউক্রেনিয় অভিজাতরা পোল রাজতন্ত্রের দখলদারির বিরুদ্ধে ১৫০৮ সালে বিদ্রোহ করেছিল মিখাইলো হ্লিমস্কি-র নেতৃত্বে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৫৬৮ সালের 'লাবলিন ঐক্যচুক্তি'-র পর ইউক্রেনের উপর পোল শাসন পাকাপাকি

ভাবে চেপে বসে। পোল রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল রোমের ক্যাথলিক গির্জা। সেই গির্জার প্রধান অর্থাৎ রোমের পোপের বশ্যতা স্বীকার করে সমস্ত গির্জার সংযুক্তিকরণের নির্দেশ পোল রাজতন্ত্র জারি করে ১৫৬৯ সালে। ইউক্রেনিয়দের গ্রিক অর্থোডক্স গির্জার ধারার সঙ্গে সংযুক্তির ঐতিহ্য ধ্বংস করে পোলিয়করণ করার জোরজুলুম লাগু হয়।

১৫ ও ১৬ শতকে এই রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই কসাক আন্দোলনের জন্ম। ইউক্রেনিয় কসাকরা পোল রাজা ও ভূস্বামীদের বসানো কর দিতে অস্বীকার করত, পোল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বশাসনের আঞ্চলিক পরিসর বজায় রাখতে চাইত এবং অর্থোডক্স ধর্মচর্চার ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাইত। গোগোল তাঁর তারাস বুলবা চরিত্রটিকে যেভাবে হাজির করেছিলেন, তার মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়:

> সেই কালে রুস অভিজাতদের উপর পোল প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। অনেকেই পোল ধরন-ধারণ গ্রহণ করছিল, চালু করছিল তাদের বিলাসিতা, দাসদাসীর জাঁকজমক, বাজপাখি, শিকারীর দল পোষা, ভোজনোৎসব আর দরবার বসানো। তারাসের তা মনঃপূত ছিলনা। তিনি ভালোবাসতেন কসাকের সাদাসিধে জীবন। যে বন্ধুরা পোল রাজধানী ওয়ারশ-র দিকে ঝুঁকত, তাদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধত, তিনি তাদের 'পোল প্রভুদের ভৃত্য' বলতেন। অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠ রক্ষাকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালনে তিনি সর্বদা অক্লান্ত ছিলেন। যেখানে ইজারাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অথবা কোনও নতুন চিমনি-করের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যেত, সেই সব গ্রামেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে উপস্থিত হতেন। তিনি নিজেই তাঁর কসাকদের সহায়তায় বিচারকাজ নির্বাহ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনটে ব্যাপারে তরোয়াল সর্বদা ব্যবহার করা চলে, সেগুলো হল: যদি পোল রাজকর্মচারীরা নির্বাচিত কসাক নেতাদের যথোচিত সম্মান না করে ও তাঁদের সামনে মাথার টুপি না খোলে, যদি কেউ অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মকে পরিহাস করে ও পিতৃপুরুষের আচারবিধি না মানে, আর সর্বশেষে যদি শত্রুপক্ষ হয় মুসলমান বা তুর্কি ...।

কিন্তু কসাকদের মধ্যে একাংশ আবার যুদ্ধ বাঁধলে আর্থিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পোল রাজার সেনার হয়ে যুদ্ধ লড়তে যেত। নিজের সুবিধা অনুযায়ী এই ব্যবস্থাকে একটা পাকা বন্দোবস্তের চেহারা দিতে পোল রাজারা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কসাকদের সঙ্গে পাকাপাকি চুক্তি করেছিল। পোল রাজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এই কসাকদের বলা হত 'কসাক হোস্ত', পরবর্তীতে 'নথিভুক্ত

কসাক' হিসেবেও এরা পরিচিত হয়। এই নথিভুক্ত কসাকরা রাজার কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেত, রাজা তাদের অভিজাতবর্গের স্বীকৃতি ও সুযোগসুবিধা দিয়েছিল, বিনিময়ে রাজার ডাকে যে কোনওসময় যোদ্ধার দল জুটিয়ে নিয়ে রাজসেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হত।

১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে পোল রাজার অধীনে এমন নথিভুক্ত কসাকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০। কিন্তু স্বশাসিত কসাক জনপদগুলো পোল রাজার আইনকানুন-করবিধি কিছুই মানতে চাইছিল না। তাই তাদের সবক শিখিয়ে বাধ্য প্রজায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে পোল রাজা কসাকদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালালেন। নথিভুক্ত কসাকের সংখ্যাও কমিয়ে করলেন ৬,০০০। কসাক জনবসতির ক্ষুব্ধ কৃষকরা ১৬৩০ সালে তারাস ফেদেরোভিচের নেতৃত্বে পোল-বিরোধী বিদ্রোহ করে পোল রাজার সেনাকে পরাজিত করে, কিন্তু তারা সেই জয় ধরে রাখতে পারেনি। পোল রাজা নথিভুক্ত কসাকের সংখ্যা ৮,০০০-য়ে বাড়িয়ে আবার নিজের আধিপত্য কায়েম করে। ১৬৩০-য়ের দশকের শেষদিকেও কসাক কৃষকদের পোল-শাসন বিরোধী বিদ্রোহ একাধিকবার নিপরো নদীর অববাহিকায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। পাভলো বুট ও ইয়াকিভ ওসত্রিয়ানিতসিয়া-র নেতৃত্বে হওয়া কৃষক-বিদ্রোহদুটো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলোও পোল রাজা নৃশংসভাবে দমন করে। একইসঙ্গে নথিভুক্ত কসাকের সংখ্যা আবার ৬,০০০-য়ে কমিয়ে এবং তাদের মাথায় পোল রাজ-আধিকারিকদের বসিয়ে চিরতরে কসাক-বিদ্রোহ ও কসাক-স্বাধীনতায় ইতি টানতে চায়।

কিন্তু রাজা চায় একরকম, আর বাস্তবে ঘটে আরেক রকম। কসাক বিদ্রোহে ইতি পড়ল না। কসাক স্বাধীনতাও নির্বাপিত হল না। বরং এযাবৎ সবচেয়ে বড় কসাক বিদ্রোহ জ্বলে উঠে কসাক স্বাধীনতার এক রাষ্ট্রীয় পরিসর গড়ে তুলল। 'হেটমানরাজ' (হেটমানেট) নামে দেখা দিল সেই রাষ্ট্রীয় পরিসর। কীভাবে কেমন করে তা ঘটল তা জানার জন্য এখন আমাদের প্রবেশ করতে হবে বোহদান খেমেলনিতস্কি-র আখ্যানে।

৬

কসাক হেটমানরাজের উত্থান ও পতন

বোহদান খেমেলনিতস্কি-র জীবন শুরু ওয়ারশ-র দিকে ঝুঁকে থাকা নথিভুক্ত কসাক হিসেবে। নথিভুক্ত কসাকদের মধ্যে পোল রাজার সরকারের তৈরি করা সর্বোচ্চ পদ 'চ্যান্সেলর'। খেমেলনিতস্কির সেই চ্যান্সেলর পদ অবধি উত্থান ঘটেছিল। পোল রাজার সেনার হয়ে তুরস্কের অটোমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৬৩০-য়ের দশকের শেষদিকে নিপরো অববাহিকার কসাক কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করা পোল রাজার বাহিনীতে রাজ-অনুগত সেনাধিকারিক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। এভাবে রাজসেবা করার সুদীর্ঘ কার্যকালের উপান্তে প্রায় ৫০ বছর বয়সে তাঁর যখন অবসর নিয়ে পোল-মুখী কসাক অভিজাত হিসেবে অবসরবিনোদনে মগ্ন হওয়ার সময়, তখনই জীবন হঠাৎ সম্পূর্ণ উল্টোদিকে মোড় নিল। এক প্রবল প্রতিপত্তিশালী পোল ভূস্বামী তাঁর ভূসম্পত্তি বিস্তার করার পরিকল্পনায় বোহদানদের গ্রামের উপর নজর ফেলেন এবং আরও অনেক জমির সঙ্গে বোহদানের বাবার সমস্ত জমি ও খামার গিলে নেন। এমনকি বোহদানের বউকেও নাকি তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বোহদানের নিজের সব সম্পত্তিও পোল রাজাদেশে বাজেয়াপ্ত হয় এবং বোহদানকে কারাগারে বন্দি করা হয়। এই সবই ১৬৪৭ সালের ঘটনা। ১৬৪৮ সালের প্রথমদিকে বোহদান খেমেলনিতস্কি কারাগার থেকে পালান এবং তাঁর সমর্থকদের একটা ছোট দল নিয়ে জাপোরোজীয় সিচে গিয়ে যোগ দেন। কিছুদিন পর সেখানে তিনি 'হেটমান' নির্বাচিত হন। পোল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে শুরু করেন তিনি। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই সহযোগী শক্তি হিসেবে তিনি ক্রিমিয়ার মুসলমান খান রাজাদের সঙ্গে জোট গড়ে তোলেন। ধর্মীয় শত্রুতার উপরে উঠে এভাবে বন্ধু বাছাই কসাকদের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। ক্রিমিয়ার তাতার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সঙ্গে

জাপোরোজীয় সিচের কসাক বাহিনী যুক্ত হয়ে পোল রাজার বাহিনীর উপর আক্রমণ হানে। ১৬৪৮ সালের মে মাসের দুটি যুদ্ধে এই তাতার-কসাক যৌথ বাহিনী ইউক্রেনের মাটিতে বহাল পোল রাজার সেনাকে পর্যুদস্ত করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পোল সেনাপতিদের তাতাররা নিয়ে গিয়ে ক্রিমিয়ায় বন্দি করে রাখে। পোল রাজতন্ত্রের সামরিক শক্তি ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। খেমেলনিতস্কির কসাক দূতরা গোটা ইউক্রেন ও বেলারুশ জুড়ে ছড়িয়ে যায় পোল রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বার্তা নিয়ে। এবং ইউক্রেন জুড়ে কৃষক-বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। পোল ভূস্বামীরা তাদের দখল করা এলাকায় ভূমিদাস প্রথা চালু করে চরম শোষণব্যবস্থা লাগু করেছিল। এই শোষণব্যবস্থা লাগু হওয়ার হাত ধরেই এসেছিল বহু ইহুদি ব্যবসায়ী ও মহাজন। ইউক্রেনিয় কৃষকদের চোখে তাই ইহুদিরা পোলদের সহযোগী হিসেবেই গণ্য হত। কৃষক-বিদ্রোহের মূল বর্শামুখ চালিত হল এই পোল অভিজাত ও ইহুদি কারবারীদের বিরুদ্ধে। ভূমিদাস প্রথার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্খার সঙ্গে মিশে গেল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্খা ধর্মীয় গোঁড়ামির উসকানি। ফলে বিদ্রোহী কৃষকরা প্রাণঘাতী হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পোল ও ইহুদিদের উপর। অসংখ্য প্রাণ গেল। কিছু ইহুদি প্রাণরক্ষার তাগিদে অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল। বোহদান খেমেলনিতস্কি এবং জাপোরোজীয় সেচের অন্য কসাকরা এই গণসংহারে অংশ নেয়নি বটে, তবে তেমন কোনও বাধাও দেয়নি। এই গণ কৃষকবিদ্রোহ খেমেলনিতস্কির নেতৃত্বে জাপোরোজীয় কসাকদের গোটা ইউক্রেনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পথ করে দিল। ১৬৪৯ সালের গোড়ায় খেমেলনিতস্কির নেতৃত্বে কসাক বাহিনী বিজয়দর্পে কিয়েভ শহরে প্রবেশ করল। কিয়েভিয় রুস-য়ের এই প্রাচীন রাজধানীর অর্থোডক্স সন্ন্যাসী মঠের প্রধান খেমেলনিতস্কিকে 'রুথেনিয়(ইউক্রেনিয়) জাতির মোজেস' আখ্যা দিয়ে বরণ করে নিলেন। পোল রাজা যুদ্ধশেষের চুক্তি করার জন্য প্রতিনিধি পাঠালেন কিয়েভে। খেমেলনিতস্কি সেই প্রতিনিধিদের বললেন যে তিনিই এখন রুস দেশের অধিপতি, সুতরাং পোল রাজা ও অমাত্যরা যেন এখন থেকে আর ইউক্রেনে নাক না গলায়। পোল রাজা জবাব দিলেন নতুন করে গড়ে তোলা সেনাবাহিনীকে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে আক্রমণ হানার মধ্য দিয়ে। তাতার-কসাক জোটের বাহিনী এবারও পোল বাহিনীকে হারাল। পোল বাহিনী পরাজিত, পোল রাজা তখন বন্দি হওয়ার মুখে, তাতারদের রাজা ক্রিমিয়ার খান তখন তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করলেন। খান কূটনৈতিক ভারসাম্য

রাখতে চেয়েছিলেন, তিনি চাননি কসাক বা পোল কেউই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক বা অপরকে নিশ্চিহ্ন করে প্রবল শক্তিধর হয়ে উঠুক। তাই খেমেলনিতস্কিকে পোল রাজার উপর শেষ আঘাত হানার আগেই পিছু হটতে হল। তবে কসাক শক্তির অদম্যতা তখনের মতো প্রমাণিত হয়েছে। ১৬৪৯ সালের 'জ্বোরিভ চুক্তি'-র মধ্য দিয়ে সেই কসাক শক্তির রাষ্ট্র-রূপ হিসেবে কসাক হেটমানরাজ প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি এল। কিয়েভ শহরকে রাজধানী করে কিয়েভ, চেরনিহিভ ও ব্রাতস্লাভ অঞ্চলকে নিয়ে তৈরি হল এই হেটমানরাজ। তখন এই অঞ্চলকেই একসঙ্গে ইউক্রেন বলা হত। নতুন হেটমানরাজ তার অধীনে নথিভুক্ত কসাক হিসেবে ৪০,০০০ জনকে নিযুক্ত করল।

কিন্তু পোলদের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের শেষ হলনা। ১৬৫১ সালে আবার পোল-কসাক যুদ্ধ শুরু হল। এবার প্রথমে পোলরাই জেতার দিকে এগিয়ে গেল। পরে আবার ১৬৫২ সালে কসাকরা জিতল। ১৬৫৩ সালে আবার যুদ্ধ বাঁধল এবং দুই পক্ষ কেউই কাউকে পরাজিত করতে পারল না। খেমেলনিতস্কির বড় ছেলেও যুদ্ধে মারা গেল। খেমেলনিতস্কি তখন ভাবলেন যে ক্রিমিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে পোলদের উপর নির্ধারক আঘাত হানা যাবেনা। তার জন্য জোট বদল করতে হবে। তাঁর পুবের পড়শি মাসকোভির জার কসাকদের মতোই অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, তাই ক্যাথলিক খ্রিস্টান পোল রাজার তিনি স্বাভাবিক বিরোধী, তাই মাসকোভির জারের সঙ্গেই জোট বাঁধতে হবে। ১৬৫৪ সালে ইউক্রেনের পেরেইয়াস্লাভ শহরে কসাক জনপ্রতিনিধিদের কাউন্সিলের সভায় মাসকোভির জারের সঙ্গে এই জোট-চুক্তি হল। জার আলেক্সেই রোমানভ পোলদের বিরুদ্ধে হেটমানরাজ্য রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। চুক্তিতে বলা হল যে ইউক্রেনের শাসন হেটমানরাজ স্বাধীনভাবে করবে, কেবল অন্য রাজত্বগুলোর রাজা বা প্রশাসনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ বা বিনিময় করতে গেলে জারকে জানিয়ে তবে করতে পারবে।

কিন্তু পেরেইয়াস্লাভ চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভাঙতে মাসকোভির জার খুব বেশি সময় নিলেন না। ১৬৫৬ সালেই তিনি ওই চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে পোল্যান্ডের রাজার সঙ্গে আলাদা শান্তিচুক্তি করে ইউক্রেনের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পথ নিলেন। ১৬৫৭ সালে বোহদান খেমেলনিতস্কি মারা যাওয়ার পর হেটমানরাজ তার স্বাধীনতা খুইয়ে ক্রমশ আরও বেশি করে জারের আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। অভিজাত নথিভুক্ত কসাকদের সাম্মানিক পদ ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করা, হেটমানরাজ-রাষ্ট্রের কসাক-

প্রধানদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও অবিশ্বাস তৈরি করা, এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে নিজের তাঁবেদার অংশ তৈরি করা— এভাবে মাসকোভির জারতন্ত্র ক্রমশ নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। পোল রাজা ও মাসকোভির জার নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে ইউক্রেনের বেশ কিছু অঞ্চল সরাসরি নিজেদের দখলে নিয়ে নিল। ফলে কসাক হেটমানরাজ ভৌগোলিকভাবেও সংকুচিত হয়ে নিপরো নদীর বাঁদিকে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এই একটানা ক্ষয়ের আখ্যান হঠাৎ যেন মোড় ঘুরল ১৭ শতকের শেষ দুই দশক এবং ১৮ শতকের শুরুতে এসে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল। এ সময়েই হেটমান হিসবে নির্বাচিত হলেন ইভান মাজেপা, যিনি মাসকোভির জারের বশ্যতা না মানার সাহস দেখালেন।

ইভান মাজেপার জীবন অতিকথায় ঘেরা। তাঁর জীবন শুরু পোল রাজদরবারের অভিজাতদের অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে। সেই তরুণ মাজেপার প্রতি এক পোল অভিজাতের তরুণী বউ আকৃষ্ট হয়, দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গোপনে পল্লবিত হয়। কিন্তু গোপন কথাটি গোপন থাকেনা। জানাজানি হয়ে গেলে মাজেপাকে বন্দি করা হয়। তারপর শাস্তিস্বরূপ নির্মমভাবে প্রহার করে মাজেপার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অর্ধচেতন দেহটিকে একটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় জনহীন জঙ্গলের মধ্যে। ঘোড়াটি নিজের খেয়ালে ছুটতে ছুটতে পোল্যান্ডের সীমানা পেরিয়ে ইউক্রেনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইউক্রেনের এক গ্রামে কসাকরা ঘোড়াটির পিঠ থেকে বাঁধন খুলে মাজেপার দেহ নামায়। তাদের শুশ্রূষায় মাজেপা আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং কসাক জীবন শুরু করেন। এহেন অতিকথা ভরা জীবনের জন্য মাজেপা বহু গান, গীতিনাট্য, লোককথার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। কেবল ইউক্রেনিয় ভাষার গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির কবি ও গায়করাই নয়, ফ্রান্সের ভোলতেয়ার ও ইংলন্ডের কবি বায়রনের রচনাতেও তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন। অসংখ্য শিল্পীর মনের মাধুরী মিশে মাজেপার জীবনকথা প্রেম-বিদ্রোহ-সাহসিকতা-ভাগ্যপীড়নের অতিমানবিক গাথা হয়ে আছে। হেটমানরাজের ইউক্রেনে মাজেপা মাসকোভির জারের কাছে নথিভুক্ত কসাক হন। তারপর মাসকোভির জার পিটার-১-য়ের প্রতি অনড় অবিচল আনুগত্য দেখিয়েই তিনি হেটমানরাজের ক্ষমতার ধাপ বেয়ে ওঠেন এবং হেটমান নির্বাচিত হন। কিন্তু জীবন আবার আকস্মিক মোড় ঘোরে ১৭০৮ সালের শরৎকালে। সুইডেনের রাজা চার্লস-১২ আধিপত্যবিস্তার অভিযানে তাঁর তখনও অবধি অপরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে ইউক্রেনের উপান্তে

পৌঁছে গেছে কিন্তু মাজেপার বারংবার প্রার্থনাকে উপেক্ষা করে মাসকোভির জার পিটার-১ জানিয়ে দিয়েছেন যে ইউক্রেন হেটমানরাজ রক্ষণের জন্য একটি সেনাও তিনি পাঠাতে পারবেন না। মাজেপা তখন মাসকোভির প্রতি আনুগত্য ভেঙে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুইডেনের রাজা চার্লস-১-র সঙ্গে সন্ধি করে তিনি সুইডেনের বাহিনীর সঙ্গে তাঁর কসাক বাহিনীকে যুক্ত করে জারের রাজ্য আক্রমণের দিকে এগোলেন। এতদিন অবধি যে জার একজন সেনারও সংস্থান করতে পারেননি, তিনি এখন তড়িঘড়ি বিপুল সেনাবাহিনী জড়ো করে মাজেপাকে 'আজকের জুডাস' আখ্যা দিয়ে চার্লস-১২ ও মাজেপার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। জারের বাহিনী ইউক্রেনের হেটমানদের প্রধান শহর বাতুরিনকে দখল করে শহরবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে গোটা শহর আগুনে জ্বালিয়ে দিল। এমনই লাগামছাড়া সন্ত্রাস জনপদের পর জনপদে জারি করে মাসকোভির জার কসাক কৃষক ও সেনাদের মাজেপার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য করলেন। ১৭০৯ সালের জুন মাসে চূড়ান্ত মোকাবিলায় পোলতাভার যুদ্ধে মাজেপা ও চার্লস-১২-র বাহিনী জারের বাহিনীর কাছে পরাজিত হল। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন রাজাধিপত্য-বিস্তারে সুইডেনের পতন শুরু হল, অন্যদিকে তেমন জারতন্ত্রের উত্থানের শুরু হল। আর ইউক্রেনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অকালবোধন হয়ে মাসকোভির রুশ-আধিপত্যের অন্ধকারে ইউক্রেন ডুবে গেল।

জার পিটার-১ রুশ-আধিপত্যের বাঁধন বেঁধেছিলেন ধাপে ধাপে। মাজেপার পতনের পর প্রথমে তিনি ইউক্রেনে কসাক হেটমান নির্বাচিত হতে দিয়েছিলেন। ইভান স্কোরোপাদস্কি হেটমান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাসকোভির বিভিন্ন রুশ আধিকারিক জারের হয়ে হেটমানরাজের উপর নজর রাখার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, ক্রমশ তাদের হাতেই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। ১৭২১ সালে স্কোরোপাদস্কি মারা যাওয়ার পর জার আর নতুন হেটমান নির্বাচন হতে দেননি। তিনি মাসকোভির রুশদের সংখ্যাধিক্য রেখে একটা কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন শাসনকাজ পরিচালনার জন্য। জার-নিযুক্ত এই রুশ-প্রধান কমিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিটিল রুশিয়ান কলেজ'। ইউক্রেনকে ইউক্রেন না বলে লিটিল রাশিয়া বা ছোট রাশিয়া বলার সেই বোধহয় সূত্রপাত। ইউক্রেনের স্বতন্ত্র পরিচয় মুছে তাকে জার-শাসিত রাশিয়ার অঙ্গ করে তোলার উদ্যোগের সেই শুরু। কসাক হেটমানরাজের কার্যত এখানেই সমাপ্তি।

মাঝেমধ্যে তারপরও কখনও কখনও হেটমান নির্বাচিত হয়েছিল। রুশ জারতন্ত্রের অনুগত অভিজাত ছাড়া তাঁদের আর কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি। এরকম শেষ হেটমান ছিলেন রোজুমোভস্কি। ১৭৬৪ সালের নভেম্বরে এই রোজুমোভস্কিকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে ডেকে পাঠিয়ে রুশ জারিনা ক্যাথেরিন-২ তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং হেটমান পদ বিলুপ্ত করা হল বলে ঘোষণা করেন। কাগজে-কলমে হেটমানরাজের সমাপ্তি হল এর মধ্য দিয়ে।

জারিনা ক্যাথেরিন-২ এরপর দ্রুত ইউক্রেনের উপর রুশ আধিপত্য প্রোথিত করায় মন দেন। কসাক স্বাধীনতার প্রতীক জাপোরোজীয় সিচকে আক্রমণ করার জন্য তিনি রুশ বাহিনী পাঠান। সেই বাহিনী জাপোরোজীয় সিচকে পুরো ধ্বংস করে দিয়ে যায়। এরপর ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৫-য়ের মধ্যে স্লোবোদা ইউক্রেন ও জাপোরোজীয় ইউক্রেনকে তিনি সরাসরি জারের রাশিয়ার অংশ বলে ঘোষণা করেন। রুশ জারতন্ত্রের চাটুকার অভিজাত রুশ ও অনুগত আধিকারিকদের ইউক্রেনের উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের বড় বড় ভূমিখণ্ড দখল করতে সাহায্য করে জারের সেনা ও প্রশাসন। কসাক জনপদগুলোয় জমির উপর কৃষকদের যৌথ অধিকার এভাবে ধ্বংস করা হয়। কিছু কসাক অভিজাত রুশ জমিদখলদারদের পাশাপাশি নিজেরাও ভূস্বামী হয়ে উঠে জারতন্ত্রের পাশে দাঁড়ায়। এরপর ১৭৮১ সালে জারিনা ক্যাথেরিন-২ রুশ ভূমিদাস ব্যবস্থা ইউক্রেনেও বলবৎ বলে ঘোষণা করেন, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন কসাক কৃষকদের পাকাপাকিভাবে ভূস্বামীদের দাসে পরিণত করা হয়।

ইউক্রেনের অন্য দুই অংশ তখন পোল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের দখলে। পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে তিন টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল ইউক্রেন।

৭

ইউক্রেনিয় ভাষার পায়ে শৃঙ্খল

কসাকদের উত্থানপতনের এই ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে ইউক্রেনিয় ভাষা তার পুরানো ইউক্রেনিয় রূপ থেকে বিকশিত হয়ে গোটা ইউক্রেন জুড়ে বৈচিত্র্যময় কিন্তু সমন্বিত কথ্য ভাষার একটা মান্য রূপ ধারণ করেছিল, যাকে মধ্য ইউক্রেনিয় ভাষা বলা হয়। ইউক্রেনিয় লোকজীবন এই পর্যায়ে যে বিচিত্র সংস্পর্শে এসেছিল, তা তার ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল। তুর্কি ভাষা ও পোল ভাষার বহু শব্দ ও ধারণা ইউক্রেনিয় ভাষায় যুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া পোল ভাষার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে অন্যান্য ইউরোপিয় ভাষা, যেমন, জার্মান ও ফরাসি ভাষার শব্দ ও ধারণাও ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রবেশ করেছিল। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষের মুখে কথ্যভাষা হিসেবে প্রধানত ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

ইউক্রেনিয় ভাষায় এসময় সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডারও গড়ে ওঠে। আলোচকরা এই সময়ের সাহিত্যকে প্রধানত 'বারোক' (baroque) ঘরানার বলে বর্ণনা করেছেন। এই বারোক ঘরানার বৈশিষ্ট্য হল যে তা সরলতার বিপরীতে জাঁকজমকপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করে। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ফসল হল কবিতা। হ্রিহোরি স্কোভোরোদা এসময়ের ইউক্রেনিয় ভাষার একজন প্রধান কবি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। মানবজীবনে সুখের যাওয়া-আসা ও বিপরীতে পরিবর্তমানতা নিয়ে অপার বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল। সাংকেতিকতার উজ্জ্বল ব্যবহারে তাঁর কবিতাগুলো রহস্যময়। গ্রামীণ গায়ক ও আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে তাঁর রচনা গোটা ইউক্রেন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে লোককথা-প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছিল।

১৭ শতকের শেষদিকে এসে ইউক্রেনিয় ভাষায় আধুনিক নাটকের জন্ম হয়। কসাকদের গৌরবগাথাই ছিল সেই নাটকের বিষয়বস্তু। সামিলো ভেলিচকো ও

অনামা সামোভিদেত-দের (সামোভিদেত শব্দের মানে প্রত্যক্ষদর্শী) রচিত কসাকগাথা জনপদে, হাটে নিয়মিত অভিনীত হত। পরবর্তীকালের গবেষক ও সাহিত্যিকদের কাছেও তা সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও ছিলেন গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান গায়ক-বাদকদের দল। ইউক্রেনিয় তারযন্ত্র 'কোবজা' বাজিয়ে তাঁরা গান, গীতিনাট্য পরিবেশন করতেন বলে তাদের নাম হয়েছিল 'কোবজারি'। এঁরা বিচিত্র প্রহসন ও ব্যাঙ্গনাট্য পরিবেশন করতেন। গ্রামের লোকসমাজে বিবেকের ভূমিকা পালন করতেন তাঁরা।

১৮ শতকের শেষে এই ইউক্রেনিয় ভাষার নাট্যকারদের ঘরানা থেকেই উঠে আসেন ইভান কোটলিয়ারেভস্কি (১৭৬৯– ১৮৩৮)। তাঁকে ইউক্রেনিয় ভাষার আধুনিক সাহিত্যের স্থপতি হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। 'ইনেইডা' হল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই নাটকে তিনি ভার্জিলের 'এ্যনিড'-য়ের ছায়া অবলম্বন করে ইউক্রেনিয় কসাকদের আখ্যান রচনা করেন। ইউক্রেনের স্বাধীনতা হারানো ও রুশ জারতন্ত্রের আধিপত্য প্রোথিত হওয়ার সংকটমুহূর্তে রচিত এই সামাজিক প্রহসন তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই নাটকে বিবিধ চরিত্রের সমাহার ঘটেছিল। কেউ মঠের সন্ন্যাসী ও ধর্মশাস্ত্রের ব্যখ্যাতা, কেউ ভ্রাম্যমান গায়ক-প্রচারক, আবার কেউবা চোর, মাতাল। এই বিভিন্ন বর্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষারূপ তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে হাজির হয়ে ইউক্রেনিয় ভাষার এক বৈচিত্র্যপূর্ণ মোজেইক হাজির করেছিল এবং একইসঙ্গে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ইউক্রেনিয় ভাষাকে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁরই সমসাময়িক আরেকজন লেখকের রচিত গল্প, ছোট উপন্যাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় কথাসাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি হলেন হ্রিহরি কির্তকা-ওস্নোভিয়ানেঙ্কো (১৭৭৮–১৮৪৩)। তাঁকে 'ইউক্রেনিয় গদ্যের জনক' হিসেবে স্বীকার করা হয়।

শহরকেন্দ্রের অভিজাতরা, গোগোল-কথিত 'বিলাসিতা, দাসদাসীর জাঁকজমক, বাজপাখি, শিকারীর দল পোষা, ভোজনোৎসব আর দরবার বসানো' নিয়ে যারা ব্যস্ত, রাজপ্রশাসনের তল্পিবাহক হয়ে সুযোগসুবিধা কুড়ানোতেই যারা গৌরববোধ করে, তাদের মধ্যে ইউক্রেনিয় ভাষা পরিত্যাগ করার প্রবণতা অনেক দিন ধরেই বেড়ে উঠেছে। পোল রাজতন্ত্রের আধিপত্যের সময় পোল ভাষাতেই তাদের মোক্ষ, আবার রুশ জারের আধিপত্যের সময় রুশ ভাষাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। জারিনা ক্যাথেরিন-২-য়ের আমল থেকে জারতন্ত্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণায় রুশ জনজাতির মানুষদের ইউক্রেনের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে এসে জমি দখল করে

বসত গাড়াও আদতে রুশভাষী মানুষের সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়েছিল। কিন্তু রুশ ভাষার দাপট তৈরিতে মূল ভূমিকা নিল জারতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তি। একের পর এক বিধিনিয়ম চাপানোর মধ্য দিয়ে ব্যাপক সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা ইউক্রেনিয় ভাষার ব্যবহারকে সংকুচিত করার প্রয়াস শুরু হল। ১৬৮৪ সালে জার ঘোষণা করল যে ইউক্রেনিয় ভাষার যে কোনও প্রকাশনাকে এখন থেকে রুশ 'সেনসর'-য়ের ছাড়পত্র পেতে হবে। এই সেনসর ক্রমবর্ধমান হারে ইউক্রেনিয় ভাষায় যে কোনও প্রকাশনাকে, এমনকি ধর্মীয় প্রকাশনাকেও আটকাতে শুরু করল। তারপর ১৭২১ সালে গির্জা প্রকাশিত ধর্মপুস্তক ছাড়া ইউক্রেনিয় ভাষায় অন্য সমস্ত ধরনের প্রকাশনা মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। গির্জা প্রকাশিত ধর্মপুস্তকের ক্ষেত্রেও শর্ত চাপানো হল যে ইউক্রেনিয় ভাষায় ছাপা হলেও তাকে রুশ উচ্চারণবিধি ও ভাষারীতি মেনে চলতে হবে এবং রুশ সেনসরের ছাড়পত্র নিতে হবে। একটি ভাষার উপর আরেকটি ভাষার উচ্চারণবিধি ও ভাষারীতি চাপিয়ে দিয়ে সেই ভাষার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করার এ এক কালোপাহাড়ী প্রয়াস। ১৭২৭ ও ১৭২৮ সালে দুবার ডিক্রি জারি করে এই বিধিনিষেধ আরও পাকাপোক্ত করা হয়। এরপর ১৭৩৫ সালে গির্জাতেও ইউক্রেনিয় ভাষায় ছাপা বই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। গির্জার প্রার্থনা ও ভাষণেও ইউক্রেনিয় ভাষা নিষিদ্ধ করে রুশ উচ্চারণপ্রণালী মেনে গির্জার স্লাভ বাকরীতি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ১৮৬৩ সালে রুশ জারতন্ত্র এক গোপন সার্কুলার জারি করে। ইউক্রেনিয় কথ্যভাষার উপর ভিত্তি করে খুব দ্রুতই যে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ভাষা বিকশিত হচ্ছিল, তার পথ রুদ্ধ করাই ছিল এই সার্কুলারের মূল উদ্দেশ্য। এই সার্কুলারে ঘোষণা করা হয়েছিল রুশ ভাষাই মূল ভাষা, রুশ ভাষার থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনও ইউক্রেনিয় ভাষা হতে পারেনা। তেমন কোনও পৃথক ভাষা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আসলে রুশ ভাষার মধ্যে ভাঙন ঘটানোর অপচেষ্টা। সুতরাং শিক্ষা, সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা ও ধর্মতত্ত্বে ইউক্রেনিয় ভাষায় যেন কোনও কিছু ছাপা না হতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। এর ১৩ বছর পর ১৮৮৬ সালে জারি হল কুখ্যাত 'এমস ডিক্রি'। এই ডিক্রির মাধ্যমে প্রকাশ্যেই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় ভাষায় নাট্যাভিনয়, পাঠ, আবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হল, শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা বা ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হল। এমনকি রুশ-অধিকৃত ইউক্রেনের বাইরে থেকে (পোল্যান্ড বা অস্ট্রিয়া অধিকৃত ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশনা সম্ভব ছিল, এবং ক্রমশ তা বাড়ছিলও)

ইউক্রেনিয় ভাষার বই আমদানি করা বা পাঠাগারে রাখাও নিষিদ্ধ হল। একমাত্র পুরানো ঐতিহাসিক নথি ইউক্রেনিয় ভাষায় হলে প্রকাশিত হতে পারত, কিন্তু তাও রুশ হরফে (রুশ ও ইউক্রেনিয় ভাষার হরফ একই রকম হলেও সম্পূর্ণ এক ছিলনা। উচ্চারণরীতির পার্থক্য অনুযায়ী ইউক্রেনিয় ভাষায় কিছু অতিরিক্ত হরফ ও প্রস্বনচিহ্ন ব্যবহৃত হত।) বিকৃত করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় ভাষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ফল হয়েছিল মারাত্মক। ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার পক্ষাঘাত নেমে এসেছিল। গ্রামীণ কৃষক পরিবারের শিশুরা রুশ ভাষা জানত না, তাই মাতৃভাষা মাধ্যমের পাঠশালা নিষিদ্ধ হয়ে যখন তাদের রুশ ভাষা মাধ্যম স্কুলে টেনে নিয়ে আসা হল, 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার 'ব্যর্থতাই' সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বিশ শতকের গোড়ায় ইউক্রেনের পোলতাভায় দীর্ঘদিন শিক্ষক হিসেবে কাজ করা একজন বলেছিলেন যে ইউক্রেনিয় মাতৃভাষী ছাত্রদের রুশ ভাষা মাধ্যমে পড়তে বাধ্য করলে তৎক্ষণাৎ তারা নিখাদ মুখস্ত করে পার পাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই আবার সব ভুলে যায়, শিক্ষা হিসেবে কিছুই পড়ে থাকেনা। আরো বেশ কিছু শিক্ষকের নিজ অভিজ্ঞতা বিবরণ থেকে জানা যায় রুশ ভাষা মাধ্যমের স্কুলে ইউক্রেনিয় মাতৃভাষী ছাত্ররা অচিরেই সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলত, স্কুল তাদের কাছে নীরস একঘেয়ে হয়ে উঠত, স্কুল পালিয়ে 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' করে বেড়ানোয় মেতে উঠত। [ইউক্রেনের রুশ ভাষা মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে বোহদান ক্রুচেঙ্কো রচিত 'সোশাল চেঞ্জ অ্যান্ড ন্যাশনাল কনশাসনেস ইন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইউক্রেন' বইয়ে। বইটি ১৯৮৭ সালে কানাডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইউক্রেনিয়ান স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।] অন্যদিকে, এর ফলে রুশীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হল। ইউক্রেনে বসবাসকারী যে কোনও মানুষ, জনজাতিগতভাবে সে ইউক্রেনিয়ই হোক বা রুশ, পোল, জার্মান, বা ইহুদি হোক, রুশ-ভাষী ও রুশ ভাষা ব্যবহারকারী হয়ে ওঠাই হয়ে দাঁড়াল আত্মোন্নতির সোপান। যে কোনও সরকারি বা প্রশাসনিক কাজ, শহুরে পেশাগত বৃত্তিচর্চা, এমনকি ব্যবসার কাজেও একমাত্র রুশ ভাষা ব্যবহারেরই অনুমতি ছিল। ফলে, ইউক্রেনিয়দের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উচ্চাশা পোষণকারী ইউক্রেনিয়রা রুশ ভাষা-সংস্কৃতি আয়ত্ত করে রুশী হয়ে ওঠায় মন দিল। এই রুশীকরণের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল ইউক্রেনের শহরগুলোর উপর দিয়ে, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলকে তা ছুঁতে পারেনি। এভাবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে

একটা ফাটল তৈরি হয়েছিল। গ্রামের মানুষ শহরগুলোকে বা শহুরে মানুষকে নিজের দেশের অংশ বলে মনে করত না। উল্টোদিকে রুশীকৃত শহুরে বাবুরাও গ্রামের মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অবজ্ঞার চোখে দেখত।

পোল্যান্ড অধিকৃত ইউক্রেন ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় ভাষায় পাঠ, প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলনা, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্র-পোষিত ভাষা হিসেবে যথাক্রমে পোল ও জার্মান ভাষার দাপটের অধীনে ইউক্রেনিয় ভাষাকে থাকতে হত নেহাতই গুরুত্বহীন হয়ে।

৮

ইউক্রেনিয় জাতীয় পরিচয় নির্মাণ

স্বাধীন রাষ্ট্র-রূপ অর্জন করার গৌরব এবং আবার তা হারানোর যন্ত্রণা, এই দুই প্রান্তের মাঝে বহমান ইউক্রেনিয় কসাকদের যে উত্থান-পতনের কাল, পরাধীনতায় বন্দি ইউক্রেন যেন তার স্মৃতিতে অবগাহন করেই আবার মুক্ত হওয়ার শপথ নিতে চাইল।

মিখাইলো হ্রুসেভস্কি তাঁর 'ইউক্রেনের ইতিহাস'-য়ের সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় এই কসাক যুগ সম্পর্কে লিখলেন:

> স্মরণকালের মধ্যের ইতিহাসে, এই প্রথম ইউক্রেনিয় জাতি তার নিজের নিয়তি ও নিজের জীবন নিজেই নির্ধারণ করার সংকল্প নিয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এল, তার স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হল। কিন্তু, অনতিক্রম্য বাধার বিরুদ্ধে যুগের পর যুগ সংগ্রাম করার পর, তার ক্লান্ত রক্তাক্ত দেহ রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল। আশা ও স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। সেই ইউক্রেনিয় যোদ্ধাদের বংশধরের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বাইরের কোনও ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পর্বটাই ইউক্রেনিয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও আগ্রহোদ্দীপক পর্ব। তাই ইউক্রেনিয় জাতির ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরেই এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

খেয়াল করা যায় যে এখানে ইউক্রেনিয় জাতীয়তা ও কসাকত্বকে এক ও অবিচ্ছেদ্য করে হাজির করা হয়েছে। আর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এক 'ট্র্যাজিক হিরো'-র রণসাজে তাকে সাজানো হয়েছে। কসাকত্বর নির্যাস হিসেবে স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বশাসনের স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে নিষ্কাশন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই যেন ডাক দেওয়া হয়েছে রুশ-আধিপত্য বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য।

ইউক্রেনিয় জাতীয়তার এহেন নির্মাণ অবশ্য হ্রুসেভস্কির অভিনব কীর্তি নয়। ইভান মাজেপা যখন মাসকোভির জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, সেই সংবাদ পেয়ে ফ্রান্সে বসে ভলতেয়ার লিখেছিলেন 'ইউক্রেন সর্বদাই মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে' (মূল ফরাসিতে: L'Ukraine a toujours aspire a etre libre।) অন্তত ৩০০ বছর ধরে গ্রামীণ ইউক্রেনের পথে-ঘাটে-হাটে ভ্রাম্যমান কবি-গায়ক-নাটুয়ারা যে কসাকগাথা পরিবেশন করে এসেছে তার মূল সুরও ইউক্রেনের স্বাধীনতা আকাঙ্খার সঙ্গে কসাকত্বকে বেঁধেছে। এরপর ১৯ শতকের মাঝে এসে 'ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস সিরিল অ্যান্ড মেথোডিয়স' সংগঠন গঠন এবং তারাস শেভচেঙ্কোর কবিপ্রতিভার বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় জাতীয়তা একটা সর্বগ্রাহ্য অবয়ব নেওয়ার দিকে এগোল।

'ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস সিরিল অ্যান্ড মেথোডিয়স' নামক আধা-রাজনৈতিক আধা-সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৮৪৫ সালে জন্ম নিয়েছিল। এর জন্মদাতা ছিল ইউক্রেনিয় বিদ্যাচর্চাকারীদের একটা ছোট গোষ্ঠী, যার নেতা ছিলেন ইতিহাসবিদ মিকোলা কোস্তোমারভ (১৮১৭–১৮৮৫)। মিকোলা কোস্তোমারভ রুশ জাতীয়তার বিপ্রতীপে ইউক্রেনিয় জাতীয়তার চিহ্নগুলোকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে, রুশ জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র-কেন্দ্রিকতা এবং হিংসাত্মক পথে জোর খাটিয়ে কেন্দ্রীভূতকরণ করা। তার বিপরীতে, ইউক্রেনিয় জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি গণতান্ত্রিক নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে চিহ্নিত করেছিলেন। রুশ আধিপত্যের অবসান করে উদারনৈতিক সংবিধানতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গঠিত স্লাভ জনজাতিগুলোর ভ্রাতৃত্বমূলক যুক্তরাষ্ট্র গঠনকে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে হাজির করেছিলেন। ইউক্রেনিয় জাতিকে নিজ স্বভাববৈশিষ্ট্যে দৃঢ় থেকে এই কর্মসূচী রূপায়নে প্রধান ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি ডাক দিয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তারাস শেভচেঙ্কো (১৮১৪–১৮৬১)।

ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে শৈশবেই ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিলেন তারাস শেভচেঙ্কো। নিজের মনেই তিনি কবিতা ও গান বাঁধতেন, আবৃত্তি করতেন, গাইতেন। তাঁর এই সহজাত দক্ষতা তাঁর ভূস্বামী মালিক পাভেল এঙ্গেলহার্ডট-য়ের নজরে পড়ে। সাহিত্যানুরাগী এঙ্গেলহার্ডট তাঁকে রুশ ভাষা লিখতে ও পড়তে শেখান এবং সঙ্গে করে রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে নিয়ে গিয়ে রাশিয়ার তৎকালীন নামজাদা কবি-লেখকদের মহলে পেশ করেন।

সেই রুশ কবি-লেখকরা বালক শেভচেঙ্কোর প্রতিভায় চমৎকৃত হন। প্রতিভাবান বালককে নির্বিঘ্নে সাহিত্যচর্চা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁরা মালিকের কাছ থেকে ভূমিদাস শেভচেঙ্কোর স্বাধীনতা কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। শেভচেঙ্কো ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত হন। কিন্তু শেভচেঙ্কো রুশ ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করে যশ-খ্যাতি-সম্পদ লাভের আত্মোন্নতির পথ নেননি। তিনি নেন ইউক্রেনিয় ভাষায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় স্বাধীনতার আহ্বান রচনার কঠিন পথ। সে পথে লেখা মুদ্রণের সম্ভাবনা খুবই কম, সবসময় রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষু কন্ঠরুদ্ধ করতে উদ্যত, তবু শেভচেঙ্কো সহজ স্বাভাবিকতায় এই পথই বেছে নিয়েছিলেন। 'ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস সিরিল অ্যান্ড মেথোডিয়স' সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী হলেও রাজনৈতিক ভাবনায় মিকোলা কোস্তোমারভের সঙ্গে তাঁর কিছু ফারাক ছিল। ইউক্রেনিয় জনগণ, বিশেষ করে ইউক্রেনের কৃষকদের মর্মান্তিক দুরবস্থার জন্য তিনি সরাসরি রুশ জারতন্ত্র ও রুশ জাতীয়তাবাদী আধিপত্যকে দায়ী চিহ্নিত করেছিলেন। ইউক্রেনিয় জাতীয়তার এক বিপ্লবী বিকাশ, যার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের গ্রামসমাজ স্বাধীন স্বনিরূপিত পথে বিকাশ ও স্বশাসন গড়ে তুলতে পারবে, তাকেই তিনি মুক্তির পথ হিসাবে হাজির করেছিলেন। কসাকগৌরবের ঐতিহ্যকে তিনিও ইউক্রেনিয় জাতীয়তার মৌল বিদ্রোহী সত্তা হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। ইউক্রেনিয় ভাষা, সংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের গভীর অনুরাগী এই কবির বিপ্লবের ডাক তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউক্রেনিয় ভাষার প্রচলিত খ্রিস্টমাস ক্যারলের ছন্দে তালে বাঁধা তাঁর কবিতা তার অসাধারণ প্রকাশক্ষমতার গুণে ও ছন্দবৈচিত্র্যের সজীবতায় সাধারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে যেমন আকৃষ্ট করত, তেমনই বিদ্রোহী সত্তাকেও জাগিয়ে তুলত। বিদ্রোহের কবিয়াল হিসেবে তিনি ইউক্রেনের নবজাগরণের হোতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

রুশ জারতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই 'ব্রাদারহুড'-কে ক্ষমা করেনি। 'ব্রাদারহুড' সংগঠন রাজদ্রোহিতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল। জারতন্ত্রের দমনবাহিনী সংগঠনের সমস্ত সদস্যকে খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করে শাস্তি দিয়েছিল। সবচেয়ে চরম শাস্তিটি বরাদ্দ হয়েছিল তারাস শেভচেঙ্কোর জন্য।

তারাস শেভচেঙ্কোর জীবনে অকালে দাঁড়ি টেনে দিতে সক্ষম হলেও রুশ জারতন্ত্র শেভচেঙ্কোর কবিতার মধ্য দিয়ে ভাষাপ্রেমী, ঐতিহ্যপ্রেমী, আধিপত্যবিরোধী বিদ্রোহী বার্তার ছড়িয়ে যাওয়া কোনওভাবেই রুদ্ধ করতে

পারেনি। সরকারি স্কুলে ইউক্রেনিয় ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ হলেও গ্রামে-গঞ্জে-শহরে বিদ্রোহী যুবক-শিল্পী-লেখকরা গড়ে তুলেছিল অসংখ্য রবিবারের স্কুল। এই সমস্ত রবিবারের স্কুল বেশিরভাগই প্রশাসনের নজর থেকে নিজেদের আড়াল করে চলতে বাধ্য হলেও তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাত্রা বেড়েই চলেছিল। এসব স্কুলে ইউক্রেনিয় ভাষা লিখতে পড়তে শেখানোর পাশাপাশি ইউক্রেনিয় লোকগাথা, কসাকগাথা, গান, গীতিনাট্যও পাঠ করা হত। ইউক্রেনিয় ভাষাব্যবহারের উপর চাপানো সরকারি বিধিনিষেধকে তুড়ি মেরে জনগোষ্ঠীর ভিতরে ও ব্যক্তিগত ব্যবহারে ইউক্রেনিয় ভাষাব্যবহারকে বিস্তৃত করার নানা উদ্যোগ নেওয়া হত। এছাড়াও তরুণ সংগ্রাহকের দল গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ইউক্রেনিয় ভাষার বিবিধ বৈচিত্র্যময় ভাষারীতি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গান, কথকতা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। ইউক্রেনিয় ভাষার ক্ষত বুজিয়ে জাতীয় পুনর্জন্মের আঁতুড়ঘর গড়ার সাড়া পড়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দমনকারী হাত শত হাতড়িয়েও তাকে মুঠোবন্দি করে নিঃশেষ করতে পারেনি।

শেভচেঙ্কোর অনুপ্রেরণায় এই জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ প্রয়াস কৃষকের মুক্তি আকাঙ্খাকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিল। কসাক জনপদের গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বশাসনের আদল তার কাছে ভবিষ্যতের মুক্ত সমাজ গড়ার যাত্রার প্রস্থানবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ১৮৬১ সালে ভূমিদাসত্ব প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা হওয়ার পর এই প্রবণতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। রুশ বা পোল ভাষী ভূস্বামী, ব্যবসাদার ও অভিজাতদের শোষণবন্ধন থেকে ইউক্রেনিয়ান-ভাষী কৃষকদের মুক্ত হওয়া যেন ইউক্রেনিয়ান ভাষা ও জাতির মুক্তির সমার্থক হয়ে উঠল।

প্রতিভাবান তরুণ গবেষক হিসেবে মিখাইলো হ্রুসেভস্কি যখন ১৯ শতকের শেষ দশকে ইউক্রেনিয় ভাষায় ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করার তুলনামূলক সুবিধার সুযোগ নিতে পোল-অধিকৃত ইউক্রেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে যোগ দিলেন, তখন তিনি ইউক্রেনিয় ভাষায় ইউক্রেনিয় ইতিহাস চর্চার জন্য যে গবেষকদল গড়ে তুলেছিলেন, তার নামও তারাস শেভচেঙ্কোর নামে 'শেভচেঙ্কো সোসাইটি' রেখেছিলেন। ইউক্রেনিয় ভাষায় সর্বোচ্চ মানের বিদ্যাচর্চা-গবেষণা করা যে সম্ভব তা এই গবেষকদল তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল।

সুতরাং ২০ শতকের গোড়ায় এসে হ্রুসেভস্কি যখন তাঁর 'ইউক্রেনের ইতিহাস'-য়ের সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় কসাকদের মধ্য দিয়ে হাজির হওয়া স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বশাসনের আকাঙ্খাকে ইউক্রেনিয় জাতীয়তার সঙ্গে

সমার্থক করে হাজির করলেন, তখন তা আসলে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণের এই ধারার অংশ হিসেবেই করলেন।

হ্রুসেভস্কির 'ইউক্রেনের ইতিহাস'-য়ের সিংহভাগ জুড়ে আছে কসাক ইতিবৃত্ত। দীর্ঘ সময় জুড়ে প্রকাশিত ১০টি বৃহৎ খণ্ডে ১৭ শতকের মাঝে এসে যদি তা না অসমাপ্ত থেকে যেত, তাহলে কসাক ইতিবৃত্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হত। যতটা পর্যায় হ্রুসেভস্কি আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি পোল রাজতন্ত্রের শাসনকে ইউক্রেনিয় জাতির জীবনে অন্ধকারের যুগ হিসেবে দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার যোদ্ধা হিসেবে নিপরো কসাক, বিশেষ করে জাপোরোজীয় কসাকদের তুলে এনেছেন। তাঁর সামগ্রিক উপস্থাপনার কাল ও স্থানগত ব্যাপ্তি বিপুল। সেই প্রাচীনতম কিয়েভিয় রুস-য়ের সময় থেকে কসাক যুগ অবধি তিনি ইউক্রেনিয় ভাষা-সভ্যতা ও জনজাতির পরিচয় হাজির করেছেন। ইউক্রেনিয় জনজাতির বসতি সম্পন্ন সমস্ত অঞ্চল, পশ্চিমের ট্রান্সকারপেসিয়া ও গালিসিয়া থেকে পুবের আজভ স্তেপভূমি ও কুবান উপদ্বীপ অবধি তিনি তাঁর নিরীক্ষণ বিস্তৃত করেছেন। ফলে কোনও খণ্ডিতাংশ নয়, তিনি যেন ইউক্রেনিয় জাতিকে তার সামগ্রিকতায় হাজির করছেন। রাষ্ট্রের ইতিহাস, অভিজাতদের ভূমিকা ও সংস্কৃতি উপেক্ষা না করেও তিনি তাঁর ইতিহাসে প্রধান কুশীলব করে তুলেছেন সাধারণ মানুষকে আর এই সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই ইউক্রেনিয় জাতীয় পরিচয় ও জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে মূর্ত করে তুলেছেন। এবং এই গোটা গবেষণা ও উপস্থাপনা বিদ্যাচর্চার রীতি ও শৈলীর সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদকে সম্মানের আসন দিতে তা দরকারি হলেও সাধারণ্যে প্রচারের জন্য তা অতিরিক্ত পৃথুল বটে। তাই হ্রুসেভস্কি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য এর একটি সারসংক্ষেপিত একখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করলেন ১৯১১ সালে, যার পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হল পরের বছর ১৯১২ সালে। এই বইটি রুশ-অধিকৃত ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশিত হতে পেরেছিল কারণ তার ৬ বছর আগে ১৯০৫ সালে ইউক্রেনিয়পন্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে জারতন্ত্রী প্রশাসন। যে বিপুল জনপ্রিয়তা এই বই লাভ করেছিল তা ইউক্রেনিয় জাতীয়তা ভাবনার পুনরুত্থানের পরিচায়ক। পাঠকদের কাছ থেকে বহু চিঠি হ্রুসেভস্কি

পেয়েছিলেন। তার অনেকগুলো আজকের ইউক্রেনে তাঁর নামাঙ্কিত লেখ্যাগারে সংরক্ষিত আছে। কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

প্রথমেই যা নজর কাড়ে তা হল চিঠিগুলো ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা। বোঝা যায় যে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণের অংশ হিসেবে ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখার ও পড়ার যে বিদ্রোহী চর্চা তৈরি হয়েছিল, এঁরা তার অংশ। ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে ইউক্রেনের তারাসচা থেকে ও হ্রুংকো নামক একজন শিক্ষক হ্রুসেভস্কিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি বহু খণ্ডের বিশদ ইতিহাস জোগাড় করে পড়া শুরু করেছেন। জারতন্ত্রের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে সাইবেরিয়ায় আটক এক ইউক্রেনিয় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মতো বহু ইউক্রেনিয় রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিতজন তাঁর লেখা ইউক্রেনের ইতিহাস পড়তে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু বহু খণ্ডের বিশদ ইতিহাস তো দূরের কথা, একখণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কেনার মতোও আর্থিক সংস্থান নেই। কীভাবে তাঁদের মতো মানুষের কাছে বই পৌঁছানো যায় তা নিয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উস্ত-সিসোলস্ক থেকে আরেকজন রাজনৈতিক নির্বাসিত হ্রিহোরি পোরেভিচ চিঠি লিখেছিলেন একই অনুরোধ জানিয়ে। সাইবেরিয়া থেকে একজন ইউক্রেনিয় শ্রমিক এফ ইয়ারোনোভেতস্কি হ্রুসেভস্কির সহযোগী লেভ ইউরকেভিচকে চিঠি লিখেছিলেন। হ্রুসেভস্কির সংক্ষিপ্ত ইউক্রেনের ইতিহাস সহ ইউক্রেনিয় ভাষার অন্যান্য বই পাঠানোর জন্য তিনি ইউরকেভিচকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর হ্রুসেভস্কির বই পড়ে তাঁর উত্তেজনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

> আবার আমি আপনাকে বইগুলো পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই। বইগুলোর মূল্য আমার কাছে অসীম। এতাবধি জীবনে এমন বই আমি আর পড়িনি। এতকাল আমি ভেবে এসেছি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিতুলনায় আমাদের ইউক্রেনের অস্তিত্ব কখনও তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখন এ বই পড়ে আমি জানতে পারলাম যে রুশভক্তরা আমাদের যা বলে আমাদের ইউক্রেন তার থেকে অনেক আলাদা, অনেক তাৎপর্যময়।... আমি জানতে পারলাম যে অতীতে ইউক্রেন সাংস্কৃতিকভাবে রাশিয়ার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। তার নিজস্ব প্রাচীন ভাষা ও লিখনশৈলী ছিল। আর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো সেও তার যোদ্ধাবাহিনীর বীরত্বের মধ্য দিয়ে গৌরব অর্জন করেছিল।

ইয়ারোনোভেতস্কি বলেছিলেন যে হ্রুসেভস্কির লেখা পড়ে তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন কীভাবে রুশ শাসকরা ইউক্রেনের সঙ্গে অন্যায় করে গেছে এবং করে চলেছে।

রুশ জারতন্ত্রের গুপ্ত পুলিশও এই জাতীয়তাবাদী গণজাগরণ নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিল এবং খবরসংগ্রহের জন্য তার গুপ্তচরদের ইউক্রেনের বিভিন্ন সভাসমিতির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। রাশিয়ার পুলিশের নথি থেকে এমনই একজন গুপ্তচরের পাঠানো প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। গুপ্তচরটির ছদ্মনাম ছিল 'গোগোল'। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে তার নিয়োগকর্তাদের সে জানিয়েছিল যে খারকিভে কারিগরী ছাত্রদের একটি দল একটা গোপন সভা সংগঠিত করেছিল। সেখানে হ্রুসেভস্কির 'ইউক্রেনের ইতিহাস' থেকে পাঠ করা হয়। তারপর মূল আলোচক বাজহানভ তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে রুশ ইতিহাসবিদরা মিথ্যা গল্প ফেঁদে ইউক্রেনের অতীতকে চুরি করতে চাইছে, রাজা মহান ভোলোদোমোর সহ গোটা কিয়েভিয় রুস আসলে ইউক্রেনিয়ার ইতিহাসের অংশ, রাশিয়ার ইতিহাসের অংশ নয়।

সুতরাং বোঝা যায় যে শ্রমিক থেকে শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী থেকে প্রযুক্তিবিদ, ইউক্রেনের সমাজের বিভিন্ন অংশের চেতনায় ইউক্রেনিয় জাতীয়তার ভাবনা কল্লোল তুলেছে। ইউক্রেনিয় জাতীয় পরিচয় নির্মাণ একটা মান্য স্তরে এসেছে পৌঁচেছে।

৯

বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লব, স্বশাসনের উদ্যোগপর্ব

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। একদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও তাদের মিত্ররা। অন্যদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও তাদের মিত্ররা। দু পক্ষের রাষ্ট্রগুলোরই ভৌগোলিক বিস্তারের উচ্চাকাঙ্খা, অর্থাৎ আরো নতুন অঞ্চলকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসার আকাঙ্খা এই যুদ্ধের আসল কারণ। রাশিয়া এই যুদ্ধে যোগ দিল ফ্রান্স-ব্রিটেনের পক্ষে। রুশ জারতন্ত্রের খোয়াব ছিল যে যুদ্ধে জয়ীদের দলে থাকতে পারলে যুদ্ধপরবর্তী ভাগবাটোয়ারার সময় কনস্তানতিনোপল সহ তুরস্কের বড় অঞ্চল করায়ত্ত করা যাবে। তৎকালীন ইউরোপিয় মহলে রাশিয়া সম্পর্কে এ কথা চালু ছিল যে রুশ সেনাবাহিনীর লোকবল অসীম, অর্থাৎ, যুদ্ধে গুলি-বোমা-বারুদের মুখে জনসমাজ থেকে বলি হাজির করার অফুরান ভাণ্ডার জারের কব্জায় আছে। সুতরাং সেই অনুযায়ী গোটা রাশিয়ার মতো ইউক্রেনের গ্রাম থেকেও হাজার হাজার কৃষককে যুদ্ধে পাঠানো হতে লাগল।

গ্রামের পরিবারের বাবা বা স্বামীরা গেছে যুদ্ধে। যে পারিশ্রমিক সেনা হিসেবে তাদের দেওয়া হয় তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে গ্রামের বাড়িতে তারা প্রায় কিছুই পাঠাতে পারেনা। ফলে পরিবারের মহিলা, তরুণ, এমনকি শিশুরাও বাধ্য হয়েছে মজুরির জন্য খাটতে বেরোতে। ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা চুটিয়ে এর সুযোগ নিয়েছে। আগে তারা যে মজুরি দিত, একধাক্কায় তা প্রচুর কমিয়ে দিয়েছে। আগেকার পুরুষ মজুরদের মজুরির ৩০ থেকে বড়জোর ৫০ শতাংশ মজুরি তারা এখনকার মহিলা বা তরুণদের দিচ্ছে। অন্যদিকে, যুদ্ধশুরুর পর ১৮ মাস যেতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া হল। ১৯১৬ সাল জুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার পর ১৯১৭ সালে জিনিষের দাম যুদ্ধশুরুর সময়ের তুলনায় কোনওটা সাড়ে তিন গুণ, কোনওটা চার গুণ, কোনওটা এমনকি ছয়

গুণ হয়ে দাঁড়াল। ইউক্রেনিয় গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের একটা অতি ছোট অংশ বাদ দিলে বাকি পুরোটাই মাঝারি বা ছোট কৃষক অথবা মজুর। তাদের জীবনযাত্রার মান অভাবনীয় তলানিতে গিয়ে পৌঁছল। এর উপর ছিল আবার যুদ্ধের কসাইখানায় পরিবারের সোমত্থ পুরুষটির নিহত বা আহত হওয়া।

একইরকম দুরবস্থা ঘনিয়ে এসেছিল রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের জীবনেও। রাজধানী পিটার্সবুর্গ বা পেত্রোগ্রাদে শ্রমিকদের মজুরি ১০০ শতাংশ বাড়লেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল ৩০০ শতাংশ। তার উপর ছিল খাদ্যদ্রব্য ও ব্যবহার্য জিনিষপত্রের আকাল। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করার পরও দোকানে জিনিষ না পাওয়া, অগ্নিমূল্যের ছ্যাঁকা, আবার অন্যদিকে কয়লার অভাবে ঘর গরম করার আগুন জ্বালতে না পেরে রাশিয়ার দারুণ শীতে জমে যাওয়া— এসব মিলে ১৯১৭-র শুরুতে রাজধানীর পরিস্থিতি দাহ্য করে তুলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধে অকারণে কচুকাটা হওয়ার পরিণতি নিয়ে সেনাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের আঁচ এসে পৌঁছানো। ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারির এক দিনে রাজধানীর শ্রমিক মহল্লার মহিলারা রুটির দাবিতে বিক্ষোভে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। খুব দ্রুতই তা গোটা দাহ্য পরিস্থিতিতে আগুন ধরিয়ে দিল। কারখানার শ্রমিকরা এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। পুলিশ ও সেনারা তাদের উচ্চপদস্থ কর্তাদের নির্দেশ অমান্য করে তাদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করল। বিদ্রোহী জনতা একের পর এক পুলিশফাঁড়ি দখল করে নিল, অস্ত্র হাতে তুলে নিজেরাই টহলদার বাহিনী গড়ে তুলল। শ্রমিকরা কারখানাগুলো দখল করে নিল তাদের তৈরি করা ফ্যাক্টরি কমিটিগুলোর মাধ্যমে। ব্যপক সেনাবিদ্রোহের আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠল। এই পরিস্থিতি জারকে বাধ্য করল শাসনক্ষমতা ছাড়তে। জারের শাসন ভেঙে পড়ল। উদারপন্থী ও সমাজ-গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদরা জার-পরবর্তী রাষ্ট্রগঠনের কাজে সামিল হল। আবার জারতন্ত্রী জেনেরাল কর্ণিলভ সেনাপত্র জুটিয়ে জারতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ফাঁদলেন।

এসময় ইউক্রেনের গ্রামের কৃষকরা রুখে দাঁড়ালেন। বড় জমিমালিক ও ধনী কৃষকদের খাজনা দিতে অস্বীকার করে গ্রামের কৃষকরা তাদের পরিশ্রমের ফসলের উপর নিজেদের অধিকার ঘোষণা করল। চাষের জমির উপরও নিজেদের অধিকার কায়েম করতে শুরু করল। ইউক্রেনের জাপোরোজীয় এলাকায় এই আন্দোলন বড় আকার ধারণ করল ১৯১৭-র আগস্ট মাস থেকে। জারতন্ত্রী প্রশাসনের অবশিষ্ট খাজনা-অস্বীকার ও জমি-অধিকার আটকে

জমিমালিক ও ধনী কৃষকদের আড়াল করতে উদ্যত হলে কৃষকরা গ্রামেগঞ্জে পুলিশ-প্রশাসনের উপর আক্রমণ হেনে অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নিল। একইসঙ্গে, জমিমালিক, ধনী কৃষক, ধর্মীয় মঠ ও রাষ্ট্রের দখলে থাকা কৃষিজমি, খামার, পালিত পশু ও কৃষি উপকরণ দখল করে নিয়ে তার উপর গ্রামের কৃষক-মজুরদের সাধারণ মালিকানা ঘোষণা করল। নিজেদের মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গড়ে তুলল এই সমস্ত সাধারণ সম্পদ দেখভাল ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য। এভাবে গড়ে উঠল বিভিন্ন গ্রাম-কমিউন। একাতেরিনোস্লাভ, খেরসন, পোলতাভা, খারকিভ এবং অংশত তাভরিপোলে বিপ্লবী কৃষকরা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের গ্রাম থেকে বের করে দিল, অথবা তাদের হাত থেকে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নিল, কৃষকদের কমিটিই সমস্ত প্রশাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। গ্রামে সাধারণ সভা করে সমস্ত বিচার নির্বাহ হতে লাগল। এইরকম গ্রাম-কমিউনগুলোর স্বশাসন ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামসমাজের স্বাধীনতাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। যে কোনও রকমের কেন্দ্রীভূত শাসনকে তারা সন্দেহ করত, এমনকি যদি তা তাদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত না হওয়া 'পিপলস কমিশার'-দের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের কেন্দ্রীভূত শাসন হয়, তা হলেও।

এর কিছুদিন আগে কিয়েভ শহরে ইউক্রেনিয় জাতীয় আন্দোলন তার এক তুঙ্গ মুহূর্ত স্পর্শ করেছে। রুশ জার নিকোলাস-২ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ মোটে গড়িয়েছে। কোনও কিছুই আর অসম্ভব নয়, এমন ভাবনার উত্তেজনা তখন আকাশে-বাতাসে। পয়লা এপ্রিল, ১৯১৭। রবিবারের সকালবেলা। খ্রেসচাতিক নামে কিয়েভ শহরের প্রধান রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। হাজার হাজার মানুষ আবেগে উত্তেজনায় টইটম্বুর হয়ে পথে নেমেছে। অনেকের হাতে পতাকা। কোনও পতাকা নীল ও হলুদ রঙের— ইউক্রেনের জাতীয় পতাকা। আবার কোনও পতাকা লাল রঙের— সমাজতন্ত্রের পতাকা। কর্মচারী, সরকারি আধিকারিক, সেনা, কারখানার শ্রমিকদের পাশাপাশি হাজির অসংখ্য শিশু-কিশোর। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সামিল হওয়া এক দল মানুষ বাজনা বাজাচ্ছে। বহু হাতে উঁচিয়ে ধরা একাধিক ব্যানার। কোনও ব্যানারে ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা: 'মুক্ত রাশিয়ায় মুক্ত ইউক্রেন', আবার কোনওটায় লেখা: 'তার স্বাধীন হেটমানকে নিয়ে স্বাধীন ইউক্রেন'। জাতীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কোর ছবি কেউ উঁচিয়ে ধরে আছে। বক্তৃতার অস্থায়ী মঞ্চে

একের পর এক বক্তা ইউক্রেনিয় ভাষায় বক্তৃতায় নবপ্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল রাদা' সরকারকে সমর্থন করার জন্য জনতাকে আহ্বান করছে। 'সেন্ট্রাল রাদা' কথাটার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'কেন্দ্রীয় পরিষদ'। রুশ ভাষায় 'সোভিয়েত' মানেও পরিষদ। ইউক্রেনিয় ভাষার 'রাদা' আর রুশ ভাষার 'সোভিয়েত' সমার্থক। অর্থাৎ, সোভিয়েত ধাঁচার বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হচ্ছে। সবশেষে বক্তৃতা দিতে উঠলেন এই নবগঠিত 'সেন্ট্রাল রাদা'-র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া মাঝবয়স্ক মানুষটি। লম্বা দাড়ি, চোখে চশমা। তিনি মিখাইলো হ্রুসেভস্কি। সমবেত জনতা তাঁকে আবেগভরা অভিবাদন জানাল 'স্লাভা বাতকোভি হ্রুসেভস্কোমু' বলে। বাংলায় তার মানে: 'পিতা হ্রুসেভস্কি ধন্য'। হ্রুসেভস্কি সমস্ত জনতাকে শপথ নিতে বললেন:

> আজকের এই মহালগ্নে আসুন আমরা সবাই এক হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বসমন্বিতভাবে আমাদের সামনে হাজির হওয়া মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এবং মুক্ত ইউক্রেনকে গড়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগে অবধি কোনওরকম বিশ্রাম বা কাজে অব্যাহতির চিন্তা মনে না আনতে শপথ নিই।

জনসমুদ্র গর্জন করে উত্তর দিল 'শপথ নিলাম'।

ইউক্রেনের ইতিহাসের গবেষক, ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার প্রসারিত করার যোদ্ধা হ্রুসেভস্কি উনিশ শতকের শেষে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন, তাঁর মনে হয়েছিল যে ইউক্রেনের জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য তখন তা দরকার। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি 'ইউক্রেনিয় জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি'-র গোড়াপত্তনের অংশীদার হন। রুশ-অধিকৃত ইউক্রেনে জারতন্ত্রী নিষেধাজ্ঞার জন্য তখন তা সম্ভব ছিল না, পোল-অধিকৃত ইউক্রেনের গালিসিয়ায় এই পার্টির পত্তন হয়েছিল। পত্তনের সময় থেকেই স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইউক্রেন গড়ার ডাক দিয়েছিল এই পার্টি। ক্রমশ হ্রুসেভস্কি ও আরো কয়েকজন পত্তনকারী এই পার্টির কর্মসূচীতে জমির উপর অধিকারসহ কৃষকদের নানা দাবি অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁরা বলেন যে স্বাধীন কৃষক ছাড়া স্বাধীন ইউক্রেন সম্ভব নয়। পার্টিটি সমাজ-গণতান্ত্রিক চরিত্র নেয়।

হ্রুসেভস্কি সহ 'সেন্ট্রাল রাদা'-র বুদ্ধিজীবী নেতারা স্বঘোষিত জাতীয় প্রতিনিধি হিসেবে শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের আশু লক্ষ্য ছিল গণসমর্থন জোগাড়ের মধ্য দিয়ে শাসনের বৈধতা গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে ১৯১৭ সালের ১৯শে এপ্রিল কিয়েভের জাতীয় ফিলহার্মনিক কনসার্ট কক্ষে তাঁরা সর্ব-ইউক্রেনিয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাক দিলেন। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার

আঞ্চলিক সমিতি দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, শহরের কারখানাগুলো থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, মোট ১৫০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি সেখানে জড়ো হয়েছিল। এর পরও আরও বেশ কিছু এমন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সমাজের অভিজ্ঞ বয়স্কজন, কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'সেন্ট্রাল রাদা'-র ১৯১৭ সালের 'প্রথম সাধারণ বার্তা' (ফার্স্ট ইউনিভার্সাল) প্রকাশিত হয়, যেখানে ডাক দেওয়া হয়:

> ইউক্রেনিয় জনগণ! নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন আপনাদের নিজেদের হাতে। সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলা ও ধস নামার এই প্রহর আজ পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিজেদের ঐক্যমত্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা দিয়ে প্রমাণ করুন যে শস্য উৎপাদকদের জাতি হিসেবে আপনারা যে কোনও সংগঠিত ক্ষমতাশালী জাতির পাশে সমান মর্যাদার ও সমান গর্বের স্থান করে নিতে পারেন।

এই সাধারণ বার্তায় কয়েকটি বিষয় বেশ নজর করার মতো। এখানে ইউক্রেনকে 'শস্য উৎপাদকদের জাতি' বলার মধ্য দিয়ে কৃষকদেরই জাতীয় জীবনের নির্ধারক শক্তি হিসেবে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপামর মানুষের রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে জাতিগঠনকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে বোঝা যায় যে 'সেন্ট্রাল রাদা'-র বুদ্ধিজীবী নেতারা নিজেদের হুকুম জারি করার চেয়ে জাপোরোজীয় অঞ্চলে দানা বাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-সক্রিয়তার মতো ব্যাপক গ্রামীণ মানুষের সক্রিয়তার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে চাইছিল। এর ছাপ তার আশু পদক্ষেপগুলোর মধ্যেও পড়েছিল। বড় জমিমালিক, ধর্মীয় মঠ বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খামারের থেকে কৃষিজমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার প্রস্তাব সে গ্রহণ করেছিল। ১৯১৭ সালের জুনে ঘোষিত সাধারণ বার্তায় 'সেন্ট্রাল রাদা' বলেছিল:

> নিজেদের জমির ব্যবস্থাপনা কীভাবে করতে হবে তা আমাদের কৃষকদের চেয়ে ভালো আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই, রাশিয়া জুড়ে জার, রাষ্ট্র, ধর্মীয় মঠ ও অভিজাতজনেদের কুক্ষিগত থাকা সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর ও সর্বরুশ সাংবিধানিক সম্মেলন দ্বারা এই মর্মে আইন তৈরি হওয়ার পর, ইউক্রেনিয়ার সমস্ত জমি ব্যবস্থাপনার অধিকার আমাদের এই ইউক্রেনিয় সভার হাতেই আসবে... ইউক্রেনিয়ার জনগণ তাঁদের মধ্য থেকে এই 'সেন্ট্রাল রাদা'-র সভাকে নির্বাচিত করে স্বাধীন স্বশাসিত ইউক্রেনের নতুন কাঠামো গড়ার দায়িত্ব আরোপ করেছেন।

এই সাধারণ বার্তাতেই ইউক্রেনের স্বশাসন দাবি করা হয়েছিল। লক্ষ্য করা যায় যে 'সেন্ট্রাল রাদা' তখনও সর্বরুশ সাংবিধানিক সম্মেলনের দিকেই চেয়ে ছিল বিপ্লবী ভূমিসংস্কারের আইন লাগু করার জন্য। কিন্তু জাপোরোজীয় অঞ্চলের কৃষকরা এই অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না তা আমরা আগেই দেখেছি। তাছাড়া কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণও লাগুকরণ ব্যবস্থার প্রতি অনীহাও জাপোরোজীয় কৃষকদের অনেক বেশি ছিল।

'সেন্ট্রাল রাদা' ইউক্রেনের বিভিন্ন অংশকে স্বাধীন স্বশাসিত জাতি গড়ার উদ্যোগে সামিল করার চেষ্টা করেছিল। ইউক্রেনের ইহুদি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের সংগঠনের সঙ্গে, ইউক্রেনের সোশালিস্ট রিভলুশনারি পার্টির বাম ঝোঁকসম্পন্ন অংশের সঙ্গে জোট গড়ে তুলেছিল। আর ছিল ইউক্রেনিয় সেনারা। রুশ জারের সেনাবাহিনীতে ৩০ লাখ ইউক্রেনিয় সেনা ছিল, আবার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সেনাবাহিনীতেও ২.৫ লাখ ইউক্রেনিয় সেনা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুবপ্রান্তীয় যুদ্ধক্ষেত্রে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়েছিল। এদের প্রায় সবাই ছিল ইউক্রেনের কৃষক-পরিবারের পুরুষ। 'সেন্ট্রাল রাদা' গঠন হওয়ার পর এদের মধ্যে থেকে ৩ লাখ সেনা তাদের পূর্বতন বাহিনী ছেড়ে এসে ইউক্রেনের জায়মান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করল।

ইতিমধ্যে অক্টোবরে রাশিয়ায় বলশেভিকরা ক্ষমতাদখল করল এবং সর্বরুশ সাংবিধানিক সম্মেলনকে ভেঙে দিল। ফলে 'সেন্ট্রাল রাদা'-রও আর অপেক্ষা করার কিছু থাকল না। যা করতে হবে এখন 'সেন্ট্রাল রাদা'-কে নিজেকেই করতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে 'সেন্ট্রাল রাদা' ইউক্রেনকে স্বশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করল এবং ইউক্রেনের সাংবিধানিক সম্মেলন আহ্বান করল।

স্বশাসিত ইউক্রেন গঠনের এই উদ্যোগপর্বে ইউক্রেনিয় ভাষা সম্মানের জায়গা পেল। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এই ভাষার স্রোত প্রবাহিত ছিলই। এখন জাতীয় পুনর্জাগরণ ও সামাজিক মুক্তির সঙ্গে মাতৃভাষা ইউক্রেনিয় ব্যবহার সমার্থক হয়ে ওঠায় ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্র অনেক বাড়ল। সরকারি আধিকারিক ও আমলারা ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করল বা ব্যবহার করতে বাধ্য হল কারণ কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ বহুক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে অন্য কোনও ভাষায় কোনওরকম জ্ঞাপন করতে অস্বীকার করল। সরকারি দপ্তর ও কোর্ট-কাছারিতে কৃষকরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করত এবং দাবি করত যে কর্তৃপক্ষও সেই ভাষাতেই উত্তর দেবে। 'সেন্ট্রাল রাদা'-র

পক্ষ থেকেও সর্বস্তরে ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিদ্যাচর্চার মহলে ইউক্রেনিয় ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল এবং তার পথ প্রশস্ত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ইউক্রেনিয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ হচ্ছিল। ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের ইউক্রেনিয় ভাষাব্যবহারের বৈচিত্র্য থেকে ইউক্রেনিয় ভাষার একটি মান রূপ গড়ে তোলার কাজেও ইউক্রেনিয় ভাষাতাত্ত্বিকরা বেনজির উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। ভাষা অভিধান, লিপিবিন্যাস ও লিপিবিধির গুরুত্বপূর্ণ কাজ সার দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিদ্যায়তনিক পরিসর ছাপিয়ে সাধারণ মানুষেরও চর্চা ও আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ইউক্রেনের মুদ্রণশালা থেকে ইউক্রেনিয় ভাষা বিষয়ক ৫৯ টি বই ছাপা হয়েছিল, যেখানে তার আগের ১০০ বছরে মোট মাত্র ১১টা বই ছাপা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে 'সেন্ট্রাল রাদা' ইউক্রেনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেনিয় ভাষাকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করে।

১৯১৭ থেকে ১৯১৯-য়ের মধ্যে প্রকাশিত ভাষা বিষয়ক ৫৯টি বইয়ের মধ্যে তিনটে হল ইউক্রেনিয়-রুশ অভিধান ও পনেরটি হল রুশ-ইউক্রেনিয় অভিধান। ইউক্রেনিয়ার রুশভাষীদের মধ্যে এই অভিধানের খুব চাহিদা তৈরি হয়েছিল। তাঁরা যে এই ভাষা-পরিস্থিতি খুব উপভোগ করছিলেন, এমনটা নয়। আমারা আগেই দেখেছি যে রাশিয়া থেকে আসা ভূস্বামী, জমিমালিক, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ছাড়াও ইউক্রেনের শহরবাসী অভিজাতেরা বড় মাত্রায় রুশভাষী হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭ সালে কিয়েভ শহরের বাসিন্দাদের মাত্র ২০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজন ইউক্রেনিয় ভাষায় কথোপকথন চালাতে পারত। এছাড়া নতুন এক পরিবর্তনের হাত ধরেও ইউক্রেনে রুশভাষীর সংখ্যা বাড়ছিল। সেই পরিবর্তন হল শিল্পায়ন। রুশ অধিকৃত ইউক্রেনের পুবপ্রান্তে মাটির তলায় কয়লার বড় ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং কয়লাখনি চালু হয়েছিল জারের আমলের শেষদিকেই। তাকে ঘিরে ডনবাস অঞ্চলে খনি ও শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল। শিল্পপতিদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল রাশিয়ার (খুব অল্প কয়েকজন ছিলেন অন্য দেশ থেকে আসা, যাদের মধ্যে একজন হলেন ডোনেৎস্ক শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন হিউজেস, যিনি ওয়েলস থেকে এসেছিলেন)। কারখানা ও খনির ব্যবস্থাপক, পরিদর্শকরা প্রায় সবাই রুশ, শ্রমিকদের মধ্যেও বড় অংশ রুশ। কারখানার মধ্যে চালু ভাষা ছিল রুশ ভাষাই। কারখানা অঞ্চলেও রুশ ভাষা ও আদবকায়দা বহাল হয়েছিল। ইউক্রেনিয় শ্রমিকরা

নিজেদের ভাষা ও আদবকায়দা নিয়ে চলার চেষ্টা করলে মালিক-কর্তাব্যক্তিরা তো তার কোনও রেয়াত করেনি বটেই, রুশ শ্রমিকদের সঙ্গেও তাদের সংঘাত তৈরি হয়। এই সংঘাত কখনও কখনও তুঙ্গে উঠে রুশ ও ইউক্রেনিয় শ্রমিকদলের মধ্যে উন্মত্ত ছুরির লড়াই ও দাঙ্গার রূপ নিত।

এই রুশভাষীরা বাধ্য হয়ে ইউক্রনিয় ভাষা শেখা ও বলার চেষ্টা করলেও তা নিয়ে খুবই বিরক্ত ছিল। ইউক্রেনিয় জাতির পুনর্জাগরণও তাদের বেশিরভাগের কাছে ছিল বিদ্রূপের বিষয়। রুশ ভাষা ও জাতীয়তার আধিপত্যকেই তাঁরা সমীচীন মনে করতেন।

এছাড়া ইউক্রেনের শহরবাসীদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ইহুদি। গোটা ১৯ শতক জুড়ে পোল ও রুশ আধিপত্যাধীন ইউক্রেনে ইহুদিরা এসে বাস গড়েছিলেন। ১৯১৭ সাল নাগাদ প্রায় ২০ লাখ ইহুদির বাস ছিল রুশ অধিকৃত ইউক্রেনে। বড় শহরগুলোর বাসিন্দাদের ৩৩ শতাংশ এবং ছোট বা মাঝারি শহরগুলোর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ছিল ইহুদি। তারা ছিল ভাটিখানা, কাঠকল, তামাক কারখানা ও চিনিকলের মালিক, খুদে ব্যবসায়ী বা কারিগর। দৃঢ়-সংবদ্ধ ইহুদি বসতি গড়ে তুলে তাঁরা থাকতেন। ঈদ্দিস ভাষা ও রুশ ভাষাই ছিল তাঁদের ভাষা। এঁদের মধ্যেও ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার তেমন কোনও জায়গা করে নিতে পারেনি।

১০

অধরা স্বাধীনতা, বলশেভিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

১৯১৭-য় জারতন্ত্রের পতন হল। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভেঙে পড়ল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য। ইউক্রেনিয়দের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে রুশ-পোল-অস্ট্রিয় দখলদারি মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বশাসিত ইউক্রেন রাষ্ট্র গড়ে তোলা যাবে। একদিকে কৃষকদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামা ও অন্যদিকে 'সেন্ট্রাল রাদা'-র প্রতিষ্ঠা সেই আশাকে বাস্তবের মাটিতেও পত্তন করছিল। কিন্তু অচিরেই একের পর এক ধাক্কা সেই আশাকে গুঁড়িয়ে দিল।

পোল অধিকৃত ইউক্রেনকে মুক্ত করার জন্য ইউক্রেনিয় সেনার যুদ্ধ সফল হতে পারলনা। সংক্ষিপ্ত কিন্তু ধ্বংসাত্মক এক সামরিক সংঘাতে ১৫,০০০ ইউক্রেনিয় ও ১০,০০০ পোল প্রাণ হারাল। পোল হাবসবার্গ রাজতন্ত্র তার দখলকে আরও পাকাপোক্ত করল।

'সেন্ট্রাল রাদা'-র তরুণ ইউক্রেনিয় প্রতিনিধিরা ১৯১৮ সালে জার্মান-হাঙ্গেরি পক্ষের সাথে ব্রেস্ত-লিতভস্ক বোঝাপড়ায় অংশ নিয়ে ইউক্রেনিয় জাতীয় স্বশাসনের দাবি সজোরে হাজির করল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে পৃথক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিল, কিন্তু তারপরও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন যে জাতিরাষ্ট্রগুলো মাথা তুলল, তার মধ্যে ইউক্রেন স্থান পেলনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিজয়ী পক্ষের কূটনীতিকরা যখন ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে ইউরোপের নতুন মানচিত্র নির্ধারণ করতে বসলেন, তখন পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদির জন্ম-প্রত্যয়পত্র তৈরি হল, ইউক্রেনের কথা আলোচনাতেই উঠল না।

উপেক্ষা নয়, নবগঠিত 'সেন্ট্রাল রাদা'-র উপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর পথ নিয়েছিল রাশিয়ায় ক্ষমতাদখল করা বলশেভিকরা। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে 'সেন্ট্রাল রাদা' ইউক্রেনের স্বশাসন ঘোষণা করার পরের মাসেই বলশেভিকদের

লালফৌজ ইউক্রেন আক্রমণ করল। ইউক্রেনিয় 'সেন্ট্রাল রাদা'-র সমর্থনের ভিত্তি শহর, গঞ্জ ও সদরগুলোর উপর আক্রমণ হানল। আক্রমণ হানল জাপোরিজীয় অঞ্চলের কৃষকদের সমিতিগুলোর উপরও। ইউক্রেনিয় কৃষক ও 'সেন্ট্রাল রাদা'-র বুদ্ধিজীবীরা রাশিয়ার শ্রমিকদের গড়া বিপ্লবী সোভিয়েতের কাছ থেকে নিজেদের স্বশাসন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করেছিল, সোভিয়েত-বিরোধী জারতন্ত্রী শ্বেতফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একইসাথে লড়ার কথা ভেবেছিল। অথচ সোভিয়েত সরকারের দখল বলশেভিকরা নেওয়ার পরই সোভিয়েত লালফৌজ তাদের স্বশাসনের নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করতে হানা দিল।

বলশেভিকরা কেন এমন করল? বলশেভিকদের নেতা লেনিন তাত্ত্বিক ঘোষণায় জার পরবর্তী রাশিয়ায় সমস্ত জনজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এমনকি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকারও স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাহলে ইউক্রেনিয় স্বশাসনের জায়মান কাঠামোর উপর এমন আঘাত হানা কেন?

লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, পিয়াতাকভ, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও বুখারিনের মতো বলশেভিকদের প্রধান নেতারা রুশ শিক্ষা-সংস্কৃতির যে আবহে লালিতপালিত হয়েছিলেন আমরা দেখেছি যে সেখানে ইউক্রেনের নামটি অবধি স্বীকার না করে তাকে 'ছোট রাশিয়া' বলা হত, ইউক্রেনিয় ভাষাকে আলাদা ভাষার মর্যাদা না দিয়ে রুশ ভাষার একটা দুর্বল উপভাষা হিসেবে ধরা হত, ইউক্রেনিয়দের চাষা-ভুষো অসভ্য অশিক্ষিত মানুষ হিসেবে ধরা হত, এমনকি তার অতীত ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হত। এই রুশ জাতীয় আধিপত্যবাদী মনোভাব লালনপালনের আবহের মধ্যে দিয়ে এই নেতাদের বোধের মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছিল। এই অসচেতন বোধের গুরুত্ব অবশ্য তাঁরা খাটো করে দেখাতেন, কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে তাঁরা অসচেতন বোধ দ্বারা চালিত নন, তাঁরা সচেতন বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা চালিত। তাঁদের এই সচেতন বৈজ্ঞানিক মতবাদেও ইউক্রেনিয় কৃষকদের স্বশাসনের আকাঙ্খাকে স্থান দেওয়ার মতো পরিসর ছিল না।

যে নিবন্ধীকৃত 'মার্কসবাদী' মতবাদকে বলশেভিকরা তাদের 'বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির' মৌল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করত, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে মার্কসের একটি মন্তব্য। ১৮৫২ সালে লেখা 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' প্রবন্ধে মার্কস বলেছিলেন যে কৃষকরা কখনই

শ্রেণি হিসেবে সংহত হতে পারেনা, তাদের শ্রেণি সচেতনতা থাকে না। তিনি লিখেছিলেন:

> সুতরাং কোনও সংসদের মাধ্যমে বা কোনও সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে তারা নিজেদের নামে শ্রেণিস্বার্থ বলবৎ করতে অক্ষম। তারা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা, তাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দিতে হয়।

একে সর্বত্র সর্বদা সত্য বলে ধরে নেওয়া বলশেভিকদের নজরে তাই কৃষকরা স্বশাসন গড়ে তুলতে পারেনা, এমনকি স্বশাসনের আকাঙ্খাও নিজে থেকে ব্যক্ত করতে পারেনা। কৃষকদের স্বশাসনের আকাঙ্খা ব্যক্ত হলে বুঝতে হবে যে অন্য কোনও শ্রেণি তার হয়ে এই আকাঙ্খা সূত্রবদ্ধ করে হাজির করছে। তাই ইউক্রেনের ব্যাপক কৃষকদের স্বশাসন ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা আসলে কৃষকদের আকাঙ্খা নয়, কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হওয়া বুর্জোয়া শ্রেণির আকাঙ্খা। বলশেভিক নেতা লেনিন কৃষকদের বিপ্লবী ভূমিকার সম্ভাবনা, বিশেষ করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভূমিসংস্কারের জন্য কৃষকদের আকুতির বিপ্লবী সম্ভাবনার কথা স্বীকার করতেন। কিন্তু লেনিনের মতে, এই বিপ্লবী সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে হলে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে কৃষকদের সামিল করতে হবে। এর ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়ায় কৃষকদের 'বুর্জোয়া' বা 'ছোট-বুর্জোয়া' নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিকশ্রেণির 'অগ্রবাহিনী' কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অধীনে সামিল করা। সুতরাং এই মতবাদিক বিশ্লেষণ ইউক্রেনের জাতীয় পুনর্জাগরণ ও স্বশাসনের আন্দোলনকে একরঙাভাবে 'বুর্জোয়া, ছোট-বুর্জোয়া' আন্দোলন হিসেবে দেগে দিয়ে তা দমন করার মধ্য দিয়ে কৃষকদের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসার বিধানই নিদান করবে।

অবশ্য, কেবল কৃষকদের আত্মসক্রিয়তা বা স্বতক্রিয়া সম্বন্ধেই বলশেভিকরা সন্দিহান ছিল না, শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও খুব অন্যথা ঘটেনি। শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি শ্রমিকশ্রেণি নিজেই আনবে, একথা মার্কস বলেছিলেন। কিন্তু বলশেভিক মতবাদ-কাঠামোয় শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শ্রেণিসচেতনতা স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত হতে পারেনা, যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ-বঞ্চনার চাপে অধঃপতিত অস্তিত্বে বুর্জোয়া ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ-মতাদর্শের মধ্যে সে বাঁধা থাকে। তাই শ্রমিকশ্রেণির কাছে বিপ্লবী সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার বা নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হয় একটি 'আলোকিত অগ্রবাহিনী'-কে, যে আলোকিত অগ্রবাহিনীই হল কম্যুনিস্ট পার্টি। সুতরাং বলশেভিক ধারণামতে, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শ্রেণিসচেতনতা আপামর শ্রমিকশ্রেণি ধারণ করেনা, ধারণ

করে কম্যুনিস্ট পার্টি। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত স্বতক্রিয়া বিপ্লব ঘটাতে পারেনা, বিপ্লব ঘটাতে পারে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে শ্রমিকদের সুশৃঙ্খল ক্রিয়া। ১৯১৭-র অক্টোবরে পেত্রোগ্রাদে ক্ষমতাদখল করার পর অচিরেই লেনিন তত্ত্বায়ন করলেন যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শ্রেণিসচেতন শ্রমিকদের ভাণ্ডার খইয়ে দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণি সামগ্রিকভাবে তার শ্রেণিসচেতন অবস্থান হারিয়েছে, সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টিকেই এখন শ্রমিকশ্রেণির হয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করার ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হবে।

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখা বলশেভিকরা অন্যান্য পার্টিদের সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিল। নিরলস তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে অন্যান্য সমাজ-গণতন্ত্রী পার্টিদের অবস্থান বিপ্লব-বিরোধী বলে প্রমাণ করতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসব পার্টির কর্মী-সমর্থকদের উপর দমনপীড়ন চালিয়ে বিপ্লবের পথে 'বাধা সরানোর' কাজেও তারা ছিল নিরলস। সুতরাং বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের পর রাশিয়ায় এক ক্রম-কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাব্যবস্থার উদ্ভব হতে থাকে যেখানে বলশেভিক-পরিচালিত এক পার্টিকর্তা-সেনা-পুলিস-গুপ্তচর ব্যবস্থার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। বিপ্লবের শত্রুদের দমন করার নামে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর, অন্যান্য রাজনৈতিক মত ও সংগঠনের উপর অবদমন জারি হয়।

জার-শাসিত বিভিন্ন জনজাতির স্বশাসন ও স্বাধীনতার কাম্যতার বিষয়েও বলশেভিকরা নিঃসন্দেহ ছিলনা। লেনিন তাত্ত্বিকভাবে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেছিলেন, পৃথক হওয়ার অধিকারও স্বীকার করেছিলেন, জোর খাটিয়ে কাউকে একই রাষ্ট্রের মধ্যে ধরে রাখার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে বিপ্লোবোত্তর রাষ্ট্রে জোর খাটাতে হবেনা। বিভিন্ন জাতির শ্রমিকরা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই বিচ্ছিন্নতার আকাঙ্খাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেবে। এই প্রত্যাশা অনুযায়ী জাতীয় স্বশাসন, স্বাধীনতা ও পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্খা শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিঐক্যের পরিপন্থী। ব্যবহারিক চর্চায় ভাবনার এই দিকটিই জোর পেয়েছে। কেবল ইউক্রেন নয়, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, মধ্যএশিয় জনজাতিদের ক্ষেত্রে স্বশাসনের আকাঙ্খাকে শ্রেণিঐক্যের পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা হিসেবে দমনের বস্তু হিসেবে দেখার ঝোঁকই প্রবল হয়েছে।

তাই ফ্রুসেভস্কি ও তাঁর সঙ্গীদের প্রত্যাশা মতো বলশেভিকরা বিপ্লবী সাথী হিসেবে ইউক্রেনের স্বশাসন ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াল না। বরং ইউক্রেনিয়

জাতীয়তাবাদী ও কৃষকদের বিপথগামী আন্দোলনকে দমন করতে লালফৌজ পাঠাল। লালফৌজ বাহিনী ক্রমশ দক্ষিণমুখে তার দখলদারী অভিযান বিস্তৃত করতে লাগল। ১৯১৮-র ৯ই ফেব্রুয়ারি লালফৌজ কিয়েভ শহরের দখল নিল। কিয়েভের দখল নিয়ে লালফৌজের জেনেরাল মিখাইল মুরাভিয়েভ ঘোষণা করলেন যে তাঁরা 'দূর উত্তর থেকে রুশ শাসন' আবার ফিরিয়ে এনেছেন। ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী সন্দেহে গ্রেফতার যে কাউকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড দেওয়ার হুকুম দিলেন। লালফৌজের সেনারা কিয়েভের রাস্তায় ইউক্রেনিয় ভাষায় কাউকে কথা বলতে শুনলেই গুলি করে মারতে লাগল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে কিয়েভের রাস্তায় রাস্তায় রুশ ভাষায় লেখা রাস্তার নামফলকগুলোকে ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা নামফলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। লালফৌজের সেনারা আবার সেখানে রুশ ভাষায় লেখা নামফলক ফিরিয়ে আনল। কিয়েভের দখল নেওয়ার সময় লালফৌজ যে বোমাবর্ষণ চালিয়েছিল, সেখানে বেছে বেছে হ্রুসেভস্কির বাড়ি, পাঠাগার ও প্রাচীন নথির লেখ্যাগারের উপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালোনো হয়েছিল যাতে ইউক্রেনিয় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগৃহীত নথি ধ্বংস করা যায়।

কিয়েভের দখল নেওয়ার পরই লেনিন ইউক্রেনে খাদ্য-সংগ্রাহক বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। সের্গো ওর্দঝোনিকিদজে নামক বলশেভিক নেতাকে 'বিশেষ পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ' (extraordinary plenipotentiary commissar) হিসেবে ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর অধীনে সংগ্রহকারী দল পাঠালেন। সেই সংগ্রহকারী দলকে নির্দেশ দেওয়া হল ইউক্রেনের কৃষকদের ঘর থেকে ফসল বাজেয়াপ্ত করার। এই সময়ে ইউক্রেনিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বলশেভিকদের কাছে লেনিনের পাঠানো একটি তারবার্তা ছিল এইরকম:

> ভগবানের দোহাই, খাদ্যশস্য, খাদ্যশস্য এবং আরও খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সবরকম বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন কর!! নাহলে পেত্রোগ্রাদ অভুক্ত থেকে মরবে। বিশেষ ট্রেন এবং বিশেষ সংগ্রাহকদল ব্যবহার কর। সংগ্রহ কর, মজুদ কর। ট্রেনগুলোর সঙ্গে পাহারাদার পাঠাও। প্রতিদিন আমাদের জানাও কী হল। ভগবানের দোহাই!
>
> (সূত্র: রিচার্ড পাইপস সম্পাদিত, দি আননোউন লেনিন: ফ্রম দি সিক্রেট আর্কাইভ, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯।)

পেত্রোগ্রাদ শহরের অভুক্তদের বিক্ষোভ প্রশমন করার জন্য ইউক্রেনিয় গ্রামের কৃষকদের অভুক্ত রাখার পন্থা নেওয়া হল। কৃষকদের ঘরে যা শস্য পাওয়া গেল তাই বাজেয়াপ্ত করা হল।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ টিকেছিল ইউক্রেনের উপর বলশেভিকদের এই প্রথমদফার শাসন। বলশেভিক শাসন পুরোমাত্রায় জেঁকে বসার আগেই পরিস্থিতি আবার অন্যদিকে মোড় নিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। অগ্রসরমান জার্মান সেনার দখলে পেত্রোগ্রাদ-মস্কো চলে যাওয়ার আশঙ্কা বড় হয়ে উঠেছে। এই শঙ্কা কাটাতে লেনিনের প্রস্তাব মেনে বলশেভিকরা জার্মানদের সঙ্গে ব্রেস্ত-লিতভস্ক চুক্তি করল। তার মধ্য দিয়ে ইউক্রেন সহ জারসাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশকে জার্মানদের হাতে সঁপে দিয়ে অনাক্রমণ চুক্তি করা হল। সেই চুক্তি মোতাবেক ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে জার্মান সৈন্য ইউক্রেনে প্রবেশ করল। ২৯শে মার্চ 'সেন্ট্রাল রাদা'-কে বাতিল ঘোষণা করে তারা নিজেদের বশংবদ এক সরকার প্রতিষ্ঠা করল। ইউক্রেনিয় জাতীয় আকাঙ্খাকে তোষণের ভান করে এই সরকারের নাম কসাক-ঐতিহ্য থেকে তুলে আনা হল। সরকারের নাম দেওয়া হল হেটমানেট। রুশ জারতন্ত্রের গ্রাসে পুরোপুরি পতিত হওয়ার আগের শেষ হেটমানের এক বংশধর পাভলো স্কোরোপাদস্কি-কে খুঁজেপেতে সরকারের মাথায় বসানো হল। এই হেটমানেট তার অধীনে 'ভার্তা' নামে এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলল যা মূলত অস্ট্রিয়-জার্মান কর্তাদের নির্দেশেই চলত। ইউক্রেনিয়ার গ্রামাঞ্চলের ভূস্বামী ও জমিমালিকরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার সুযোগ নিতে এই সরকারের পাশে পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এসে দাঁড়াল। হ্রুসেভস্কি ও তাঁর সঙ্গীরা রাজনৈতিক নির্বাসন মেনে নিয়ে দেশান্তরী হলেন। ইউক্রেনের গোটা গ্রামাঞ্চল জুড়ে ভার্তা-র আক্রমণ জারি হল। লালফৌজের আক্রমণের পরেও যেখানে যেখানে কৃষকদের স্বশাসন সমিতিগুলো খাড়া ছিল, সেখানে হাজার হাজার কৃষকদের ধরে চাবুক মারা হল, কারাগারে বন্দি করা হল, ফাঁসি দেওয়া হল বা গুলি করে মারা হল। জমি আবার ভূস্বামী ও জমিমালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। সমস্ত খাদ্যশস্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কৃষকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে ভূস্বামী ও জমিমালিকদের মধ্যস্থতায় জার্মানিতে রফতানি করে দেওয়া হল।

এই তীক্ষ্ণ আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষক ও জাতীয়তাবাদীদের প্রতিরোধ আবার নতুন করে দানা বাঁধার চেষ্টা শুরু করল। কৃষকদের প্রতিরোধ সবচেয়ে সংগঠিত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল জাপোরিজীয় অঞ্চলের গুলয়াই-পোল্যি গ্রামকে

ঘিরে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা হিসেবে উঠে এলেন গুলয়াই-পোল্যি গ্রামের গরিব কৃষক ঘরে জন্ম নেওয়া এক তরুণ। তাঁর নাম নেস্তর মাখনো। জারতন্ত্রী প্রশাসন ও মালিক-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হানার জন্য জার আমলেই তিনি কারাবন্দি হন। কারাগারে নৈরাষ্ট্রবাদী (anarchist) ভাবনা, বিশেষ করে রুশ নৈরাষ্ট্রবাদী তাত্ত্বিক পিটার ক্রোপোটকিনের লেখা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নৈরাষ্ট্রবাদকেই তিনি সংগ্রামের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অভিঘাতে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং নৈরাষ্ট্রবাদী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। জার্মান সেনা ও হেটমানেট-য়ের ভার্তা-র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে তিনি মেহনতকারীদের মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে চালিত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের উত্থান-পতন সম্পর্কে নেস্তর মাখনো স্বয়ং একটা বিবরণ লিখেছিলেন 'দিয়েলো ক্রুদা' পত্রিকার 'জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮' সংখ্যায়:

> ...পুঁজি ও তার ভৃত্য রাষ্ট্রের কবল থেকে মুক্ত হয়ে শ্রমিকদের স্বাধীন অস্তিত্ব গড়ে তোলার আবশ্যকীয়তা নিয়ে মাখনো এবং গুলয়াই-পোল্যি মুক্তিকামী কম্যুনিস্ট (libertarian communist) কৃষকদলের অন্যান্য কর্মীদের কথা ব্যাপক কৃষক জনগণ গ্রহণ করেছিল। এই কথা গ্রহণ করার মানে যে অনিষ্টকর বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সমাজসংগঠনের জায়গায় মেহনতী মানুষদের মুক্ত সমাজসংগঠন গড়ে তোলা তাও উপলব্ধি করেছিল। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কৃষক জনগণ একটি শক্তিধর সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিল। গুলয়াই-পোল্যি মুক্তিকামী কম্যুনিস্ট কৃষকদলকে তারা এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল এবং এই বাহিনীর ভরনপোষণের দায়িত্ব স্থায়ীভাবে নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল।... এইভাবে গুলয়াই-পোল্যি দ্রুতই নতুন চেহারা নিয়েছিল, কৃষকদের স্ব-ব্যবস্থাপনা সংগঠিত হয়েছিল এবং এই নতুন ব্যবস্থা থেকে সবকরম রাষ্ট্রমুখী ঝোঁককে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়-জার্মান সেনার হিংস্র দঙ্গল, এতদিন যাদের স্বেচ্ছাচারিতার কোনও সীমা ছিলনা, তাদের চূর্ণ করা হয়েছিল এবং তাদের সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে কৃষকবাহিনীর অধিকারে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অস্ট্রিয়-জার্মান সেনারা এই এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। হেটমান স্কোরোপাদস্কির লোকজনদের কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, কাউকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।... এই বিদ্রোহী আন্দোলন আরো বড় ঢেউ তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। গুলয়াই-পোল্যি

গ্রামের চারধারে বেশ কিছু জেলা থেকে অস্ট্রিয়-জার্মান ও হেটমানের বাহিনীকে খেদিয়ে বের করে দেওয়ার পর এই আন্দোলন খেয়াল করল যে দেনিকিনবাদী প্রতিক্রিয়া ও ইউক্রেনিয় ডিরেক্টরি (যা পেটলিউরোভসচিনা নামে বেশি পরিচিত)-র সূত্রপাত হচ্ছে। এই দুইয়ের বিরুদ্ধে তারা দ্রুত তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল।... এই নতুন শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা বিস্তৃত ফ্রন্ট গড়ে তুলে মেহনতী মানুষদের নতুন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার স্বার্থে বীরত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান চালানো হল। এই প্রেক্ষাপটেই নৈরাষ্ট্রবাদী কৃষকরা গড়ে তুলেছিল ইউক্রেনের মেহনতী মানুষদের সেই বিদ্রোহী আন্দোলন যা ক্রমশ মাখনোভিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।... একটি মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষদের স্ব-নির্দেশনায় রাষ্ট্র ও তার সমর্থকদের কোনওরকম হস্তক্ষেপ নিষেধের নৈরাষ্ট্রবাদী নীতি নিয়ে চলা এই আন্দোলন কোনওভাবেই রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক পার্টিগুলোর কাছ থেকে কোনও সাহায্য আশা করতে পারেনা।... মাখনোভিস্ট আন্দোলন একটাই গুরুতর ভুল করেছিল, তা হল র‍্যাঙ্গেল-য়ের শ্বেতফৌজ ও ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই চালানোর জন্য বলশেভিকদের সঙ্গে জোট করা। বলশেভিকদের বিপ্লবিয়ানা সম্পর্কে ধারণা করতে মাখনোভিস্ট আন্দোলনের ভুল হয়েছিল এবং বলশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সময়মতো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। বিশ্বাসভঙ্গ করে বলশেবিকরা তাদের সমস্ত ফৌজি শক্তি দিয়ে মাখনোভিস্ট আন্দোলনকে সরাসরি আক্রমণ করেছিল, এবং কষ্টেসৃষ্টে হলেও, তখনকার মতো সেই আন্দোলনকে পরাজিত করেছিল।

এখানে মাখনো ইউক্রেনের কৃষকদের নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের বিবরণ দিতে গিয়ে তৎকালীন ইউক্রেনের বড় কয়েকটা উত্থানপতনকে ছুঁয়ে গেছেন। সেই উত্থানপতনগুলি হল: স্কোরোপাদস্কির হেটমানেট-য়ের পতন, পেটলিউরা-র ডিরেক্টরির উত্থান ও পতন এবং বলশেভিকদের পুনর্বার ইউক্রেন দখল।

অবশেষে ১৯১৮ সালের শেষভাগে দীর্ঘ প্রলম্বিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পতন হয়। পরাজিত অস্ট্রিয়-জার্মান পক্ষ ১৯১৮ সালের নভেম্বরে ইউক্রেন থেকে তার সেনা সরিয়ে নেয়। স্কোরোপাদস্কির হেটমানেট যে খুঁটির জোরে খাড়া ছিল, সেই খুঁটি সরে গেল। নড়বড়ে হয়ে পড়া হেটমানেটকে উপড়ে ফেলার সুযোগ নিতে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝিই সাইমন পেটলিউরার নেতৃত্বে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীরা পুনর্সংগঠিত হয়েছিল। পেটলিউরা ছিলেন সমাজ-গণতন্ত্রী

ঝোঁকসম্পন্ন সামরিক সংগঠনে পটু একজন। প্রাক্তন সেনা, কলোনেল, কসাক-প্রধানদের বংশধরদের নিয়ে মূলত গালিসিয়া অঞ্চলের কৃষকঘরের ছেলেদের নিয়ে পেটলিউরা এক বাহিনী প্রস্তুত করে তার নাম দিলেন 'ডিরেক্টরি'। ১৯১৮ সালের ১৮-ই ডিসেম্বর পেটলিউরার বাহিনী অতর্কিতে কিয়েভ, ওডেসা আর মিকোলায়েভ আক্রমণ করল। স্কোরোপাদস্কির হেটমানেট তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ডিরেক্টরি ক্ষমতা দখল করল। ডিরেক্টরির নেতারা কোনও সংসদ গড়ে তুললেন না। তার বদলে তারা কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী পেশার মানুষদের প্রতিনিধি নিয়ে একটা 'শ্রমিক কংগ্রেস'-য়ের আয়োজন করল। পূর্বতন 'সেন্ট্রাল রাদা'-র মতোই ডিরেক্টরিও কৃষক-মুখী ভূমি সংস্কার ও স্বশাসনের বিপ্লবী পদক্ষেপ ঘোষণা করল। কিন্তু ডিরেক্টরি কখনই ইউক্রেনের কোনও বড় অংশের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারেনি, ফলে তার ঘোষিত নীতি লাগু করার উপায়ও তৈরি করতে পারেনি। ডিরেক্টরির কাজ সীমাবদ্ধ থেকেছে তার কৃষকসেনার সামরিক কাজকর্মের মধ্যেই। এই সেনার বহু সদস্যই ছিল অভিযানপ্রিয়, জমকালো কসাক-পোষাক পরে তারা ঘুরে বেড়াত আর কাউকে দেখে ধনী বলে মনে হলেই পিস্তল বের করে তাকে লুট করতে উদ্যত হত। অচিরেই বিভিন্ন শক্তি ইউক্রেনের দখল নেওয়ার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করল। তাদের একদিকে ছিল জারতন্ত্রী শ্বেতফৌজ, সামাজিকভাবে যারা ভূস্বামী-মালিকদের আধিপত্য ও রুশ জাতীয়তাবাদের আধিপত্য আগের মতো ফিরিয়ে আনার পক্ষে ছিল। আর অন্যদিকে ছিল বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ। এই দুই বাহিনী ও মাখনোভিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ডিরেক্টরির কৃষকবাহিনীর সংঘাতের পাক আবর্তিত হতে থাকল।

মাখনোভিস্টরা জাতীয়তাবাদী ডিরেক্টরি ও জারতন্ত্রী শ্বেতফৌজ এই দুই শক্তিকেই মেহনতী মানুষের মুক্ত সমাজ গড়ার সমান পরিপন্থী চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এর জন্য তারা বলশেভিকদের লালফৌজের সঙ্গে জোট করে। মূলত মাখনোভিস্ট বাহিনীর শক্তিতে ডিরেক্টরি ও শ্বেতফৌজকে পর্যুদস্ত করার পর বলশেভিকরা কৌশল বদলে মাখনোভিস্টদের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হানে। বলশেভিকদের লালফৌজ ও মাখনোভিস্টদের কৃষ্ণফৌজ (নৈরাষ্ট্রবাদীদের পতাকার কালো রঙ থেকে এই নৈরাষ্ট্রবাদী কৃষকবাহিনী কৃষ্ণফৌজ নামে পরিচিত ছিল)-য়ের মধ্যে সংঘাতে বলশেভিকরা নয়া রুশরাষ্ট্রের সমস্ত সমরশক্তি কেন্দ্রীভূত করে মাখনোভিস্টদের পরাজিত করে।

১৯২০ সালে লালফৌজ ইউক্রেনের দখল নেয়। ১৯২০-র ডিসেম্বরে ইউক্রেনে বলশেভিক নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউক্রেন সরকার গঠিত হয় এবং তারা রুশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী ঘোষণা করে। তারপর ১৯২২ সালে ইউক্রেনকে সরাসরি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জোটের অংশ চারটি প্রজাতন্ত্রের একটি বলে ঘোষণা করা হয়। ইউক্রেনের উপর বলশেভিক শাসন স্থায়ীভাবে গেঁড়ে বসে।

আর এগোনোর আগে একটা বিষয় খেয়াল করা যেতে পারে। 'সেন্ট্রাল রাদা'-র মসয়ে কৃষক-মেহনতীদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় স্বশাসনের মধ্যে যে নৈকট্য গড়ে উঠেছিল, এই পর্যায়ে তা নষ্ট হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই পক্ষ তৈরি হয়ে গেল। একদিকে কৃষক-মেহনতীদের স্বশাসনে মূল জোর দেওয়া মাখনোভিস্ট আর অন্যদিকে জাতীয় স্বশাসনে জোর দেওয়া পেটলিউরার ডিরেক্টরি। ফলে দুই পক্ষই ক্রমশ দুর্বল হল। জাতীয় স্বশাসনের আকাঙ্খাকে অবহেলা করা যে তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল, তার স্বীকৃতি মাখনো দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে 'দিয়েলো ক্রদা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন:

> সবকিছুর পরেও জাতীয়তার প্রশ্ন বিচার করার সময় ইউক্রেনের সাম্প্রতিক বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা উচিত নয়। ইউক্রেনিয় ভাষায় এখন মানুষ কথা বলছে। নতুন জাতীয়তাবাদী ঝোঁকের গুণে বহিরাগত কেউ আঞ্চলিক ভাষায় কথা না বললে তার কথায় কেউ কানই দিচ্ছে না। এ হল নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের বিষয় এবং আমাদের তা গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখা উচিত। আমরা, নৈরাষ্ট্রবাদীরা তা এখনও অবধি করিনি। ইউক্রেনিয় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কথা খুব দুর্বলভাবে পৌঁচেছে কারণ নৈরাষ্ট্রবাদীরা মূলত ছোট শহরগুলোয় কেন্দ্রীভূত ছিল, এবং তার চেয়েও বড় কথা, নৈরাষ্ট্রবাদীরা ইউক্রেনিয় গ্রামাঞ্চলের জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেনি।

১১

দমন ও দুর্ভিক্ষ

১৯২০-র শেষভাগে বলশেভিকরা যখন ইউক্রেনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল, তখন রাশিয়ায় তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার ইতিমধ্যেই একটি দমনকারী পুলিশ-রাষ্ট্রের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। ১৯২১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত মেনশেভিক পার্টির পেত্রোগ্রাড কমিটির লিফলেটে লেখা হয়েছিল :

> বলির পাঁঠা খুঁজতে নেমে বলশেভিকরা আমাদের পার্টি (মেনশেভিক পার্টি)-কে তাদের মিথ্যা কুৎসামূলক প্রচারের সাধারণ লক্ষ্যমুখ করে তুলেছে। মেনশেভিকরা বহিঃ-হস্তক্ষেপ সমর্থন করে, মেনশেভিকরা কৃষকদের বিদ্রোহ করতে উসকানি দিচ্ছে, পেত্রোগ্রাদ-এর শ্রমিক-ধর্মঘট ও ক্রনস্টাড-এর বিদ্রোহের পিছনে আছে মেনশেভিকদের উসকানি...ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কতকী! এমনভাবেই দিনের পর দিন, দিনের পর দিন লিখে চলেছে বলশেভিক আমলাতন্ত্রের লেখকবাহিনী যাতে তাদের উপরের প্রভুদের সন্তুষ্ট করা যায় ও 'সম্মানজনকভাবে' নিজেদের উপায়-উপার্জন বজায় থাকে।
>
> আর এই লেখকবাহিনীর নির্দেশিত পথ শুঁকে শুঁকেই আসছে চেকা (Tcheka, গোয়েন্দা পুলিশ)-র আসল ডাকাত-দল। রাতে তারা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ছে আমাদের পার্টির কর্মীদের ঘরে, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল শ্রমিকদের ঘরে, ঘরের সবকিছু তছনছ করে ওলটপালট করে দিচ্ছ আর যাকে পায় তাকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। গণ্ডায় গণ্ডায় আমাদের কমরেডদের গ্রেফতার করা হয়েছে সাম্প্রতিক দিনগুলোয়, যাদের মধ্যে আছে ড্যান, রোঝকভ, কামেনস্কি, নাজারেভ, চের্তকভ ও অন্যান্যরা।
>
> আর এই সবই করা হচ্ছে পেত্রোগ্রাদ প্রোলেতারিয়েত-দের নাম করে।
>
> আমরা জানি যে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের এতে কোনও ভূমিকাই নেই। আমরা জানি যে গোটা এক সারি কল-কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে গ্রেফতার হওয়া শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে।

পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদের সরকারি নীতি বদলের দাবিতে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় সরকার শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করছে, আর ক্রনস্টাড-এর নাবিক ও সেনাদের মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সোভিয়েত গঠনের প্রস্তাবের জবাব দিচ্ছে ভারি কামানের গোলাবর্ষণ দিয়ে।

... এখন সকলে, এমনকি সবচেয়ে অনভিজ্ঞ শ্রমিকটিও বুঝতে পারছে যে বলশেভিক ক্ষমতার ভিত্তি শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েত নয়, বলশেভিক ক্ষমতার ভিত্তি নগ্ন গা-জোয়ারি। ...

(রোনাল্ড কোওয়ালস্কি, দি রাশিয়ান রিভলুশন, ১৯১৭-১৯২১; পৃষ্ঠা: ২২৬-২৭।)

কেবল বিরোধী রাজনৈতিক পার্টির লিফলেটে নয়, বলশেভিকদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ জ্ঞাপনেও এর ছবি পাওয়া যায়। তেমন একটা উদাহরণ দেখা যাক। পেত্রোগ্রাদের জন্য খাদ্যশস্য জোগাড় করার জন্য সরাসরি লেনিনের নির্দেশে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত সংগ্রাহক পল্টন পাঠানো হয়েছিল, কোনও গ্রামের কৃষকরা তাদের প্রতিরোধ করলে সেই গ্রামের কৃষকদের 'দুষ্কৃতি' বলে চিহ্নিত করা হত। সংগ্রাহক বাহিনীর জোর খাটিয়ে কৃষকদের ঘর থেকে সব খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে কৃষকরা পাল্টা জোর খাটালে তাদের 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে দমন করার দন্য বিশেষ বাহিনী পাঠানো হত। এই বাহিনীর নেতৃত্বে থাকত বলশেভিক পার্টিসদস্যদের নিয়ে গঠিত 'পলিটিকাল কমিশন'। ইউক্রেনের খারকিভ-য়ের আরও কিছুটা পুবে রুশ তামবোভ অঞ্চলের গ্রামে এমন কৃষক 'দুষ্কৃতি' ও 'প্রতিবিপ্লবীদের' দমন করার জন্য 'চতুর্থ সামরিক সেকশন'-কে পাঠানো হয় ১৯২১ সালে। লেনিনের নির্দেশ ছিল: 'নিঃসংকোচে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতের কৃষকরা আর এমন সাহস না পায়'। অভিযানের অগ্রগতি বিষয়ে চতুর্থ সামরিক সেকশনের 'পলিটিকাল কমিশন' -এর চেয়ারম্যানের বলশেভিক সদর দপ্তরে পাঠানো রিপোর্ট ছিল এইরকম:

... কৃষকজনতা দুষ্কৃতিদের ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করলে... জামিনস্বরূপ তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়... ভাবার জন্য তাদের তিরিশ মিনিট সময় দেওয়া হয়, তরপরও তারা সমর্পণ না করলে গ্রেফতার করা জনেদের গুলি করে মারা হয়, এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হয় যতক্ষণ কৃষকজনতা আত্মসমর্পণ না করে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও জামিনস্বরূপ গ্রেফতার করা হয় এবং তাদেরও গুলি করে মারা হয়... পাঁচ দিন ধরে চারটি গ্রামে চালানো অভিযানের ফল হয়েছে

এইরকম: ১৫৪ জন দুষ্কৃতি ও জামিনস্বরূপ বন্দিদের গুলি করে মারা হয়েছে, প্রায় ২২৭ জন দুষ্কৃতির পরিবার থেকে ১০০০ জনকে জামিনস্বরূপ বন্দি করে রাখা হয়েছে, ১৭টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সব সম্পত্তি সমেত ২৪টি বাড়ি দখল করে নিয়ে সহায়তাকারী গরিবদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

(রোনাল্ড কোওয়ালস্কি, দি রাশিয়ান রিভলুশন, ১৯১৭-১৯২১; পৃষ্ঠা: ২২৮-২৯।)

শ্রমিক-কৃষক-মেহনতীদের উপর 'বিপ্লবী' সন্ত্রাস লাগু করে, মেনশেভিক-অ্যানার্কিস্ট-সোশাল রিভলুশনারি সমস্ত অপরাপর রাজনৈতিক কর্মীদের উপর চূড়ান্ত দমন জারি করে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করা এই বলশেভিক একনায়কত্ব ১৯২১ সালে ইউক্রেন শাসনের দায়িত্ব হাতে নিল। পেটলিউরা প্রাণ বাঁচাতে ইউক্রেন থেকে তখন পালিয়েছেন। মাখনো-ও দেশান্তরী হতে বাধ্য হলেন। বছরখানেক আগে সাম্যবাদী বিপ্লবী হিসেবে বলশেভিকদের উপর ভরসা রেখে জোট বেঁধে মোহভঙ্গ হওয়া মাখনো দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে মাখনোভিস্ট আন্দোলনে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বিদায়গ্রহণ সভায় বলেছিলেন:

অন্য সমস্ত পার্টি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকাশ করে বলশেভিকরা যে সমাজের ভিত্তি গড়ে তুলছে, তার সঙ্গে সাম্যবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা অন্ধভাবে শৃঙ্খলাপরায়ন, সর্বদা তারাই সঠিক এই অহমিকায় তারা উদ্ধত, তারা নিজেদের 'মার্কসের সেনা ' নামে আধা-সামরিক ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। কোনও রকম প্রশ্ন বা বিরোধকে তারা সহ্য করতে পারেনা। তারা তীব্রগতিতে ধেয়ে চলেছে এমন এক সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে, যে রাষ্ট্র নাগরিকের কোনও অধিকার বা স্বাধীনতা স্বীকার করেনা এবং মতবাদিক গোষ্ঠীবিদ্বেষের এক অভিনব ধাঁচা ফেরি করে। 'তাদের নিজেদের' এবং 'অপরাপর'– এমন দুই ভাগে তারা জনগণকে ভাগ করে। নানা দিক থেকেই এ এক চূড়ান্ত অসংগতি। মেহনতী মানুষদের আরো ভালো জীবনের স্বপ্নকে ধ্বংস করে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে অসুন্দর এমন এক পুলিশ-সমাজ গড়ে তুলছে যেখান থেকে শ্রম ও সৃজনশীলতার সমস্ত আনন্দ, সক্রিয়তার সমস্ত উদ্যোগ নির্বাসিত হবে।... সমস্তকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে তারা ধ্বংস করবে যা কিছু পার্টির অপছন্দ, যা কিছু তাদের মতবাদের বাঁধা গতের মধ্যে পড়েনা।... এমন ভয়ঙ্কর দমনমূলক শাসনে সবকিছু ভুলে কোনওমতে টিকে থাকাই মানুষের মাথাব্যথা হয়ে উঠবে।... বলশেভিকদের কখনও বিশ্বাস কোর না !

(আলেকজাঁদ্রে স্কিরদা, নেস্তর মাখনো: অ্যানার্কিজ কসাক; পৃষ্ঠা: ix।)

নেস্তর মাখনো ইউক্রেন থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন। ইউক্রেনের আপামর মানুষ পরে রইল তাঁর ভবিষ্যদবাণী কতটা মেলে দেখার জন্য।

১৯২১ সালের প্রথম অর্ধ জুড়ে বলশেভিক গুপ্তপুলিশ চেকা ইউক্রেনে ৪৪৪ জন 'বলশেভিক-বিরোধী বিদ্রোহের নেতা'-দের খুন করেছিল। তারপরও তাদের হিসেবে ছিল যে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে এখনও কয়েক হাজার 'দুষ্কৃতিদের পাণ্ডা' ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য চেকা-র প্রতিষ্ঠাতা ফেলিক্স জেরঝিনস্কি স্বয়ং তাঁর বিশ্বস্ত ১,৪০০ জন 'চেকিস্ট'-কে নিয়ে ১৯২১ সালের মাঝামাঝি ইউক্রেনেএলেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলকে বশ করার কাজে দ্রুতি এল।

কিন্তু অবিশ্বস্ত ইউক্রেনিয় গ্রামাঞ্চলে ঘেরা কিয়েভ শহরকে বলশেভিকরা রাজধানী হিসেবে নিরাপদ মনে করছিল না। তাই রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল রাশিয়া-সীমান্ত ঘেঁষা খারকিভ শহরে, যাকে ঘিরে থাকা ডনবাস, ডোনেৎস্ক ও ক্রিয়েভি-রিহ শিল্পাঞ্চলে রুশভাষী শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি। খারকিভ শহরে রাশিয়ার বিভিন্ন দূরবর্তী জেলা থেকে রুশ সৈন্য সমবেত করে লালফৌজের বিভিন্ন ডিভিশন গড়ে তোলা হল। ১৯২১ সালের এক ভাষণে লালফৌজের ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া শাখার তদানীন্তন প্রধান মিখাইল ফ্রুনজ বলেছিলেন যে ইউক্রেনে সমাবেশিত লালফৌজের ৮৫ শতাংশই রুশ, মাত্র ৯ শতাংশ ইউক্রেনিয় (বাকি ৬ শতাংশ পোল বা বেলারুশের মতো অন্য জাতির)। ইউক্রেনিয়ার বলশেভিকদের (তাদের মধ্যেও সিংহভাগ, এবং নেতারা তো বটেই, অ-ইউক্রেনিয়) নিয়ে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির থেকে পৃথকভাবে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করে সেই পার্টির হাতে রাষ্ট্রভার সঁপে দেওয়া হল। সেই ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির আলাদা পলিটব্যুরো ও সেন্ট্রাল কমিটি থাকলেও, স্বাধীন নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা ছিলনা, মস্কোর পার্টি-নেতৃত্বের নির্দেশ বা উপদেশ অনুযায়ী তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন।

সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত হল যে কৃষকরা তাদের ফসল রাষ্ট্রের কাছে ছাড়া আর কোথাও কেনাবেচা করতে পারবেনা, সমস্ত বিনিময়-ব্যবসা নিষিদ্ধ হল, শিল্পকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হল, কৃষিজমিও রাষ্ট্রীয় সমবায়ের অধীনে আনার লক্ষ্য ঘোষিত হল। ফল হল মারাত্মক। সমসাময়িক এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী:

উৎপাদনশিল্প মৃত। সোভিয়েত আইনকে যতটুকু অমান্য করা সম্ভব ততটুকুই বিনিময়-ব্যবসার অস্তিত্ব। রাষ্ট্রীয় সমবায়করণের প্রক্রিয়ায় আটক কৃষিক্ষেত্র এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁচেছে যেখানে যা উৎপাদন হচ্ছে তা যদি সমানভাবেও বন্টন করা হয়, দেশের সব মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে না। প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং রেল ও নদী পরিবহন ব্যবস্থার অবনতি এমন জায়গায় পৌঁচেছে যে কোনও বন্টনই সম্ভবপর নয়। অনাহার, ক্ষুধা ও রোগব্যাধির প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে।
(এইচ এইচ ফিসার, দি ফেমিন ইন সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯১৯-১৯২৩, পৃষ্ঠা-৪৯৭।)

সমাজ-অর্থনীতির এই ভেঙে-পড়া দুরবস্থা ছিল রাশিয়া জুড়েই। পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর মতো রাশিয়ার মূল ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোয় খাদ্যযোগান যথাসম্ভব বাড়ানোর জন্য ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক খাদ্য-সংগ্রাহক বাহিনীদের দাপট আরও মরীয়া হয়ে উঠল। শ্বেত, লাল, কৃষ্ণ ও ডিরেক্টরেট বাহিনীর সদ্যপ্রশমিত হানাহানির ঘা তখনও গোটা গ্রামসমাজে দগদগে, ভূলুন্ঠিত আশা আর দগ্ধ স্বপ্নের বিবর্ণ প্রান্তরে বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে কিছু মেহনতী মানুষ নয়া শাসকদের দলে ভিড়ে সুবিধা ও নিরাপত্তা পেতে চাইল। বলশেভিকরা এদের নিয়ে গড়ে তুলল 'কোমেনজামি'। রুশ শব্দ 'কোমেনজামি'-র মানে 'গরিব কৃষকদের কমিটি'। গ্রামে গ্রামে অভিজ্ঞ ও বয়স্ক কৃষকদের নিয়ে চালু কৃষক সমিতিগুলো, যাদের অনেকেই মেহনতী মানুষদের স্বব্যবস্থাপনা সংগঠিত করার নীতি নিয়ে চলছিল, তাদের দিন শেষ হল। হয় বলশেভিকরা তাদের কোমেনজামির লোকেদের দিয়ে তা দখল করল, নয়তো তাদের পুরানো সদস্যদের খুন করে বা গ্রেফতার করে গ্রামের কৃষকদের সমিতিকে কোমেনজামি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করল। চেকা ও লালফৌজ এখানে মূল ভূমিকা নিল।

কোমেনজামিতে যোগ দেওয়া কৃষকদের 'গরিব কৃষক' ও 'বিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে বাকি সমস্ত কৃষকদের 'কুলাক' বলে দেগে দেওয়া হল। রুশ শব্দ 'কুলাক'-য়ের মানে 'ধনী কৃষক', বলশেভিক মতবাদিক নির্ণয় অনুযায়ী যারা বুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্র-সম্পন্ন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী, তাই দমনযোগ্য। এখানে খেয়াল করা যেতে পারে যে বলশেভিক মতবাদিক কাঠামোয় কৃষকদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: কুলাক অর্থাৎ ধনী কৃষক, সেরেদনিয়াক অর্থাৎ মধ্য কৃষক, বেদনিয়াক অর্থাৎ গরিব কৃষক এবং বাতরাকি অর্থাৎ খামার-মজদুর। খামার-মজদুরের নিয়োগকর্তা হিসেবে কুলাকদের ঝোঁক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পত্তনের দিকে আর বাকিরা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠনের শরিক হতে

পারে বলে নির্ধারণ ছিল। কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মেরুকরণের ফলে একটা ছোট অংশ কুলাক ও বাকি বড় অংশ বাতরাকি-বেদনিয়াক, এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যাবে বলে পূর্বনির্ধারণও ছিল। কিন্তু ইউক্রেনে এই মতবাদিক কাঠামোকে অনুসরণ করার চেয়ে ইউক্রেনিয় কৃষকদের বশ না মানা বিদ্রোহী মনোভাব যে বলশেভিকদের আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল এবং সেই আতঙ্কই তাদের চালনা করেছিল তা বোঝা যায় যেভাবে তারা তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া মুষ্টিমেয় কৃষককে বেদনিয়াক আখ্যা দিয়ে বাকি সবাইকে একলপ্তে কুলাক দেগে দিল তার মধ্য দিয়ে। কোমেনজামির সঙ্গে চেকা ও লালফৌজকে যুক্ত করে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেড়ে নেওয়ার 'সংগ্রহ-কর্মসূচী' বল্গাহীন হয়ে উঠল। তার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভও ফুলেফেঁপে উঠল। ১৯২০-১৯২১ সালে কোমেনজামির খাদ্যশস্য সংগ্রহ বাহিনীতে কাজ করেছিলেন মাতভি হাভরিলিউক। রুশ সরকারী নথির লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তাঁর জবানবন্দি থেকে সেই পরিস্থিতির ধারণা পাওয়া যায়:

> ... রাষ্ট্রের যখন খাদ্য প্রয়োজন ছিল, আমি খাদ্য সংগ্রহ বাহিনীতে কাজ করেছিলাম। আমাদের গ্রামের কুলাকদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তারপর রুঝিন জেলার পাঁচটি গ্রাম থেকে করেছিলাম। আমাদের গ্রামের বাইরে মোতায়েন ছিল সেনাদল। গ্রামে কুলাক বিক্ষোভ ছড়াতে পারে যারা, তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে আমি সেনাকে সাহায্য করেছিলাম। তখন ছিল খুব কঠিন সময়। কুলাকরা যখন কোনও খাদ্যশস্য জমা দিতে চাইত না এবং আমাকে পরিবারসহ খুন করার হুমকি দিয়েছিল, তখনও আমি বিচলিত হইনি এবং সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষ থেকে নজরদারিতে অটল থেকেছি। বিশেষ সর্বক্ষমতাপ্রদত্ত চেকা-আধিকারিক ব্রেদখিন-য়ের তত্ত্বাবধানে আমি খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজ করেছিলাম এবং তিনি আমার কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই আমি শিখেছিলাম কীভাবে গ্রামে কাজ করতে হয়, গরিব কৃষকদের সংগঠিত করতে হয়, খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে ও কুলাক বিরোধী অভিযানে তাদের সামিল করতে হয়। শুরু থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষ নেওয়া আমাকে গ্রামের কুলাকদের শত্রু করে তুলেছিল। সবসময়েই আমি কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছি... কুলাকরা কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবে, রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা ভাবেনা।
>
> (অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০-য়ে উদ্ধৃত।)

হাভরিলিউক-য়ের মতো কোমেনজামি-কর্মী, চেকা ও লালফৌজের এহেন তৎপরতা ১৯২০ সালে ইউক্রেনের কৃষকদের কাউকে ছাড় দেয়নি। লেনিনের নির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল যে পরিবারের আশু খোরাকি বা পরের বছরের ফসল বোনার বীজ হিসেবেও যদি কোনও কৃষক পরিবার কিছু খাদ্যশস্য নিজেদের কাছে রাখতে চায়, সেই অব্যাহতিও দেওয়া হবে না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে সংগ্রহবাহিনী সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছিল।

'রাষ্ট্রের স্বার্থে' এভাবে নিষ্পেষিত ইউক্রেনিয় কৃষকরা আগে আর কখনও হয়নি। একের পর এক দুর্যোগ যেন জীবনটাকেই উপড়ে ফেলতে চাইছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর ২৩ লাখ সেনা মারা গিয়েছিল, যার সব থেকে বড় অংশটাই হল ইউক্রেনিয় কৃষক। আহত ও পঙ্গু হয়ে ঘরে ফিরেছিল আরও বহু। কৃষক পরিবারগুলোর সোমত্ত যুবকগুলো হারিয়ে যাওয়ার এই অভিশাপের মধ্যেই পাক খেয়ে উঠেছিল আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘূর্ণাবর্ত হালকা হতেই বিজয়ী লালফৌজ ও চেকা-র ক্ষমতাধারীরা এসে চেপে বসল। পরিশ্রম করে মাঠে ফসল ফলিয়েও এখন ঘরে তোলা যাবেনা, রাষ্ট্রের অস্ত্রধারী আদায়কারীদের হাতে সব তুলে দিতে হবে। তাহলে আর মাঠে গিয়ে ফসল ফলানোই বা কেন ?

১৯২০-র বসন্তে ফসল বোনার সময় ইউক্রেনের কৃষকরা অনেক কম জমিতে ফসল বুনল। নানা কারণ এর পিছনে। যুদ্ধে-গৃহযুদ্ধে ঘরের ছেলে হারিয়ে মাঠে কাজ করার লোক কমে যাওয়া, বলশেভিকদের ফসল সংগ্রহে ফসলের বীজও খোওয়া যাওয়া এবং নিজের ফলানো ফসলের উপর নিজের অধিকার খোওয়া যাওয়ার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের পরোক্ষ প্রতিরোধ।

প্রকৃতিও যেন বিমর্ষ ও রুষ্ট। বৃষ্টি হল অনেক কম, তাপ হল মাত্রাছাড়া। ফসল বোনার সময় এসে গেলেও মাটিতে কোনও রস নেই, শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে আছে। ফলে ১৯২১-য়ের গ্রীষ্মে ফসল কাটার সময়ে দেখা গেল যা ফসল বোনা হয়েছিল তারও ২০ থেকে ২৫ শতাংশ মাঠেই শুকিয়ে মরেছে।

'ইউরোপের শস্যভাণ্ডার' নামে খ্যাত দক্ষিণ ইউক্রেন শস্যহারা। ওডেসা জেলায় ফসল ফলেছে আগের বছরের মাত্র ১২.৯ শতাংশ, কাতেরিনোস্লাভ, জাপোরোজীয়া এবং মিকোলাইভ জেলায় ৩.৭ শতাংশ থেকে ৫.১ শতাংশের মধ্যে। সাধারণভাবে, স্বাভাবিক ফলনের প্রায় ৯৫ শতাংশই এবার ফলেনি।

আর কেবল ইউক্রেনে নয়, রাশিয়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা। রুশ সাম্রাজ্যের কুড়িটি সবচেয়ে উৎপাদনশীল কৃষি এলাকা ১৯১৭-র আগে গড়ে

বাৎসরিক ২০০ লাখ টন খাদ্যশস্য ফলাত, ১৯২০ সালে ফলিয়েছিল ৮৪.৫ লাখ টন, আর ১৯২১ সালে তা আরও কমে দাঁড়িয়েছিল ২৯ লাখ টন।

কোমেনজামি, চেকা ও লালফৌজের যৌথ ফসল-সংগ্রহ বাহিনী দুর্ভিক্ষ-অনাহারের গন্ধ শুঁকে পাগলা কুকুরের মতো মরীয়া হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের উপর, যতটুকু ফসল ফলেছে তা চেঁছেপুঁছে কেড়ে নিতে।

খাদ্যশস্যহীন কৃষকদের ঘরে অনাহার ও ক্ষুধা সর্বাত্মক হয়ে উঠল। এমন নয় যে ইউক্রেনের কৃষকরা এর আগে কখনও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় কম ফলন, ফসলের মড়ক দেখেনি। কিন্তু তখন তা পার করার জন্য কৃষকদের নিজস্ব সুরক্ষাব্যবস্থা ছিল। কৃষকদের ঘরে আলাদাভাবে মজুত করে রাখা হত দুর্দিনের পারানি হিসেবে কিছু খাদ্যশস্য। কোনওবছর চাষে বিপর্যয় হলে তাই-ই পরের বছর ফসল ওঠা অবধি কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখত। কিন্তু এ বছর তা নেই। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে অস্ত্রধারী ফসল-সংগ্রাহকরা চেঁছেপুঁছে সব নিয়ে গেছে।

কৃষকদের অনাহারের প্রহর দীর্ঘ হতে থাকে। অবসাদ নামে দেহে। তারপর খিদের আগুন পেটের গহ্বরটাকে পোড়াতে থাকে। কৃষকরা রাস্তার কুকুর মেরে খেতে শুরু করে। ইঁদুর মেরে, পোকামাকড় ধরে খায়। ঘাস বা পাতা জলে ফুটিয়ে মণ্ড করে খায়। দেহ মানে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে কেউ। স্বাভাবিক সংস্কার, ন্যায়বোধ যেন জীর্ণ পোষাকের মতো ঝরে পড়ে। মৃত এক মানুষের দেহ থেকে মাংস কেটে খেতে বসে বাঁচতে মরীয়া কিছু মানুষ।

ইউক্রেনে ৭৫ লাখ মানুষ এই দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। মরেছিল কজন ? তখন কি কেউ গুনেছিল ? কেউ গোনেনি। পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দাজ থেকে জানা যায় যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ইউক্রেনেই আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এমন দুর্ভিক্ষের অভিশাপ জেঁকে বসেছিল গোটা রাশিয়া জুড়েই। বলশেভিক শাসকদের নিজেদের পত্রিকা প্রাভদা ১৯২১ সালের ২১ শে জুন সরকারিভাবে স্বীকার করে নিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আড়াই কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। শাসকরা বুঝি বুঝতে পারল যে অস্ত্র হাতে কৃষকদের ঘর লুট করে অবস্থার সামাল দেওয়া যাবেনা। তাই সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে 'সর্ব-রুশ দুর্ভিক্ষ কমিটি' গঠন করা হল, বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করার জন্য সমিতি গড়ে তোলা হল। বিখ্যাত লেখক

ম্যাক্সিম গোর্কিকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন করা হল। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মার্কিন রিলিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এ আর এ), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস, ইহুদি জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কমিটি ও আরও কেউ কেউ খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এল। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত ভোলগা উপত্যকায় তারা খাদ্য ও ওষুধ বিলি করতে শুরু করল।

ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি রুশ পার্টিকে অনুসরণ করে দুর্ভিক্ষ কমিটি গড়ে তুললেও ইউক্রেনের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো তার লক্ষ্য ছিলনা। ১৯২১ সালে সেপ্টেম্বরে গৃহীত সিদ্ধান্তে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে উত্তর ইউক্রেনিয়ার যে সব গ্রামে তুলনায় বেশি ফলন হয়েছে, সেখান থেকে 'অতিরিক্ত শস্য' অধিগ্রহণ করে রাশিয়ার জারিতসিন, উরালস্ক, সারাতভ এবং সিমবিরস্ক জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হবে। একই সময়ে ইউক্রেনিয় পার্টির নেতা রাকোভস্কিকে লেখা চিঠিতে লেনিন বলেছিলেন যে কিয়েভ ও খারকিভ থেকে খাদ্য ও গরু দ্রুত রাশিয়ায় পাঠানো হবে বলে তিনি আশা করছেন। অর্থাৎ, দক্ষিণ ইউক্রেনের ভয়াবহ দুর্ভক্ষ ও মন্বন্তরে যত লোক মরে মরুক, তা নিয়ে তাঁদের কোনও চিন্তা নেই, তখনও তাঁরা ইউক্রেনকে দোহন করে রাশিয়ায় কী পাঠানো যায় তার হিসাব কষছেন।

আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে আসা দলগুলোর কাছ থেকেও দক্ষিণ ইউক্রেনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা আড়াল করে রাখা হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সময় ইহুদি-বিদ্বেষী গণনিধনের শিকার হওয়া ইউক্রেনের ইহুদিদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে গিয়ে ইহুদি জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কমিটি ১৯২১ সালের মাঝামাঝি প্রথম এর আঁচ পায় এবং মার্কিন রিলিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এ আর এ)-কে তারাই জানায়। এ আর এ সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে দক্ষিণ ইউক্রেনে যাওয়ার অনুমতি চাইলে লেনিন প্রথমে তা নাকচ করে দেন এই যুক্তিতে যে উত্তর-পশ্চিম ইউক্রেনে যথেষ্ট ফলন হয়েছে। ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে ১৯২১-য়ের নভেম্বরে খারকিভে গিয়ে দক্ষিণ ইউক্রেনে যাওয়ার অনুমতি চায় এ আর এ, তারাও তখন তা দেয়নি। ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের রুদ্র রূপ যখন আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়, কয়েক লাখ কৃষক যখন মারা গেছে, লাখ লাখ কৃষক খিদের আগুনে দগ্ধ শুকনো দেহ নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে রেলস্টেশন বা রাজপথের ধারে জড়ো হয়েছে ভিক্ষা বা অনুগ্রহের আশায়, তখন অবশেষে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি এ আর এ-কে অনুমতি দিল সাহায্য বিলি করার। ১৯২২ সালের শরৎ ও বসন্তে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউক্রেন এবং

ক্রিমিয়ায় এ আর এ বিভিন্ন স্থানে 'সুপ' বিলি করার গুমটি চালু করে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং ইহুদি জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কমিটিও এই উদ্যোগে হাত মেলায়। ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি আগাগোড়াই এই সংগঠনগুলোকে বিদেশি গুপ্তচরদের আখড়া হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং এদের সঙ্গে খাদ্যবন্টন উদ্যোগে সামিল হওয়া ইউক্রেনিয়দের মাঝেমধ্যেই গ্রেফতার করে স-পীড়ন জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে তাদের সন্দেহ প্রমাণকারী 'তথ্য' নিষ্কাশন করতে চেয়েছে। এমনকি ১৩ বছর কেটে যাওয়ার পরও ১৯৩৫ সালে ওডেসা শহরের এক মহিলাকে গুপ্তপুলিশ গ্রেফতার করে 'প্রতিবিপ্লবী' হিসেবে, তাঁর 'প্রতিবিপ্লবী' কার্যকলাপের বিবরণী হিসেবে গুপ্তপুলিশের নথিতে বলা হয় যে ১৯২২ সালে তিনি ওডেসায় এ আর এ-র সঙ্গে সাহায্য-বিতরণী কাজে সামিল হয়েছিলেন।

১৯২৩-য়ের শেষে এসে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের রোষ স্তিমিত হল। প্রকৃতির রুদ্ররোষ যেন দুঃখ ও দয়ায় বিগলিত হল। বৃষ্টি এল স্বাভাবিক ছন্দে। কৃষ্ণমৃত্তিকা রসে ভিজে উঠল আবার। কৃষিজমিতে ফসল, কৃষকের ঘরে খাদ্য আবার দেখা দিল।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ১৯২১ ও ১৯২২ এই গোটা দুটো বছর দক্ষিণ ইউক্রেনকে কোনও সাহায্য-সহায়তা ছাড়া প্রায় পরিত্যক্ত মৃত্যু-উপত্যকার মতো ফেলে রাখল কেন বলশেভিকরা ? রাশিয়ার সর্বত্র আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে আসা সংগঠনগুলোকে যেতে দিলেও দক্ষিণ ইউক্রেনে কেন যেতে দেওয়া হলনা ? প্রথমে দেখা যাক যে লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের কাছে দক্ষিণ ইউক্রেনের দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা সম্পর্কে কি ধারণা ছিল, নাকি ধারণার অভাবে তাঁরা এমন করেছিলেন। ১৯২২ সালে লেনিন কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারিয়েটের নেতা মলোটভকে একটা চিঠি লিখে তা সমস্ত পার্টি-সদস্যদের মধ্যে বিলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। চিঠিটায় দক্ষিণ ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলের গির্জা থেকে দামী জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে বলা হয়েছিল:

> দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে এখন মানুষের মরদেহ খাচ্ছে মানুষ। শয়ে শয়ে বা হাজারে হাজারে মৃতদেহ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। এখনই এবং কেবলমাত্র এখনই সেই সময় যখন গির্জার সম্পত্তি সরিয়ে ফেলার কাজ সবচেয়ে ক্ষিপ্ত ও নির্মম মেজাজ নিয়ে আমরা করতে পারি (এবং অবশ্যই করতে হবে) আর সবচেয়ে ছোটখাট বিরোধিতাকেও দ্বিধাহীনভাবে দমন করতে পারি। এখনই এবং কেবলমাত্র এখনই সেই সময় যখন ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা হয়

আমাদের পক্ষে থাকবে, আর নতুবা ন্যূনতম এই অবস্থানে থাকবে যে মুষ্টিমেয় (প্রতিক্রিয়াশীল) পাদরী বা প্রতিক্রিয়াশীল শহুরে পেটিবুর্জোয়াদের সমর্থন করতে পারবে না। এই প্রতিক্রিয়াশীলরা সোভিয়েত বিধানকে বলপ্রয়োগের পথে বিরোধিতা করতে উন্মুখ ও সমর্থ হলেও ব্যপক কৃষক জনগণ এখন তাদের সমর্থন করার জায়গায় থাকবে না।

(অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃষ্ঠা-৬৮-তে উদ্ধৃত।)

উদ্ধৃত অংশের প্রথম দুটো বাক্য থেকে স্পষ্ট যে লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের কাছে দক্ষিণ ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে খিদের তাড়নায় মানুষের মানুষকে খাওয়া ও হাজার হাজার মৃতদেহ রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকার খবর হাজির ছিল। তবুও তাঁরা দক্ষিণ ইউক্রেনের জন্য কোনও সাহায্য-সহায়তার ব্যবস্থা নিজেরাও করেননি, তখনও অবধি আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংগঠনগুলোকেও করতে দেননি। বরং তাঁরা গ্রামাঞ্চলের গির্জাগুলো থেকে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। গির্জাগুলোর পক্ষ থেকে অনাহারী কৃষকদের যতটুকু বা সাহায্য করা সম্ভব ছিল, তাও থাকবে না। তবে এর মধ্য দিয়ে লেনিন রাজনৈতিক একটি সম্ভাবনাকেই সজোরে হাজির করেছেন। সেই সম্ভাবনা হল অনাহার-মহামারী-দুর্ভিক্ষে ক্লান্ত বিধ্বস্ত কৃষকদের এখন বলশেভিকদের বিরোধিতা করার শক্তি থাকবে না। তাই এই সুবর্ণসুযোগকে কাজে লাগিয়ে যত ছোটখাটই হোক যে কোনও বিরোধিতাকে নির্মম ও ক্ষিপ্তভাবে দমন বিরোধিতার সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। কৃষকদের যাতে বলশেভিকদের পক্ষে থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা প্রবাদ আছে যে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। নিশ্চিতভাবেই নরকে গেলেও ঢেঁকি ধানই ভানে। তাই দুর্ভিক্ষ-মহামারীর নরকপ্রহরী হিসেবে বলশেভিক নেতারাও সমস্ত বিরোধিতাকে নির্মূল করে সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজই করছিল।

বলশেভিকরা কী তাহলে ১৯২১-১৯২২ সালে দক্ষিণ ইউক্রেনে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের আগুন না নিভিয়ে কৃষকদের বলশেভিক-বিরোধিতার স্পর্ধাকে পুড়ে ছাই হওয়ার অপেক্ষা করছিল। ঝুরবেলিয়ুক ও কুলচিতস্কিয়ি-র মতো সাম্প্রতিক ইউক্রেনিয় ইতিহাস-লেখকরা ১৯২১-১৯২-য়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এমনই অভিযোগ করেছেন। তাঁরা নির্দেশ করেছেন যে মাখনোভিস্ট আন্দোলন ও কসাকদের স্বশাসন আন্দোলনের ঘাঁটিগুলোতেই বিনা সাহায্যে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

১২

আপাত সমঝোতা

১৯২১ সালের অক্টোবরে লেনিন কম্যুনিস্ট পার্টির কৌশলবদলের প্রস্তাব আনলেন। এতদিনকার যুদ্ধ সাম্যবাদ (war communism)-য়ের কৌশলের বদলে নয়া অর্থনৈতিক কৌশল (New Economic Policy, সংক্ষেপে, 'নেপ')। বলশেভিক রাজনৈতিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের এক সভায় তিনি বললেন যে পূর্বেকার কৌশল এক ভুল পূর্বধারণার উপর দাঁড়িয়ে ছিল বলে সংকটের মধ্যে এনে ফেলেছে। সেই ভুল পূর্বধারণা হল:

> ...কম্যুনিস্ট উৎপাদন ও বন্টনে সরাসরি পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ভুল করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে অতিরিক্ত খাদ্য উপযোজন ব্যবস্থায় কৃষকরা আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যশস্য তুলে দেবে, যা আমরা কারখানাগুলোয় বন্টন করতে পারব এবং তার মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট উৎপাদন ও বন্টন অর্জন করতে পারব।... গ্রামীণ জেলাগুলোয় চালানো এই অতিরিক্ত খাদ্য উপযোজন ব্যবস্থা— শহরের বিকাশের সমস্যা সমাধানের এই সরাসরি কম্যুনিস্ট পথ— উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির পথে বাধা হয়েছে এবং ১৯২১ সালের শরতে দেখা দেওয়া গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ হয়ে উঠেছে।... সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার জন্য সরাসরি আক্রমণের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে চূর্ণ করতে আমরা পারবনা। যদি আমাদের সাংস্কৃতিক স্তর অন্যরকম হত, তাহলে আমরা সরাসরি আক্রমণের পথ নিতে পারতাম...। আমাদের নয়া অর্থনৈতিক কৌশল সারবস্তুগতভাবে চিহ্নিত করে যে শোচনীয় পরাজয়ের মুখে পড়ে আমরা কৌশলগতভাবে পিছু হটতে শুরু করেছি।... নয়া অর্থনৈতিক কৌশলের অর্থ হল খাদ্য অধিযাচন ও সংগ্রহের পরিবর্তে কর বসানোর ব্যবস্থা। ... এর মানে অতিরিক্ত খাদ্য উপযোজন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া, যার ফলে কৃষকরা কর দেওয়ার পরও অবশিষ্ট অতিরিক্ত ফসল বাজারে স্বাধীনভাবে বিক্রি করার ছাড় পেয়ে যাবে। আমাদের মোট জনগণের একটা বিশাল বড় অংশ কৃষক,

তারা আমাদের গোটা অর্থনীতির একটা বিপুল বড় অংশ, আর সেই কারণে এই স্বাধীন বিক্রিবাটার মাটিতে পুঁজিবাদের বেড়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী।... প্রলেতারিয় রাষ্ট্র ক্ষমতাকে, কৃষকদের সমর্থন সঙ্গে নিয়ে, ওই পুঁজিবাদী ভদ্রলোকদের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের কেটে দেওয়া পরিখা দিয়েই পুঁজিবাদ বইতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে এমন এক পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় যা রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়ে থেকে রাষ্ট্রের সেবা করে।... মানুষ সর্বত্র সভা করছে ও সবরকম প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে এমন একটা পর্যায় ছাড়া এখন বিপ্লব বিকশিত হতে পারবে না।... সভার আয়োজন করে দাও, কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই শাসন কর। পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী শাসকরা যত কড়া শাসন করেছে, তার থেকেও কড়া হাতে শাসন করতে হবে। যদি তা না করতে পার তবে পুঁজিবাদীদের উৎখাত করতে পারবেনা। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আগে যা ছিল, তার থেকে আরও অনেক কড়া ও অনেক দৃঢ় হতে হবে এখনকার সরকারকে।

(লেনিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড-৩৩, পৃষ্ঠা- ৬২-৭২)

বলশেভিক অন্দরমহলে বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়েছিল নেপ-য়ের কৌশল। সে সম্পর্কে পার্টিকর্মীদের কাছে লেনিনের এই উপস্থাপনা বেশ কয়েকটি দিককে তুলে ধরে । একে একে সেই দিকগুলো বিচার করা যাক।

প্রথমত, ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়া, পরাজয়ের মুখে পড়ে পিছু হটা ইত্যাদি কথাগুলো ইঙ্গিত করে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর বলশেভিকদের আত্মবিশ্বাস নাড়িয়ে দিয়েছে। কৃষকদের সম্পর্কে নেওয়া নীতি ভুল ছিল তা স্বীকারে বাধ্য করেছে। কিন্তু ভুলটা ঠিক কোথায়? ভুলটা এইখানে নয় যে রাষ্ট্রে বসে সিদ্ধান্ত করে রাষ্ট্রের দমনবাহিনীকে ব্যবহার করে কৃষকদের ফসল কেড়ে নেওয়া সাধারণভাবেই ভুল, অন্য কোনও পরিস্থিতিতে, জনগণের সাংস্কৃতিক স্তর অন্যরকম হলে তা ঠিকও হতে পারে। ভুলটা আসলে এখানে যে কৃষকদের নিচু সাংস্কৃতিক স্তরের কারণে কম্যুনিজম গড়ার এই সরাসরি পথ যে কার্যকরী হবেনা, তা আগে বুঝতে না পারা। তাহলে সংকটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল কৃষকদের নিচু সাংস্কৃতিক স্তর, যার কারণে তারা কম্যুনিস্ট উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বৃহৎ শিল্প ও শহর দ্রুত গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের হাতে প্রয়োজনমতো ফসল তুলে দিতে অস্বীকার করেছে। কৃষকদের এই পশ্চাৎপদতার জন্যই এখন বলশেভিকদের পিছু হটে অন্য কৌশল নিতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের জোর খাটিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কেড়ে নেওয়ার 'সরাসরি কম্যুনিজম গড়ার পথ' থেকে পিছু হটে নতুন যে কৌশল নেওয়া হচ্ছে তা হল নেপ। এই কৌশলে, রাষ্ট্র কর আদায়ের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য আদায় করে নেবে, বাকি উদবৃত্ত ফসল স্বাধীনভাবে বিক্রি করার 'ছাড়' ('অধিকার' নয়) কৃষকদের দেওয়া হবে। কিন্তু কৃষকদের এই স্বাধীনভাবে বিক্রিবাটা করার জমি যেহেতু পুঁজিবাদ গজানোর উর্বরভূমি, তাই কম্যুনিজম-যাত্রী রাষ্ট্রকে কড়া নজর রাখতে হবে তার উপর। রাষ্ট্রের কেটে দেওয়া খাতের বাইরে যাতে সে বেরোতে না পারে, রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেয় এবং রাষ্ট্রের সেবা করে তা কড়া শাসনের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং নয়া নীতি যে স্বাধীনতার 'ছাড়' কৃষকদের দিল, তা এমনই এক অদ্ভূত স্বাধীনতা যা রাষ্ট্রের চোখে তাকে আরো সন্দেহভাজন করে তুলে আরও কড়া শাসন-নিয়ন্ত্রণের বস্তু করে তুলবে।

তৃতীয়ত, কম্যুনিজম-যাত্রী রাষ্ট্রকে কৃষকদের সমর্থন পেতে হবে। এরজন্য বিপরীতমুখী দুটি প্রক্রিয়া একইসঙ্গে চালানোর কথা বলা হয়েছে। একদিকে সবরকম প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক করার সভা আয়োজন করা, আবার অন্যদিকে দ্বিধাহীনভাবে সবচেয়ে কড়া শাসন বলবৎ করা। অর্থাৎ, কৃষকদের কিছু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হবে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সীমা ও গণ্ডী রাষ্ট্রই কেটে দেবে।

লেনিন নির্দেশিত এই নয়া কৌশল ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টি ইউক্রেনে লাগু করল। গ্রামেগঞ্জে কৃষকদের হাটবাজারগুলো পুনর্জন্ম নিল। ফসলের বেচাকেনা করা ব্যাপারিরাও ফিরে এল। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আবার গ্রামের লোকেদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এল। কিন্তু এই কৃষক ও ব্যপারিরা কুলাক ও নেপ-ওলা (NEP-men) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে সন্দেহ ও নজরদারির বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত হল। শহরের শ্রমিকদের মধ্যে কোনও খাদ্যের টানাটানি দেখা দিলেই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারকরা প্রচার করত যে কুলাক ও নেপ-ওলারাই মুনাফা করার জন্য খাদ্যশস্য মজুদ করে রেখে সংকট তৈরি করছে।

অন্যদিকে, ইউক্রেনিয় কৃষকদের কাছে টানার জন্য, অর্থাৎ সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য তৈরি করার জন্য বলশেভিকরা তাদের ভাষিক-সাংস্কৃতিক নীতিতে একটা বড় পরিবর্তন আনল। রুশ ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বাত্মক আরোপ থেকে পিছু হটে ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার এই পরিবর্তিত নীতি 'ইউক্রেনিয়করণ' নামে পরিচিত।

এই কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া নিয়েও বলশেভিকদের মধ্যে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। ইউক্রেনিয়ার জনকমিশারদের কাউন্সিলের নেতা রাকোভস্কি ১৯২১ সালেও ঘোষণা করেছিলেন যে ইউক্রেনিয় ভাষার ব্যবহার বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠেনা, ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার বিস্তারের মানে ইউক্রেনিয় পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও ইউক্রেনিয় কুলাকদের আধিপত্য বিস্তার পাওয়া। রাকোভস্কির ডেপুটি ডিমিত্রো লেবেড-য়ের বিরোধিতা ছিল আরও চাঁছাছোলা। লেবেডের মত ছিল যে ইউক্রেনিয় ভাষা শেখা একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লববিরোধী কাজ কারণ ইউক্রেনিয় ভাষা হল একটি নিকৃষ্ট গ্রামীণ ভাষা, যেখানে রুশ ভাষা হল শহরের উৎকৃষ্ট উন্নত ভাষা। তাঁর 'দুই সংস্কৃতির তত্ত্ব' শিরোনামায় নীতিনির্ধারক চর্চার প্রবন্ধে লেবেড গ্রামীণ কৃষকঘরের শিশুদের ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমে প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার ছাড় দিয়েছিলেন, যেহেতু তারা অন্য কোনও ভাষা বুঝবে না, কিন্তু দ্রুতই তাদের রুশ ভাষা শিখিয়ে সেই ভাষার ব্যবহারকারী করে তোলার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিলেন যাতে বিপ্লবী রুশ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে মিশে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

সমাজজুড়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্রের শাসনাধীনে বিপ্লবী সংস্কৃতির এক সমসত্ত্ব রূপ গড়ে তোলা ছিল বলশেভিকদের আদর্শ। সেই সমসত্ত্ব বিপ্লবী সংস্কৃতিতে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শহরায়ন, মতবাদিক শৃঙ্খলা ছিল প্রধান উপাদান, আর ঐতিহ্য, লোকসংস্কার, গ্রামীণ জীবনধারাকে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে দেখা হত। সুতরাং ইউক্রেনিয় ভাষা তার ভিত্তি ইউক্রেনিয় গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বলশেভিকরা তাচ্ছিল্য ও সন্দেহের চোখেই দেখত। কিন্তু নেপ পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার সর্বাত্মক বিরোধিতা করে গেলে কোনওভাবেই ইউক্রেনিয় কৃষকদের সমর্থন আদায় করা যাবেনা, বরং জাতীয়তাবাদী ইউক্রেনিয় 'বুর্জোয়া'-রা কৃষকদের নিজেদের পক্ষে টেনে নেবে। এই ভাবনা থেকে ১৯২০ সাল নাগাদ ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা 'জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট' ধারা গড়ে উঠল। স্ক্রিপনিক, জাতোনস্কি, শুমস্কি-র মতো বলশেভিক নেতারা সেই ধারার নেতা। তাঁরা চান রুশ ভাষার আধিপত্য বজায় রেখেই ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির জন্য একটা জায়গা করে দেওয়া, যা দিয়ে ইউক্রেনিয় কৃষকদের কিছুটা আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করা যায়। নেপের মধ্যের কৃষক-সমর্থন আদায়ের তাগিদ এই ধারাকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তোলে।

১৯২৩ সালের গ্রীষ্মে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'ইউক্রেনিয়করণের' প্রথম আদেশটি জারি করে। তার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় ভাষাকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে সরকারি মান্যতা দেওয়া হয় এবং সরকারের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের এক বছরের মধ্যে রুশ ভাষার পাশাপাশি ইউক্রেনিয় ভাষাতেও সরকারের কাজ চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর গ্রামের স্কুলে ইউক্রেনিয় ভাষায় পাঠ ও কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউক্রেনিয় ভাষায় বিদ্যাচর্চার কিছু অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯২৪ সালের মার্চে আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে। মিখাইলো হ্রুসেভস্কিকে ইউক্রেনে ফেরার অনুমতি দেয় সোভিয়েত সরকার। ১৯১৯ সালে ইউক্রেন ছেড়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হওয়ার পর থেকে প্রবাসে হ্রুসেভস্কি ও তাঁর সঙ্গীরা ইউক্রেনিয় সমাজগণতান্ত্রিক পার্টি টিকিয়ে রেখেছিলেন। ১৯২০-র পর থেকে হ্রুসেভস্কি একাধিকবার বলশেভিকদের কাছে আবেদন করেছিলেন ইউক্রেনে ফিরে এসে রাজনৈতিক কার্যক্রম করার স্বাধীনতা তাঁদের দেওয়া হোক। এমন প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র গঠনের সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে ইউক্রেনিয় কৃষকদের সন্দেহ-অবিশ্বাসের দূরত্ব ঘোচানোর কাজ করবেন। কিন্তু বলশেভিকরা সে আবেদনে সাড়া দেয়নি। বলশেভিক কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর কোনও পার্টিকে কাজ করতে না দেওয়ার সংকল্পে তারা দৃঢ় ছিল। ১৯২৪ সালে হ্রুসেভস্কি ব্যক্তিগতভাবেও সংকটপূর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁচেছিলেন। মাতৃভূমিতে ফেরার আশা বিসর্জন দিয়ে পেশাগত বিদ্যাচর্চার কাজ বহাল রাখার জন্য প্রাগ, লভিভ, অক্সফোর্ড বা প্রিন্সটন, কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। ঠিক এই সময়ে বলশেভিকরা তাঁকে প্রস্তাব দিল যে তিনি যদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখেন, তাহলে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। হ্রুসেভস্কি এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাঁর অন্য সমাজগণতন্ত্রী সহযোগীরা এরজন্য হ্রুসেভস্কির কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এর মধ্য দিয়ে হ্রুসেভস্কি রাজনৈতিকভাবে আত্মহত্যা করলেন এবং হ্রুসেভস্কির খ্যাতিকে ব্যবহার করে বিশ্বের চোখে ইউক্রেনের উপর বলশেভিক দখলদারিকে মান্যতা অর্জন করিয়ে নেওয়ার জন্য বলশেভিকদের সুযোগ করে দিলেন। হ্রুসেভস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে পারাই এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য কোনও জায়গার চেয়ে কিয়েভেই তা সবচেয়ে

ভালোভাবে করা যাবে। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মিখাইলো হ্রুসেভস্কি প্রায় পাঁচ বছর পর আবার নিজের দেশের মাটিতে পা রাখলেন। সমবেত হওয়া জনতা হাতে ধরা ইউক্রেনিয় পতাকা নেড়ে হর্ষোচ্ছাসে তাঁকে আবার বরণ করে নিল।

সোভিয়েত সরকারি নথির লেখ্যাগারে রক্ষিত বলশেভিক গুপ্তপুলিশের হ্রুসেভস্কি-বিষয়ক বিশালায়তন 'ফাইল' দেখায় যে তাঁকে ঘিরে কড়া গোপন নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাশাপাশি, কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস-গবেষণার নতুন বিভাগ খোলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হল। 'সর্ব ইউক্রেনিয় বিজ্ঞান আকাদেমি' নামের এই নতুন বিভাগ তার ইউক্রেনিয় ভাষায় নামের (ভ্সেউক্রাইনস্কা আকাদেমিয়া নাউক) আদ্যক্ষর অনুযায়ী সংক্ষেপে 'ভুয়ান' নামে পরিচিত হল। হ্রুসেভস্কি এখানে তাঁর 'ইউক্রেনিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁকে ঘিরে তরুণ ইতিহাস ও সমাজ গবেষকদের একটা দল সেখানে জড়ো হল। উনিশ শতকের ইউক্রেনের কৃষক বিদ্রোহ এবং ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবোধের ইতিহাস নিয়ে তারা ইউক্রেনিয় ভাষায় গবেষণাপত্র ও বই প্রকাশ করতে শুরু করল। শহরে ইউক্রেনিয় ভাষায় কথাসাহিত্য, কবিতা, নাটক-প্রযোজনারও নতুন ঢেউ উঠল। আধুনিকতাবাদী নানা শিল্পচিন্তা সেখানে আবর্ত তৈরি করল।

অপরদিকে, গ্রামীণ ইউক্রেনের নান্দনিক সৃজনশক্তিকে জাগ্রত ও প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'প্লুহ' (ইউক্রেনিয় শব্দ, বাংলায় 'লাঙল') নামে একটা সংগঠন গড়ে উঠল। বিভিন্ন গ্রামে তারা সাহিত্য পাঠচক্র সংগঠিত করতে শুরু করল, প্রত্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কর্মীরা হাজির হল গ্রামীণ মানুষদের আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে তা নথিবদ্ধ করার জন্য। 'বড় বিস্তারে পটরচনা করা, সার্বজনীন বিষয় নিয়ে কাজ করা, মূলত বিপ্লবী কৃষকদের জীবন তুলে ধরা' ছিল তাদের প্রকাশিত নান্দনিক ইস্তাহারের মূলকথা। ইউক্রেনে সম্ভবত তারাই প্রথম 'লেখকদের কলোনি' গড়ে তোলে। খারকিভ শহরে একটা চত্বরের মধ্যে বেশ কিছু ঘর নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই কলোনি যেখানে লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকররা একসঙ্গে যৌথজীবন যাপন করত।

ইউক্রেনিয় ভাষার সর্বমান্য প্রমিত রূপ নির্ধারণের চেষ্টাও সেই 'সেন্ট্রাল রাদা'-র আমলের পর আবার শুরু হল। পোল অধিকৃত পূর্ব ইউক্রেন ও রুশ অধিকৃত পশ্চিম ইউক্রেনের ইউক্রেনিয় কথ্য ও লিখিত ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। ধার করা শব্দ গ্রহণ ও বানানবিধি অনুসরণে পূর্ব ইউক্রেনিয় ভাষার উপর পোল ভাষার প্রভাব ও পশ্চিম ইউক্রেনিয় ভাষার উপর

রুশ ভাষার প্রভাব পড়েছিল। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যলয়ের 'ভুয়ান' ইউক্রেনিয় লিপিবিধি নির্ধারণের জন্য একটি বিভাগ গড়ল, যার কাজ হবে সর্বগ্রাহ্য সুষম ভাষাবিধি গড়ে তোলা। এই বিভাগ একটি প্রামাণ্য রুশ-ইউক্রেনিয় অভিধান তৈরির কাজও শুরু করল। ১৯২৫ সালে ইউক্রেনিয়ায় বলশেভিক শাসনের সর্বোচ্চ ধাপ 'ইউক্রেনিয়ার গণকমিশারদের কাউন্সিল'-ও লিপিবিধি মান্য রূপ নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করে দিল। প্রথমে সেই কমিশনের মাথায় ছিলেন বলশেভিক নেতা শুমস্কি, তারপরে আরেক বলশেভিক নেতা স্ক্রিপনিক। বেশ কয়েক মাস তর্কবিতর্কের পর এই কমিশন শাসনকেন্দ্র খারকিভে ১৯২৭ সালের বসন্তে একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন। পোল অধিকৃত পূর্ব ইউক্রেনের ল্‌ভিভ শহরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হল। এই সম্মেলনে গৃহীত 'খারকিভ লিপিবিধি' ইউক্রেনিয় ভাষার সর্বমান্য ভাষাবিধি হিসেবে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হল।

১৯২৩ সালের স্কুলবর্ষের শুরুতে সরকার নির্দেশ জারি করেছিল যে সমস্ত ইউক্রেনিয় শিশুকে তার মাতৃভাষায় পড়াতে হবে। এর মধ্য দিয়ে কৃষকঘরের ছেলেমেয়েদের একইসঙ্গে 'সাক্ষর ও সোভিয়েত' করে তোলা ছিল সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য। আশা ছিল যে ইউক্রেনিয় ভাষায় বলশেভিক মার্কসবাদী ভাবনা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেদের মনে করতে শিখবে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকরী করার জন্য শিক্ষা-কমিশার স্ক্রিপনিক ইউক্রেনিয় ভাষায় শিক্ষকের অভাব মেটানোর জন্য পোল-অধিকৃত পূর্ব ইউক্রেন থেকে ১৫০০ জন শিক্ষককে নিয়ে এসে নিয়োগ করেছিলেন যেহেতু সেখানে ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমের স্কুল অনেক আগে থেকেই চালু ছিল।

এই সরকারি পৃষ্ঠপোষণার ফলে ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে ইউক্রেনিয়-ভাষামাধ্যম স্কুলের সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়েছিল। ১৯২৩ সালে যেখানে পশ্চিম ইউক্রেনিয়ার সব স্কুলের মধ্যে ২৩ শতাংশ ছিল ইউক্রেনিয় ভাষা-মাধ্যমের, ১৯২৯ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৮৮ শতাংশ।

সেই সময়ে স্কুলে পড়া একজন হলেন পেত্রো হ্রিহোরেঙ্কো। গ্রামীণ ইউক্রেনিয়ার কৃষক ঘরে জন্ম নেওয়া এই যুবক শিক্ষান্তে লালফৌজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, 'জেনেরাল' পদ অবধি উঠেছিলেন, তারপর সোভিয়েত শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে করা তাঁর স্মৃতিচারণায় দেখা যায় যে স্কুলজীবন তাঁর মনের গঠনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর গ্রামের স্কুলের দুজন

শিক্ষক গ্রামেই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন শুরু করেছিল। উনিশ শতকের ইউক্রেনিয় জাতীয়তা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রোজভিতা'-র অনুকরণে ইউক্রেনিয় শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করা ছিল সেই সংগঠনের লক্ষ্য। সেই দুই শিক্ষকের বাড়িতে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও গ্রামের অন্যান্য মানুষদের নিয়ে তার সভা বসত। হ্রিহোরেঙ্কো স্মৃতিচারণ করেছেন:

> তাঁদের বাড়িতে ইউক্রেনিয়ার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বানদুরা সেই প্রথম আমি দেখলাম ও তার বাজনা শুনলাম। তাঁদের কাছ থেকে আমি মহান ইউক্রেনিয় কবি তারাস হ্রিহোরোভিচ শেভচেঙ্কোর লেখা 'কোবজার' সম্পর্কে জানলাম। আর তাঁদের কাছ থেকেই প্রথম জানলাম যে আমি হলাম মহান কবি শেভচেঙ্কোর জাতির মানুষ, আমি ইউক্রেনিয়ান।... আমার সংস্কৃতি ও আমার জাতির মানুষদের প্রতি ভালোবাসা আমার মনে মিশে একাকার হয়ে গেল সার্বজনীন সুখ, আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং শ্রমিকদের অসীম ক্ষমতার স্বপ্নের সঙ্গে।
>
> (পেত্রো হ্রিহোরেঙ্কো, মেময়ারস, ইংরেজিতে অনুবাদ: থমাস হুইটনি, পৃষ্ঠা-১৪)

হ্রিহোরেঙ্কো বলশেভিকদের যুবসংগঠন 'কোমসোমোল'-য়ের সদস্য হয়েছিলেন এর পরেপরেই, কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যও হন তারপর। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির একজন হওয়ার আত্মপরিচয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল তাঁর শেভচেঙ্কোর জাতির একজন হওয়ার আত্মপরিচয়।

ইউক্রেনিয় ভাষাশিক্ষা আরও বহু নতুন প্রজন্মের পড়ুয়াকেই ইউক্রেনিয় শিকড়ের টানে অতীত ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কারের পথে নিয়ে গিয়েছিল। ইউক্রেনিয় ভাষার গ্রামীণ লোকগান ও গীতিনাট্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার যেন তাদের সঞ্জীবনী স্পর্শের জন্যই অপেক্ষা করছিল। শহরে ও গ্রামে তরুণরা দল বেঁধে বানদুরা বাজিয়ে গান গাওয়ার দল গড়ে তুলল। অচিরেই এমন দলের সংখ্যা কয়েকশ ছাপিয়ে গেল। অনেকসময় লোকগানগুলোর ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক অনুষঙ্গে বদলে নেওয়া হত, রুশ আধিপত্য বিরোধী অনুষঙ্গগুলোকে অতীতের জারতন্ত্র-বিরোধী হিসেবে বর্তমানের সঙ্গে ছোঁয়াচহীন করার ভান নেওয়া হত। তবুও বানদুরার সুরে যেন ইউক্রেনিয়ার স্বতন্ত্র জাতীয়তা গান গেয়ে উঠত।

কিয়েভ শহরের একটি স্কুলের প্রধানশিক্ষক তাঁর স্কুলের নামই দিয়েছিলেন 'তারাস শেভচেঙ্কো কিয়েভ ১ নম্বর লেবার স্কুল'। তিনি তাঁর স্কুলের পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতাকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়াদের বলতেন তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতা পড়ার সময় নিজস্ব

একটা খাতা সঙ্গে রাখতে। এক একটা কবিতা পড়ে মনে যদি কোনও ভাবনা আসে তা লিখে রাখতে, মনে যদি কোনও ছবি ভেসে ওঠে তা এঁকে রাখতে। পড়ুয়াদের এমন সব লেখা থেকে ছোট ছোট ব্যাঙ্গনাট্য তৈরি করে পড়ুয়াদের দিয়েই তা স্থানীয় শ্রমিকদের ক্লাবঘরে অভিনয় করাতেন। স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে একটা ইউক্রেনিয় ভাষায় সংবাদপত্রও শুরু করা হয়। জানা যায় যে স্কুলের দ্বারপালের বাবা শেভচেঙ্কোর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পড়ুয়ারা সেই বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গিয়ে তাঁর শেভচেঙ্কো স্মৃতি জানার জন্য তাঁর সাক্ষাৎকার নেয় এবং স্কুলের সংবাদপত্রে সেই সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সংবাদপত্রের বিভিন্ন লেখায় সামাজিক সাম্যের জন্য স্লোগান তৈরি করা হত মার্কস বা লেনিন উদ্ধৃত করে নয়, শেভচেঙ্কোর কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে।

অবশ্য অন্যরকম ছবিও ছিল। অনেক স্কুলে শিক্ষকরা ইউক্রেনিয় ভাষা সঠিকভাবে জানতেন না, জানার ইচ্ছাও ছিলনা। কোনওরকমে আধাভুল আধারুশ জগাখিচুড়ি ইউক্রেনিয় ভাষার পাঠ তাঁরা পড়ুয়াদের দিতেন।

শহরের বহু অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমে পড়াতে অস্বীকার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে তা তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করবে যেহেতু উচ্চশিক্ষায় তখনও রুশ ভাষারই একাধিপত্য নিরঙ্কুশ হয়ে রয়েছে।

সোভিয়েত সরকারের আমলা ও কর্তারাও প্রশাসনে ইউক্রেনিয় ভাষার ব্যবহার প্রতিহত করত। খাতায়কলমে তাঁদের ইউক্রেনিয় ভাষা জানা বাধ্যতামূলক হলেও তাঁরা সে ভাষা আয়ত্ত করায় গুরুত্ব দিতেন না এবং রুশ ভাষা ব্যবহারের একাধিপত্য বজায় রাখতেন।

১৯২৬ সালের গ্রীষ্মে হ্রুসেভস্কি তাঁর নিজের সম্পাদিত 'ইউক্রেইনা' পত্রিকায় জার আমলের কুখ্যাত এমস উকেজ নির্দেশ জারির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা প্রবন্ধ লেখেন। ওই নির্দেশে ইউক্রেনিয় ভাষায় কথা বলা ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'লজ্জার স্মৃতি'। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে ১৮৭৬ সালের ঘন্টা দীর্ঘদিন আগে ডুবে গেলেও এখনও ঢেউয়ের তলা থেকে তা বাজতে শোনা যাচ্ছে। রুশ আধিপত্যের নীচে ইউক্রেনের স্বকীয় সংস্কৃতিকে চাপা দিয়ে রাখার প্রবক্তা ও সমর্থকদের এখনও সোভিয়েত রাশিয়ার শাসকমহলে দেখা যাচ্ছে। রুশ আধিপত্যবাদীরা এখনও স্কুলের পাঠ্যক্রমে রুশ ভাষা, রুশ ইতিহাস ও রুশ সংস্কৃতির আধিপত্য অক্ষত রাখতে চায়। কেন্দ্রীয় অধিকর্তারা ইউক্রেনিয় বা রুশ ছাড়া অন্য কোনও ভাষায়

পশ্চিম ইউরোপের ভাষার বইপত্র অনুবাদ হতে দিতে চাননা। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা রুশ ভাষাকেই পশ্চিম ইউরোপের দিকে দেখার একমাত্র জানালা করে রাখতে চান। সর্ব-রুশ আধিপত্যপন্থীরা এখনও এমনকি ইউক্রেনিয়দের মতো বিভিন্ন জনজাতির মানুষদের পরিবারের মধ্যেও কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহারের বিপক্ষে, ঘরের মধ্যে কথোপকথনেও তাঁরা রুশ ভাষা চাপাতে চান। এরপর হ্রুসেভস্কি সোভিয়েত সরকারকে সমালোচনা করে বলেন যে ক্ষমতার অবিরত কেন্দ্রীভূতকরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের জনজাতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর হাত থেকে সমস্ত সম্পদ ও সামর্থ্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে যার ফলে জনজাতিগুলোর ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই লেখা হ্রুসেভস্কিকে সোভিয়েত শাসকদের চরম রোষের পাত্র করে তুলল। অচিরেই তাঁকে কিয়েভ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মস্কোয় অঘোষিতভাবে বন্দি করে রাখা হবে, গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে, এবং রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। হ্রুসেভস্কি অবশ্য সঠিকভাবেই অশনি সংকেতটি দেখেছিলেন। ১৯২৫-য়ের পর থেকেই শাসকমহলে 'ইউক্রেনিয়করণ' নীতির বিরোধীদের সুর চড়ছিল। ইউক্রেনিয় ভাষায় বলশেভিক মার্কসবাদকে আয়ত্ত করার চেয়ে একটা নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ যে ইউক্রেনিয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বকীয়তার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিল তার মধ্য দিয়ে তাঁরা ইউক্রেনিয় স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবির ভূত দেখতে পাচ্ছিলেন। রুশ আধিপত্যবাদ আবার প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিল। ১৯২০-র দশকের শেষে গিয়ে ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকটের আবহে এই ইউক্রেনিয়করণ-বিরোধীরা চরম আক্রমণ হানল। ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার, ইউক্রেনিয় ভাষায় শিক্ষা আবার নিষিদ্ধ হল। সে কথায় আমরা যাব। তবে তার আগে দেখা যাক কীভাবে ১৯২০-র দশকেই ক্রমশ গড়ে উঠে নির্ধারক চেহারা ধারণ করেছিল এই আক্রমণ হানার প্রধান হাতিয়ার 'ওজিপিইউ'।

১৩

সিঁদুরে মেঘ, পোড়া ঘর

১৮৯২ সালে নিপার নদীর তীরবর্তী ছোট শহর ভের্খনিয়োদনিপ্রোভস্ক-য়ে জন্ম, কল-কারখানার শহর লুহানস্ক-য়ে বেড়ে ওঠা, এক কারখানা-কর্মচারীর ছেলে ভসেভোলোদ বেলিয়াতস্কি। অভিজাত বংশধারার উত্তরাধিকারী বলে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। রুশভাষী ছিলেন। ১৯২২ সালে ব্যক্তিগত নথি তৈরির সময় তিনি নিজের জাতীয়তার পরিচয় লিখেছিলেন 'রুশ'। পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করেন 'ইউক্রেনিয়ান'-য়ে। তারপর ১৯৩৭ সালের স্তালিনিয় মহাসন্ত্রাসের পর্বে গ্রেফতার হওয়ার সময় আবার 'রুশ' পরিচয় লিখিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে বলশেভিক পার্টির সদস্য হওয়া এই কম্যুনিস্টের কাছে জাতীয়তা মোটেই কোনও গভীর আবেগের বিষয় ছিল না বোঝা যায়। শ্রেণিসংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেণিশত্রুদের খতম করা গভীর আবেগের বিষয় ছিল। এই শ্রেণিশত্রুদের তিনি 'উইপোকা' বা 'জঞ্জাল' বলে অভিহিত করতেন। ১৯১৭-১৯১৮ জুড়ে বলশেভিক লালফৌজের সঙ্গে ককেশাস অঞ্চলে বহু বলশেভিক নীতির বিরোধী কৃষকবিদ্রোহ দমন করার কাজে 'গণবিচার' চালিয়ে বহু শ্রেণিশত্রু খতম করেছিলেন। ১৯১৯ সালে ইউক্রেনিয়ার 'চেকা'-য় যোগ দেন। জেরঝিনস্কির নেতৃত্বে কৃষকদের ও জাতীয়তাবাদীদের 'প্রতিবিপ্লবী' আন্দোলন দমন করায় উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে চেকা-র মধ্যে উপরের ধাপে উঠে আসেন। লেনিনের নেপ-য়ের কৌশলে তিনি জোর দিয়ে ধরেছিলেন কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের মধ্যে থেকে জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদকে কড়া হাতে দমন-নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাটাকে। সেই কাজের জন্য তিনি বলশেভিক গুপ্তপুলিশকে যথাযথভাবে গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন। গুপ্তপুলিশের নাম বদল হয়েছিল। প্রথমে চেকা থেকে বদলে করা হয় জিপিইউ (রুশ নামের আদ্যক্ষর-গঠিত সংক্ষিপ্তকরণ, নামের বাংলায় মানে 'রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক

অধিকরণ'), তারপর তা থেকে বদলে ওজিপিইউ (রুশ নামের আদ্যক্ষর-গঠিত সংক্ষিপ্তকরণ, নামের বাংলায় মানে 'সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক অধিকরণ')। নামবদলের সঙ্গে সঙ্গে তার গুরুত্বও বাড়ে, রাজনৈতিক নজরদারির ব্যবস্থাকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে পরাক্রান্ত অংশ হয়ে ওঠে। ১৯২০-র দশকে বেলিয়াতস্কি ইউক্রেনের ওজিপিইউ-কে শ্রেণিশত্রু দমনে নির্দ্বিধ ও ক্ষমাহীন করে গড়ে তোলায় মন দেন। গুপ্তচরের জাল বিস্তৃত করে নিরন্তর নজরদারি, খবর সংগ্রহ ও নথিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ইউক্রেনিয় জাতীয়তা সম্পর্কে অনুভূতিপ্রবণ যে কোনও শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, ছাত্র, এমনকি ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরাও তাঁর নজরবন্দি হয়। সমস্ত কার্যকলাপের উপর চরম গোপনীয়তা আরোপ করা হয়। ইউক্রেনিয়ার সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে তিনি দায় স্বীকার করতেন না, তিনি সরাসরি মস্কোর কম্যুনিস্ট পার্টি-নেতৃত্বের নির্দেশ নিয়ে চলতেন। তাঁর অধীনস্থ ওজিপিইউ পুলিশবাহিনীকে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন: 'জনতার উপর গুলি চালানোর নির্দেশ যদি দেওয়া হয় এবং তোমরা কেউ তা করতে অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাদের সকলকে গুলি করে মারব। কোনও আপত্তি ছাড়া আমার সমস্ত নির্দেশ তোমাদের পালন করতে হবে, কোনও প্রতিবাদ আমি বরদাস্ত করবনা।' প্রশ্নহীন নির্দেশপালনের আনুগত্যের পরিবর্তে তিনি তাঁর পুলিশবাহিনীর কর্মীদের মাইনে ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বাড়ানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনযাপনও অভিজাতসুলভ বিলাসব্যসনে সেজে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে অর্থনীতিতে আবার সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছিল। ১৯২৪ সাল থেকেই আবার খাদ্যসংকটের ছায়া ঘনিয়ে উঠছিল।

নেপ জারি হওয়ার পর কৃষকদের অতিরিক্ত শস্য 'স্বাধীনভাবে' বিক্রিবাটা করার ছাড় দেওয়া হলেও সেই পুঁজিবাদ-গর্ভ কাজকে কম্যুনিজম-যাত্রী রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া খাতে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা বাজারে দাম বেঁধে দেওয়ার কড়াকড়ি আরোপ করেছিল। কারখানাজাত দ্রব্যের দাম উঁচুতে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের দাম নিচুতে বাঁধা হত। ক্রমে এই দামের ফারাক বাড়তেই থাকল। (কারখানাজাত দ্রব্যের দাম ক্রমশ উপরে ওঠা ও কৃষিজাত দ্রব্যের দাম ক্রমশ নিচে নামা লেখচিত্রে আঁকলে অনেকটা খোলা কাঁচির মতো দেখাত, তাই কোনও রসিক বিজ্ঞজন কাব্য করে এর নাম দিয়েছিলেন 'কাঁচি সংকট'।) কৃষিজাত পণ্য নিয়ে বাজারে আসা ব্যক্তি-বিক্রেতাদের মুনাফালালসাকে দমন করতে এ নাকি অতি জরুরী ছিল! কৃষকরা তাদের ফসল বিক্রি করে ক্রমশ এমন

দাম পেতে থাকল যা দিয়ে নিতান্ত সাধারণ কোনও প্রয়োজনীয় কারখানাজাত দ্রব্য কেনা যায়না। ফলে কৃষকরা সরকারি দামে ফসল বেচা বন্ধ করে দিতে লাগল। একটা কালোবাজারও তৈরি হল, যেখানে সরকারি দামের চেয়ে অনেক বেশি 'ব্যক্তিগত দামে' কিছু কৃষক ফসল বেচত। সেই কালোবাজারে না যাওয়া বা না যেতে পারা কৃষকরা হয় অতিরিক্ত ফসল মজুত করে রাখত, নয়ত গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত, আর অপেক্ষা করত সরকারি দামের আবার উপরে ওঠার জন্য। ফলে শহরে খাদ্যের যোগান কমতে লাগল। ১৯২৭ সালে এসে শহরের খাদ্যসংকট আবার বিস্ফোরক হয়ে উঠল। সরকারের খাদ্যবন্টন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী গোটা সোভিয়েতরাষ্ট্রে শহরে বন্টনের জন্য দরকার ছিল ৭৭ লাখ টন খাদ্যশস্য, অথচ পাওয়া গেল মাত্র ৫৪ লাখ টন। সরকারের খাদ্যবন্টন ব্যবস্থায় বিশদ কোটা-ব্যবস্থা ছিল। এই কোটা-ব্যবস্থায় পার্টিনেতা, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, সেনারা পরিমাণে বেশি পেত, বন্টনে অগ্রাধিকারও পেত। এই সব সুবিধাপ্রাপ্তদের কোটার পর ছিল শ্রমিকদের কোটা। তারা পেত পরিমাণে কম, অগ্রাধিকারের বিচারেও ছিল পিছনে। শ্রমিকদের কোটার মধ্যেও অবশ্য নানা ভাগ ছিল। সরকারের চোখে গুরুত্বপূর্ণ কারখানাশিল্পের শ্রমিকরা পেত তুলনায় বেশি, বাকিরা কম। ফলে সরকারি খাদ্যসংগ্রহ কম হওয়ায় সবচেয়ে দুর্ভোগের শিকার হল শহরের সাধারণ শ্রমিকরা। সব শহরগুলোয় সরকারি খাদ্যবন্টন গুমটিগুলোর সামনে ভোর থেকে শ্রমিকপরিবারের মানুষদের লাইন ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকত। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, লাইনভাঙা নিয়ে বিবাদে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠত। তরপর গুমটি খুললে কখনও মিলত কোটার ভগ্নাংশ, কখনও কিছুই মিলত না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ওজিপিইউ এর উপরেও নজর রাখত। ওজিপিইউ-র নথিতে এক কারখানা-শ্রমিকের বউয়ের খেদোক্তি নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। সে বলেছিল: '১০ পাউন্ড রুটির জন্য গোটা দিনটা নষ্ট হল। এখন বর কারখানা থেকে ঘরে ফিরে আসবে আর তখনও রাতের খাবার তৈরি করে ওঠা হবেনা!' ত্ভের শহরে শ্রমিকদের মধ্যে এই কথা চালাচালিও নথিবদ্ধ হয়েছিল: 'মাখন নেই, গম এতদিনপর সামান্য পাওয়া গেল, কেরোসিনও পাওয়া যাচ্ছে না, জনগণকে বোকা বানানো হয়েছে!'

দশ বছর আগে ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যের দাবিতে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক পরিবারের মহিলাদের রাস্তায় নেমে আসা কীভাবে বিপ্লবের দরজা খুলে দিয়েছিল তা বলশেভিক নেতারা ভোলেননি। বলশেভিক নেতারা তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বলশেভিক পার্টির অন্দরমহলে স্তালিন তখন সর্বময় নেতা হয়ে ওঠার পথে। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কি ইতিমধ্যেই পার্টি থেকে বিতাড়িত ও দেশ থেকে নির্বাসিত। ট্রটস্কি ও তাঁর সঙ্গীদের 'বাম হঠকারী' লাইন 'পরাজিত' করার জন্য গোষ্ঠীসংগ্রামে স্তালিন সঙ্গী করেছিলেন বুখারিনকে। ট্রটস্কি ও তাঁর সঙ্গীরা দ্রুত শিল্পায়ন ও তার প্রয়োজনে কৃষির আশু সমবায়িকরণের পক্ষে ছিলেন। বুখারিন ছিলেন নেপ বহাল রেখে আংশিক মুক্ত বাজার ও কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষে। এখন স্তালিন ডিগবাজি খেয়ে বুখারিনের লাইনকে ডানপন্থী বিপ্লববিরোধী বলে আক্রমণ করলেন। বুখারিনের লাইন অর্থাৎ নেপ বহাল রাখার লাইন গ্রামাঞ্চলকে কুলাক ও মুনাফাবাজদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত করছে বলে তিনি অভিযোগ করলেন। অপসারিত ট্রটস্কি ও তাঁর সহযোগীদের লাইন এখন স্তালিনের লাইন হয়ে উঠল। তিনি চান দ্রুত শিল্পায়ন এবং গোটা কৃষিক্ষেত্রকে এখনই রাষ্ট্রীয় সমবায়ের অধীনে নিয়ে আসা। তার জন্য গ্রামে কুলাক ও তার সহযোগীদের এখনই নির্মমভাবে দমন করতে হবে। স্তালিন এর নাম দিলেন কুলাক নিশ্চিহ্নকরণ (dekulakization) অভিযান।

ট্রটস্কি, বুখারিন ইত্যাদি সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাকে দল থেকে সরিয়ে বা বেইজ্জত করে একমাত্র সর্বময় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে স্তালিন গোটা পার্টিযন্ত্রকে, বিশেষ করে গুপ্তপুলিশবাহিনীকে, নিজের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যে বাঁধলেন ও সেই অস্ত্র নিয়ে প্রতিবিপ্লবী কুলাকনিধনে নামলেন।

স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কাগানোভিচ ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে। এখন তিনি স্তালিনের কাছে কম্যুনিস্ট নেতা শুমস্কির বিরুদ্ধে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ পাঠালেন এবং এই জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহের সহমর্মী, সহযোগী বা সম্ভাব্য নেতা, তাও দাবি করলেন। ১৯২৭ সালের গোড়াতেই স্তালিন শুমস্কির নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন। সেই ধুয়ো ধরে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে শুমস্কিকে চরম সমালোচনা ও হেয় প্রতিপন্ন করে শিক্ষামন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য করা হল। 'ইউক্রেনিয়করণ' নীতির কাগজেকলমে মৃত্যু হল। ওজিপিইউ-র তত্ত্বাবধানে ইউক্রেনিয় ভাষার লেখক, শিক্ষক, গবেষক ও শিল্পীদের গ্রেফতার, অস্তিত্বহীন জাতীয়তাবাদী পার্টির সদস্য হয়ে গোপনে কাজ করার সাজানো অভিযোগ, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সাজানো বিচার, কারাগারে নিক্ষেপ বা একেবারে নিকেশ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া

ক্রমশ বিরাট আকার ধারণ করল। কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরেও জাতীয়তাবাদী চিহ্নিত করে ডাইনিনিধন চলল, স্পষ্ট করে দেওয়া হল যে মস্কোর কেন্দ্রীয় নির্দেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র অন্যমত বা দ্বিধাও এখন প্রতিক্রিয়াশীল জঞ্জাল হিসেবে ওজিপিইউ-র ঝাঁটায় ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।

১৯২৮-১৯২৯–য়ে ইউক্রেনে আবার ফলন খারাপ হল। ফসল পাকার সময় বিরূপ আবহাওয়া ও অসময়ের বৃষ্টি ফসলের প্রচুর ক্ষতি করল। কৃষকরা ফসল তুলতে পারল অনেক কম। কিন্তু সরকারি সংগ্রাহকরা এবার দ্বিগুণ তেজে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল আদায় করতে নেমে পড়ল। কৃষকদের ঘরে আর কিছু পড়ে থাকলনা। অনাহার, ক্ষুধা ও মন্বন্তর আবার থাবা বসাল ইউক্রেনের গ্রামে গ্রামে। ২৩,০০০ মানুষ সরাসরি অনাহারে মারা গেল ইউক্রেনের গ্রামে। আরও ৮০,০০০ মারা গেল অনাহার-জনিত অন্য নানা রোগে। কিন্তু সোভিয়েত সরকার ইউক্রেনের গ্রামে অনাহার বা মন্বন্তরের অস্তিত্বই স্বীকার করল না, কোনও সাহায্যের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা। তারা ব্যস্ত থাকল গ্রাম থেকে ছিনিয়ে নেওয়া খাবার শহরে পাঠানোর নিরাপদ বন্দোবস্ত করতে, যাতে পথে ক্ষুধার্ত কৃষকরা কিছু কেড়ে না নিতে পারে।

ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে ছড়ানো ওজিপিইউ-র নজরদাররা অবশ্য অন্য একটি বিষয়ে ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। কৃষকদের কোনও ইউনিয়ন বা আলাদা পার্টি গড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও ক্রমাগত আরও ঘন ঘন তেমন ইউনিয়ন বা পার্টি গড়ার ডাক উঠছিল নানা জায়গায় নানা মহল থেকে। ১৯২৫ সালে ওজিপিইউ এমন ১৩৯টি আহ্বান নথিবদ্ধ করেছিল, ১৯২৭ সালে তেমন নথিবদ্ধকরণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৩১২। সুতরাং কেবলমাত্র নজরদারি নয়, কড়া দমনের সময় এসে গেছে বলে ইউক্রেনের ওজিপিইউতে তোড়জোড় জোরদার হচ্ছিল।

মস্কো থেকেও সবুজ সংকেত আসতে শুরু করল। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে স্তালিন বললেন যে কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠনের আন্দোলন দেশজুড়ে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে চলেছে, পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র ব্যক্তিমালিকানাধীন চাষকে আধুনিক যৌথ চাষে রূপান্তরিত করতে চলেছে। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোর বৈঠক থেকে তখনই দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠনের আন্দোলনকে দ্রুত ও জোরদার করার নির্দেশ জারি করল। একইসঙ্গে সেই নির্দেশে রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠনের বিরোধীদের প্রতিবিপ্লবী চিহ্নিত করে, পার্টির ভিতরে বা বাইরে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কড়া হাতে তাদের দমন

করতে হবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হল। সেই প্রতিবিপ্লবীদের মাথা হিসেবে বুখারিনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল। নভেম্বরের এই ইঙ্গিতে গোটা সোভিয়েত রাশিয়ার মতো ইউক্রেন জুড়েও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রতিবিপ্লবী বুখারিনপন্থী ডাইন খোঁজা ও ডাইন-নিগ্রহ করে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করার পার্টিকাঠামোয় উপরে ওঠার লড়াই তীব্র হল। অন্যদিকে, প্রতিবিপ্লবী গ্রামীণ কুলাকদের দমন করার জন্য গ্রাম-অভিযানের কাড়া-নাকাড়া বাজতে শুরু করল। শহরের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে লাগাতার প্রচার জোরদার করা হল যে কুলাকরা মুনাফা লোটার ফাটকাবাজিতে খাদ্যশস্য আটকে রেখে শ্রমিকদের অনাহারের দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রমিকদের ডাক দেওয়া হল গ্রামে গিয়ে কুলাক দমন করে রাষ্ট্রীয় সমবায় খামার (রুশ ভাষায় 'কোলখোজ') গড়ার 'যোদ্ধা' হওয়ার জন্য। কম্যুনিস্ট যুব সংগঠন কোমসোমলের যুবক-যুবতীদেরও একই ডাক দেওয়া হল। কয়েক সপ্তাহ পর সোভিয়েত সরকারের কৃষি-বিষয়ক গণকমিশারিয়েত ঘোষণা করল যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদক জমির কোলখোজ-করণ তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলা হবে।

১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্য থেকে কুলাকদের চিহ্নিত করার ও গ্রামকে কুলাকমুক্ত করার আয়োজনের দায়িত্ব ওজিপিইউ-র হাতে তুলে দিল। কুলাক কাদের বলা হবে ? এই নির্ধারণ ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকল।

১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে ইউক্রেন সরকারের গণকমিশারদের কাউন্সিল (অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদ) একটা ডিক্রি জারি করে কুলাকদের খামারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিল এভাবে: যে খামারে নিয়মিত মজুরিতে খাটা লোক নিয়োগ করা হয়, যে খামারে কোনও জাঁতাকল, পশুচামড়া পাকা করার কল, ইঁটতৈরি বা এমনই কোনও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ আছে, যে খামার থেকে নিয়মিতভাবে ঘর বা কৃষিযন্ত্র ভাড়া খাটানো হয়, যে খামারের মালিক বা ব্যবস্থাপকরা ব্যবসা করে বা সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দেয়। এর ন্যূনতম একটা বৈশিষ্ট্য মিললেই সে খামারকে কুলাকদের খামার চিহ্নিত করা যাবে এবং সেই খামারের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের কুলাক বলা যাবে। লক্ষ্যণীয় যে এখানে কী পরিমাণ জমি সেই ব্যক্তির মালিকানায় আছে তার কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং কোনও ক্ষুদ্র বা মাঝারি জোতের কৃষককেও ওই কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে কুলাক বলে দেওয়া যেতে পারে।

আর সেখানেই শেষ নয়। মজুরিতে লোক খাটায় না বা উপরোক্ত অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যে যাদের নেই, এমন কৃষকদের কম্যুনিস্ট পার্টির মতবাদিক নির্ধারণ অনুযায়ী কোলখোজ-করণের সমর্থক হওয়ার কথা, কিন্তু তবু তারা বিরোধিতা করছে কেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুলাক-সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হল, বা বলা যায় কুলাকদের কুপ্রভাবের এক বিস্তৃত ধূসর অঞ্চল চিহ্নিত হল। 'পদকুলাচনিকি' বলে একটি নতুন শব্দ তৈরি হল, যার বাংলায় অর্থ হল কুলাকদের দালাল বা কুলাকদের চাকর। এর অধীনে নানা জন আসতে পারে। অল্প জমিতে চাষ করা গরিব কৃষক, বা ছিটেফোঁটা চাষজমি না থাকা গ্রামীণ মেহনতীরা কোলখোজ-করণের বিরোধিতা করলে নিশ্চয়ই তারা তা নিজের থেকে করছেনা, কোনও কুলাক প্রতিবেশী বা কুলাক কর্তার বা এমনকি কোনও কুলাক আত্মীয়ের প্রভাবে করছে— তারা পদকুলাচনিকি এবং কুলাকের শাস্তিই তার প্রাপ্য।

এই সমস্ত কুলাক ও পদকুলাচনিকিকে আলাপ-আলোচনায় বোঝানোর মাধ্যমে বিপ্লবী বলশেভিক পন্থায় বিশ্বাসী করে তোলা যাবেনা, সুতরাং এদের উপর দ্বিধা না করে বলপ্রয়োগ করতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে কেবল ওজিপিইউ নয়, শহরের কারখানা ও কোমসোমলের স্বেচ্ছাসেবকরাও গ্রাম অভিযানে নামল।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি গ্রামকে ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটা অঞ্চলে ওজিপিইউ একটা তিন সদস্যের দল, অর্থাৎ, 'ত্রোইকা' গড়ে দিল। এই ত্রোইকা-র উপরই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হল সেই অঞ্চলে কুলাক চিহ্নিত করার। এই ত্রোইকার তিনজনের মধ্যে একজন ওজিপিইউ-র লোক, অন্য দুজনের মধ্যে সাধারণত একজন হত কম্যুনিস্ট পার্টির কোনও আঞ্চলিক নেতা ও আরেকজন সরকারের ফসল-আদায় বাহিনীর লোক। এই ত্রোইকা সরাসরি ওজিপিইউ-র অধীনে কাজ করত, কোনও সরকারি দপ্তর বা আইন-আদালতের এর কাজে নাক গলানোর অধিকার ছিলনা।

১৯৩০-য়ের প্রথম মাসগুলোয় ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে কুলাক-দমন ও কোলকোঝ-করণের ঝড় উঠল। মস্কো থেকে খারকিভের সরকারের কাছে প্রতি মাসে ন্যূনতম কতগুলো জেলায় কুলাক-দমন ও কোলকোঝ-করণ করতে হবে তার কোটা পাঠানো হত, আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সেই কোটা ছাপিয়ে কাজ করে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করতে চাইত যাতে কুলাকপন্থী প্রতিবিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত না হতে হয়। ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা

ঘোষণা করলেন যে এক বছরের মধ্যেই তাঁরা গোটা ইউক্রেনকে কুলাকমুক্ত করে সব কৃষিজমিকে কোলকোঝের অধীনে নিয়ে চলে আসবেন। গ্রামে গ্রামে হাজির হল ওজিপিইউ-র সশস্ত্র বাহিনী। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২৫,০০০ শ্রমিককে সেই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে পাঠানো হল গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবীকরণে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। (এই শ্রমিকদের নাম হয়ে গিয়েছিল 'পঁচিশ হাজারি' বাহিনী।) আর তার সঙ্গে ছিল কোমসোমলের স্বেচ্ছাসেবক, স্কুলের শিক্ষক, পার্টিকর্মীরাও। কুলাকদের চিহ্নিত করে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে উচ্ছেদ করা শুরু হল। ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চল থেকে ১৫,০০০ 'সংশোধনের অযোগ্য কুলাকদের' গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হল, ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ কুলাককে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসিত করা হল এবং ৫০,০০০ জনকে সুদূর উত্তরে রাশিয়ার শ্বেতসাগর সংলগ্ন আর্খআঞ্জেলস্ক অঞ্চলের রুক্ষ বসতিহীন অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

শুকনো সংখ্যা সব কথা বলেনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণে সেই অভিজ্ঞতার নানা ছবি মৌখিক-ইতিহাস সংগ্রাহকদের মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে। রুশ-অধিকৃত ইউক্রেনের এক গ্রামবাসী দোলোত-য়ের স্মৃতিচারণ তেমনই একটি। মিরোন দোলোত 'একজিকিউশন বাই হাঙ্গার: দি হিডিন হোলাকাস্ট' নামে ১৯৮৫-তে ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত একটি বইয়ে এসব কথা বলেছিলেন।

১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে পঁচিশ হাজারি শ্রমিকদের দল এবং ওজিপিইউ-র বিশেষ বাহিনী দোলোতদের গ্রামে এসে পৌঁছল। প্রথমে গ্রামের মানুষরা তাদের খুব গুরুত্ব দেয়নি। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা গ্রামবাসীদের কাছে অদ্ভুত ও মজার ঠেকেছিল। তাদের ফ্যাটফেটে মুখ আর কেতাদুরস্ত জামাকাপড় গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়না। রাস্তায় পড়ে থাকা বরফ যাতে তাদের ঝাঁ-চকচকে জুতোর পালিশ নষ্ট না করে দেয় সেই ভাবনা নিয়ে তারা এমন সাবধানে পা ফেলে হাঁটত যে তা এক দেখার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাদের নেতা ছিল কমরেড জেইটলিন। তিনি গ্রামের মানুষদের রীতিনীতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং জানা দরকারও মনে করতেন না। কৃষকদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত রুক্ষভাবে কথা বলতেন। একদিন তিনি গ্রামের পথে একটা বাছুর দেখে ঘোড়ার বাচ্চা ভেবেছিলেন। একজন কৃষক তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি অবজ্ঞা ও বিরক্তি ভরে বলেছিলেন, 'ঘোড়ার বাচ্চাই হোক বা বাছুরই হোক কিছু এসে যায় না। বিশ্ব প্রলেতারিয় বিপ্লব তার জন্য আটকে

থাকবে না।' কমরেড জেইটলিন ছিলেন পঁচিশ হাজিরিদের একজন, গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব ত্বরান্বিত করার কাজে স্বেচ্ছানিযুক্ত এক শহুরে শ্রমিক।

কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের সবচেয়ে পরিচিত ও সম্মানিত মানুষদের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হল। তাদের মধ্যে ছিল একজন শিক্ষক, একজন দপ্তরী, একজন গুদাম-মালিক এবং বহু সম্পন্ন কৃষক। তার পরপরই গ্রেফতার হওয়া 'কুলাক'-দের স্ত্রী ও সন্তানদের বাড়ি থেকে উৎখাত করা হল। কৃষক টিমিশ-খুড়োর স্ত্রী উচ্ছেদকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে জোর করে বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করতে চাইলে তিনি উচ্ছেদকারীদের চুল মুঠি ধরে টেনে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। উচ্ছেদকারীরা তাঁকে হিঁচড়ে নিয়ে এসে বাড়ির বাইরে রাখা কাঠের টানাগাড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলে। দুজন তাঁকে সেখানে চেপে ধরে রাখে, বাকিরা তাঁর শিশু সন্তানদের টেনে নিয়ে এসে টানাগাড়ির উপর ছুঁড়ে দেয়, ঘরের কিছু জিনিষপত্রও ছুঁড়ে দেয়। সরকারি উচ্ছেদবাহিনীর লোকজন তাঁদের টানাগাড়িতে ঠেসে ধরে রেখেছে, তিনি ক্রোধে চিৎকার করছেন, অভিশাপ দিচ্ছেন, বাচ্চাগুলো ভয়ে কাঁদছে, এভাবেই সেই টানাগাড়ি ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে শীতের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। টিমিশ-খুড়োর গোটা পরিবার কোথায় মিলিয়ে গেল গ্রামের কেউ জানতে পারল না। কয়েকদিন পর দেখা গেল ওজিপিইউ, পঁচিশ হাজারির দল ও অন্য সরকারি প্রতিনিধিরা টিমিশখুড়োর বাড়িটাকে অধিগ্রহণ করে নিয়ে সেখানে তাদের জেলা সদর দপ্তর বসিয়েছে।

এই সরকারি প্রতিনিধিরা এরপর একটার পর একটা সভা ডেকে সেখানে কৃষকদের জড়ো করে আনতে থাকে। তেমনই এক সভায় দোলোতকেও নিয়ে আসা হয়। সরকারি দলের মুখপাত্র দোলোতদের বলেন নিজেদের সব জমি, পালিত পশু ও কৃষি-উপকরণ কোলখোজে সমর্পণ করে যৌথ-খামারীতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য। সম্মিলিত কৃষক কেউ রাজি হয়ে এগিয়ে আসে না, অসম্মতিজ্ঞাপনে মুখ খুলতেও সাহস পায় না। নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সরকারি মুখপাত্র তখন তিতিবিরক্ত ভাবে বলে ওঠে, 'হলটা কী ? সময় বয়ে যাচ্ছে! যত তাড়াতাড়ি সম্মতিপত্রে সই করবে, তত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে!' গ্রামসভার চেয়ারম্যান উদ্বিগ্নভাবে মুখপাত্রের কানে কানে কী যেন বলে। কৃষকরা কেউ মুখ খোলে না। মুখপাত্রের বিরক্তি তখন ক্রমে রাগে পরিণত হচ্ছে, চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠছে। চেয়ারম্যান তখন ছুটে এসে সামনে যাকে পায় তাকে ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে থাকে আর ক্ষিপ্ত চিৎকার করতে

থাকে: 'জনগণের শত্রু সব! কার মুখ চেয়ে তোমরা অপেক্ষা করছ ? পেটলিউরা এসে তোমাদের বাঁচাবে ?'

গ্রামের যারা সায় দিয়ে সরকারি দলের সহকারী হত, তাদের বলা হয় 'আকটিভ' (বাংলায়, 'সক্রিয়' বা 'অগ্রণী') আর সায় না দিলেই কুলাক। কুলাক বলে চিহ্নিতদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি, মায় গেরস্থালির টুকিটাকি জিনিষ অবধি সব বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হত। জমি যেত কোলখোজে, ঘরবাড়ি যেত সরকারি বাহিনীর দখলে, আর টুকিটাকি জিনিষগুলোকে নীলামে তোলা হত। দোলোতদের গ্রামের সোভিয়েত দপ্তরের সামনে 'কুলাক'-দের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত কারা এমন টুকিটাকি জিনিষ বোঝাই ঠেলাগাড়ি নিয়ে নীলাম ডাকতে দাঁড়াত কোমসোমলের কোনও যুবক বা যুবতী। ঠেলা থেকে এক টুকরো পরিধেয় কাপড় মাথার উপর তুলে হাঁক পাড়ত: 'এর জন্য কে কত দাম দেবে ?'

নিপরোপেট্রোভস্ক এলাকার এক কৃষকের নথিবদ্ধ জবান থেকে জানা যায় যে তাঁদের গ্রামে সরকারি বাহিনীর কথায় সায় না দেওয়া কৃষকদের উপর ধাপে ধাপে চাপ বাড়ানো হত। প্রথমে স্বীকৃতিপত্রে সই না করতে চাওয়া কৃষকের উপর আর্থিক জরিমানা চাপানো হত। জরিমানার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ানো হত। তারপর কয়েকদিন পর, অস্বীকৃতি তখনও বজায় থাকলে, ঘর থেকে পোষা গরু বা চাষের গরুটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত, দুধ-মাখন-ক্ষীর সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর যখন সেই কৃষক পরিবারের আর কিছু দেওয়ার মতো সামর্থ থাকত না, তখন চাষের বীজভাণ্ডার ভেঙে তা লুটে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর সরকারি প্রতিনিধিরা টানাগাড়ি নিয়ে এসে হাজির হত। ঘর থেকে আসবাবপত্র, বাসন, জামাকাপড়, অন্যান্য জিনিষ ধাপে ধাপে নিয়ে যেতে থাকত। সব শেষ হয়ে গেলে, তখনও যদি কৃষকটি কোলখোজে যোগ দিতে অস্বীকার করত, তাহলে তার পরনের জামাকাপড়টাও খুলে নিয়ে গ্রেফতার বা নির্বাসিত করা হত। বেশ কয়েক মাস জুড়ে প্রলম্বিত হত এই প্রক্রিয়া।

অন্যকিছু ক্ষেত্রে আবার এই অবাধ্য কৃষকদের নিঃস্বকরণ করার প্রক্রিয়া হত দ্রুত ও একধাক্কায়। চেরনিহিভ অঞ্চলে সরকারি বাহিনী গভীর শীতের রাতে অবাধ্য কুলাক পরিবারের সবাইকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে রাস্তায় বের করে দিয়েছিল। রাস্তায় তাদের সবার গা থেকে সমস্ত পোষাক খুলে নেওয়া হয়েছিল। তারপর পশুর মতো তাড়াতে তাড়াতে তাদের গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে এনে ঢোকানো হয়েছিল, বলা হয়েছিল এখন থেকে এখানেই তাদের থাকতে হবে। খারকিভের কাছে একটি গ্রামেও নির্ধারিত একটি দিনে একইসঙ্গে বারোটি

কৃষক পরিবারকে 'নিকুলাকীকরণ' করা হয়েছিল। ৪০০ জনের একটি দল লাল পতাকা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল। সেই দলে ওজিপিইউ-র লোকের সঙ্গে ছিল আকটিভ-রা, অর্থাৎ গ্রামের যে কৃষকরা সায় দিয়ে সরকারি বাহিনীর সহকারী হয়েছিল। বারোটি পরিবারের বাড়িঘর তছনছ করে লুট করা হয়েছিল। আকটিভ-দের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল যা খুশি করায়ত্ত করে নিয়ে যাওয়ার। একজন 'কুলাক'-য়ের পরনের কোট খুলে নিয়ে এক আকটিভ নিজের গায়ে চড়িয়েছিল, তারপর তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে নিয়ে নিজের মাথায় চড়িয়ে লুটের মালপত্র বগলদাবা করে হৃষ্ট মনে বিদায় নিয়েছিল।

নিষ্ঠুরতাই হয়ে উঠেছিল অনায়াস স্বাভাবিকতা। ইউক্রেনের একটি গ্রামে সদ্য বাবা ও মা উভয়কে হারানো দুই বোনকে কুলাক নির্মূল করতে আসা দল তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছিল, জমি-জিনিষপত্র সব বাজেয়াপ্ত করে কোলখোজের দখলে নিয়েছিল। বড় বোনটিকে কোলখোজে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ছোট বোনটি আতঙ্কে-উদ্বেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে বড় বোনের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। তাদের ঘরটিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পড়শিরা কোনও প্রতিবাদ করেনি, দুই বোনের কারও প্রতি কোনও সহমর্মিতা দেখায়নি, বরং তাদের পোড়া ঘরের অবশিষ্টাংশ থেকে কাঠ ভেঙে নিয়ে গেছে জ্বালানির জন্য, ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে ব্যবহারযোগ্য জিনিষপত্র নিয়ে গেছে নিজেদের ব্যবহারের জন্য। এই দুই বোনের পরিবার যে অতি সম্পন্ন ছিল তা নয়, তাদের সঙ্গে পড়শিদের কারও কুসম্পর্ক ছিল, তাও নয়।

এভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় যৌথখামার স্থাপিত হয়েছিল। সোভিয়েত নেতারা কি গ্রামের মাটিতে কী ঘটছে তার খবর পাননি ? আমলাতান্ত্রিক পথে পার্টির মধ্য দিয়ে উপর অবধি পৌঁছানোর আগেই কি সব খবর বিকৃত বা হাপিশ হয়ে গিয়েছিল ? তাই জন্যই কি সোভিয়েত নেতারা কৃষকজনগণের অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে যৌথখামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রচার করেছিলেন ? না, তা বলা যায়না। সোভিয়েত নথির লেখ্যাগারে রক্ষিত নথিই অন্য কথা বলে। ওজিপিইউ-র তৎকালীন সর্বময় কর্তা ছিলেন যাগোদা। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে যাগোদা গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে স্তালিনের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রতিবেদনেই তিনি বলেছিলেন যে গ্রামের মধ্য কৃষক, গরিব কৃষক, এমনকি কৃষিমজুররাও কুলাক বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইউক্রেন সম্পর্কে বলেছিলেন যে একরোখা বা হুকুমবরদার না হলেই যে কোনও গরিব কৃষককে কুলাক বলে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সোভিয়েত

নেতারা জানতেন। মস্কোর সর্বোচ্চ নেতৃত্বই প্রতিটি জেলায় নিয়মিত সংখ্যাগত 'কোটা' ঠিক করে পাঠাত কত কুলাক গ্রেফতার করতে হবে, কত কুলাককে নির্বাসনে পাঠাতে হবে, কত কুলাককে সর্বস্বান্ত করে কোলখোজের মজুরে পরিণত করতে হবে। আর কয়েক লাখ মানুষের উপর এই অমানুষিক নির্যাতনকে 'আবেগহীন বিজ্ঞানসম্মত' চেহারা দিতে নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রেণি হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্নকরণ'। যেনবা সমাজ-অগ্রগতির 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণাগারে বিজ্ঞ চিকিৎসক-দল কোনও প্রাণদায়ী শল্যোপচার করছে।

পঁচিশ হাজারি দলের একজন ছিলেন খারকিভ শহরের শ্রমিক লেভ কোপেলেভ। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় এই ১৯২৯-১৯৩-য়ের দিনগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন:

> আমার প্রজন্মের অন্যদের মতো আমিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে লক্ষ্য সঠিক হলে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোনও উপায় অবলম্বন করা যায়। কম্যুনিজমের সার্বিক জয়লাভ ছিল আমাদের মহান লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনও কিছুই অনুচিত নয়— মিথ্যা বলা, চুরি করা, আমাদের কাজের বাধা হয়ে ওঠা বা বাধা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকা শয়ে হাজারে লাখে লাখে মানুষকে ধ্বংস করা, সব উপায়ই গ্রহণযোগ্য। আর এই উপায় গ্রহণে দ্বিধা করা বা মনের মধ্যে কোনও সংশয়কে স্থান দেওয়া গণ্য হত 'বুদ্ধিজীবীসুলভ শুচিবাই' আর 'নির্বোধ উদারনৈতিকতা' হিসেবে, তেমন লোকদের মতিচ্ছন্নতা হিসেবে যারা 'গাছ দেখতে গিয়ে বন দেখতে পায়না'।
>
> (লেভ কোপেলেভ, টু বি প্রিজারভড ফরএভার, ইংরেজি অনুবাদ: আনথনি অসটিন, পৃষ্ঠা-১১।)

নরকের মাটি দিয়ে স্বর্গের বাগান গড়ার এই দৃঢ়সংকল্প অভিযান ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলকে অভিশপ্ত উপত্যকায় পরিণত করেছিল।

কয়েক হাজার কৃষকপরিবারকে ধ্বংস করা ছাড়াও গ্রামের জীবনে আরও কী প্রভাব পড়েছিল দেখা যাক। মিরোন দোলোতের স্মৃতিকথায় আবার ফিরে যাওয়া যাক।

দোলোতের গ্রাম পিলিপিভকা ছিল মধ্য ইউক্রেনে তিয়াসমিন নদীর ধারে। তখনকার বিচারে তা একটা বেশ বড় গ্রাম, ৮০০-র মতো পরিবারের বাস সেখানে। ১৯২০-র দশকে সোভিয়েত শাসনের প্রতিনিধি, বলশেভিক কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য গ্রামে থাকলেও গ্রামের জীবনের উপর সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রের শাসন-নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল না। বহু দিনের গ্রামীণ স্বশাসনের ঐতিহ্য অনুযায়ী

নির্বাচিত গ্রাম মন্ত্রণাসভা (village council) গ্রামের বিষয়আশয় নির্ধারণ করত। সব গ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত হত সেই মন্ত্রণাসভা, সেখানে রাজনৈতিক পার্টি-পরিচয় গুরুত্ব পেত না। নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীভূত নমনীয় ব্যবস্থা চলে আসছিল। বলশেভিকবাদে নবদীক্ষিতদের সঙ্গে ঐতিহ্যপরায়ন গ্রামবাসীদের ভাবনাচিন্তা আচারব্যবহারের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ নষ্ট হয়নি। উদাহরণ হিসেবে যিশুর জন্মদিনে গ্রামের যুবকদের আনন্দগান গেয়ে গ্রাম-পরিভ্রমণের একটি আয়োজনের কথা বলা যেতে পারে। গ্রামের যুবকরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করে ঠিক করেছিল যে এমন মিছিলে ঐতিহ্যগতভাবে যে কাগজ-নির্মিত তারা হাতে নেওয়া হয়, তার একদিকে ঈশ্বরমাতার ধর্মীয় চিহ্ন আঁকা হবে, আর অন্যদিকে পাঁচকোণা সোভিয়েত তারা আঁকা হবে। যুবকরা দুই ধরনের গান রপ্ত করেছিল— ধর্মীয় আনন্দগান ও নতুন সোভিয়েত গান। মিছিল যখন কোনও ধর্মীয় মানুষের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা ধর্মীয় আনন্দগীতি গাইছিল ও ঈশ্বরমাতার চিহ্ন আঁকা দিকটাকে সামনে ধরছিল। আর মিছিল যখন কোনও কম্যুনিস্টের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা নয়া সোভিয়েত গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত তারা আঁকা দিকটাকে সামনে ধরছিল।

গ্রামের মানুষরা স্বাধীনভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। সব কৃষকরাই ছোট জোতে চাষ করত। খুব অল্প কয়েকজনেরই মাঝারি কৃষকের পর্যায়ে গণ্য হওয়ার মতো জমি ছিল। বেশিরভাগ ঘরই ছিল খড়ে ছাওয়া। বহু কৃষকেরই নানা কারিগরী হাতের কাজে দক্ষতা ছিল, চাষের পাশাপাশি সে কাজও তারা করত। আর ছিল পশুপালন এবং ঘরের লাগোয়া জমিতে সবজির বাগান।

হাটে বা গ্রামের মাঝচত্বরে বানদুরা বাজিয়ে ভ্রাম্যমান গায়ক এলে ভিড় জমে যেত। শুনতে শুনতে মনে গেঁথে যাওয়া পুরানো বীরত্বের গাথা আবার নতুন করে সবাই শুনত, তার সঙ্গে ছিল রঙ্গ-ব্যঙ্গে তির্যক নতুন গানও।

বহুদিনের এই ধারা আচমকাই স্তব্ধ হয়ে গেল কুলাক-নিশ্চিহ্নকরণের ধাক্কায়। গ্রাম মন্ত্রণাসভার আর কোনও ভূমিকা থাকল না। সোভিয়েত সরকার প্রেরিত ওজিপিইউ-র সেনা ও প্রশাসকরা সমস্তকিছুর নির্ধারক হয়ে উঠল। শাসন ও দমনের এমন এক কেন্দ্রীভূত অনমনীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠল যাতে কৃষকদের (গুটিকয় আকটিভ ছাড়া) কোনও অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, অথচ কৃষকদের জীবনযাপনের প্রতিটা দিক যারা তাদের হুকুম দিয়ে বেঁধে দিতে চাইল। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। ঐতিহ্যবাহী সমস্ত প্রথা বিদ্রূপের বস্তু

হল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের জয়গান ও রাষ্ট্রনির্দেশিত বিপ্লবের জয়গান ছাড়া সমস্তকিছুই প্রতিবিপ্লবী হিসেবে শাস্তিযোগ্য হয়ে উঠল।

কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় যৌথখামার বা কোলখোজের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত হল। সেখানে মজুরি শ্রমিক হিসেবে যোগ দিতে কৃষকদের বাধ্য করা হল। কী চাষ হবে, কীভাবে চাষ হবে, কখন চাষ হবে তা ঠিক করার কোনও অধিকার আর কৃষকদের থাকল না, রাষ্ট্রনিযুক্ত কোলখোজের কর্তাব্যক্তিরাই সব ঠিক করার হকদার হল। সেই কর্তাব্যক্তিরাই ঠিক করে দিত কোলখোজে খাটা কৃষকরা কত মজুরি পাবে, সে মজুরি টাকায় দেওয়া হবে নাকি ফসলে দেওয়া হবে। সেখানে কৃষকদের চাহিদা বা জীবনধারণে প্রয়োজনীয়তা বিবেচ্য ছিলনা, বিবেচ্য ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ফসলসংগ্রহের চাহিদা। ফলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ফসলের বেঁধে দেওয়া কোটা পূরণ করার পর কিছু পড়ে থাকলে তবে তা কৃষকদের জুটতে পারে। কোলখোজের দেওয়া মজুরি ছিল শহরের সবচেয়ে কম মজুরির শ্রমিকের মজুরির চেয়েও কম। এভাবে কৃষকরা তাদের শ্রমের ফসলের উপরও অধিকার হারাল।

বহু কৃষকের বসতবাড়িও ধ্বংস হয়েছিল, তারা বাধ্য হল কোলখোজের দেওয়া ব্যারাকে থাকতে। সেখানে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপনের পরিসরেও আর কোনও স্বাধীনতা থাকল না।

ইউক্রেনের ঐতিহ্যবাহী ভ্রাম্যমান গায়ক কোবজার ও বানদুরাবাদকদের গানও নিষেধের বেড়াজালে বাঁধা হল কারণ তাদের ব্যাঙ্গগানের শ্লেষ সোভিয়েত-প্রশাসকদের সহ্য হচ্ছিল না। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। ১৯৩২ সালে ক্রেমেনচুকের বাজারে এক অন্ধ কোবজার গাইছিলেন:

শীত সুধায় হিমকণাকে
ওরে কোলখোজের কি জুতো আছে ?
না, জুতো নেই, কেবল চপ্পল,
এ কোলখোজ টিকতে পারবে না।

জনৈক কম্যুনিস্টের কানে এ গান যাওয়ায় তিনি পুলিশে গিয়ে নালিশ করলেন যে সোভিয়েতবিরোধী প্রচার করা হচ্ছে। পুলিশ এল কোবজারকে গ্রেফতার করতে। অন্ধ কোবজার তা টের পেয়ে গাইলেন:

ভালোমানুষেরা দেখ
কী জগৎ এসেছে আজ :
পুলিশেরা আজ হয়েছে

অন্ধ মানুষের অভিভাবক।

একটা দুটো কোবজারকে গ্রেফতার করেই সোভিয়েত রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয়নি। ১৯৩০-য়ের দশকে কোনও একটা সময় (বিভিন্ন ইতিহাসলেখক বিভিন্ন সাল বলেছেন) সোভিয়েত ইউক্রেনের রাজধানী খারকিভে প্রচুর কোবজারকে ইউক্রেনের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে এনে জড়ো করে। তাদের বলা হয়েছিল যে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব বিষয়ক একটি সম্মেলন হবে, সেখানে তাদের গান গাইতে হবে। তাদের গান সংকলন করে নথিবদ্ধ করা হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। সমস্ত কোবজার সম্মিলিত হল, কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সম্মেলন আর হল না। বরং সেই সমস্ত কোবজার নিখোঁজ হয়ে গেলেন। পরে জানা গেছে যে সোভিয়েত গুপ্তপুলিশ (ওজিপিইউ থেকে আবার নাম পালটে যা তখন 'এন কে ভি ডি' নাম নিয়েছে) নির্মমভাবে তাদের সবাইকে পরিকল্পিত হত্যা করে। (সূত্র: নাতালি কোনোনেঙ্কো, ইউক্রেনিয়ান মিনসট্রেলস... অ্যান্ড দি ব্লাইন্ড শ্যাল সিঙ, পৃষ্ঠা-৪।)

গ্রামের সব গির্জাগুলোকেও ধ্বংস করা, লুট করা বা দখলে নিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ শুধু এই নয় যে বলশেভিকরা মতবাদিকভাবে নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। এর কারণ বরং এই যে সোভিয়েত প্রশাসনের নজরদারির বাইরে গ্রামবাসীদের জমায়েত হওয়া ও আলাপ-আলোচনা করার একটা সম্ভাব্য জায়গা ছিল এই গির্জাগুলো। গির্জাগুলোকে ধ্বংস করে নজরদারির বাইরে যাওয়ার সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছিল।

ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমের স্কুলগুলোও বন্ধ হয়েছিল। তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতাপাঠ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কারও কাছে তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতা পেলে তাকে সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী হিসেবে গ্রেফতার করা হত।

সব মিলিয়ে, এই ১৯২৯-১৯৩০ সালে ইউক্রেনিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রথম এমন এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সর্বাত্মক ক্ষমতা নিয়ে চেপে বসল যা মানুষের জীবনযাপনের নিভৃততম কোণ অবধি তার নজরদারি ও শাসন বিস্তৃত করতে চায়। গ্রামীণ মানুষদের স্বাধীনতা, ঐতিহ্যধারা চরম ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মুখে পড়ল।

১৪

নিভন্ত চুল্লির আগুন

এ এক ছেদের পর্ব। গ্রামীণ ইউক্রেনে বহমান ধারায় ছেদ। সমাজসংগঠন, জীবনযাপন, নৈতিকতা ও নান্দনিকতার ঐতিহ্যধারায় ছেদ। উপর থেকে চেপে বসা এক নজরদার সন্দেহপ্রবণ রাষ্ট্র সর্বাত্মক ক্ষমতা নিয়ে তার আসন পাতল এই ছেদের মধ্য দিয়ে। তার শাসন-দমন প্রক্রিয়ার বেঁধে দেওয়া খাতে জীবনের সব প্রকাশকে বাঁধতে চাইল।

বিনা প্রতিরোধে তা হয়নি। গোটা ইউক্রেন জুড়ে ইউক্রেনিয়দের প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অহিংস অসহযোগ থেকে সশস্ত্র হিংসা অবধি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। গ্রামে বেশি, তবে শহরেও। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সংগঠিত হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের সংগঠিত হিংসাশক্তির সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছে। ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকায় আরও রক্ত মিশেছে।

জমি, বাড়ি, সবজিখেত, হালের গরু-ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, কৃষি-উপরকণ সব রাষ্ট্র পরাচালিত কোলখোজের কাছে সমর্পণ না করা ছিল কৃষকদের অহিংস অসহযোগের প্রথম রূপ। সশস্ত্র দখলদার বাহিনীর জোর খাটিয়েও রাষ্ট্র সে প্রতিরোধ নির্মূল করতে পারেনি। কৃষকরা যখন বুঝতে পারল যে রাষ্ট্রীয় দখলদার বাহিনীর হাত এড়িয়ে গরু, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু নিজেদের কাছে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তখন তারা প্রতিরোধের এক বিচিত্র উপায় নিল। তারা কোলখোজের দখলে চলে যাওয়া আটকাতে তাদের গরু, শুয়োর, ভেড়া, এমনকি ঘোড়াগুলোকেও মেরে ফেলে তাদের মাংস কেটে নিজেরা খেল, নুন দিয়ে জারিয়ে মজুদ করে রাখল, সম্ভব হলে বিক্রি করল, এমনকি বিলি করে দিল। সোভিয়েত সরকারের সংরক্ষিত পরিসংখ্যানেও এর প্রমাণ মেলে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় গরু ও ঘোড়ার সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। একই সময়কালে শুয়োরের সংখ্যা ২

কোটি ৬০ লাখ থেকে কমে ১ কোটি ২০ লাখে পৌঁচেছিল, ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যা ১৪ কোটি ৬০ লাখ থেকে কমে ৫ কোটিতে পৌঁচেছিল। এই হিসাব গোটা সোভিয়েত রাশিয়ার, তার মধ্যে কেবল ইউক্রেনের হিসেব আলাদা করলে এই সংখ্যা কমার হার আরও অনেক বেশি হবে। ওজিপিইউ-র নথি থেকে জানা যায় যে ইউক্রেনের একটি গ্রামের কৃষক তার সব ঘোড়া সমেত গোটা আস্তাবলটাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল যাতে কোলখোজের দখলদাররা তার দখল নিতে না পারে। একজন কৃষকের মন্তব্য সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সে বলেছিল: 'সোভিয়েত কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে সব ধ্বংস করে ফেলা ভালো'।

যারা তাদের কাজের সাথী বা পোষা পশুদের এভাবে মেরে ফেলতে পারতনা, তারা মরীয়া হয়ে তাদের দখল হয়ে যাওয়া আটকানোর চেষ্টা করত। ওজিপিইউ-র সংরক্ষিত প্রতিবেদন থেকে তার নানা উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, ওজিপিইউ-র নথিবদ্ধ করা একটি ঘটনায় দেখা যায় যে কমসোমলের এক সদস্য গ্রাম থেকে একটা ঘোড়াকে ধরে কোলখোজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কৃষকদের একটা দল জড়ো হয়ে গিয়ে সেই সদস্যটিকে মারধোর করতে শুরু করে। ওজিপিইউ-র সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে সেই সদস্যটিকে রক্ষা করে, কিছু কৃষককে গ্রেফতার করে। নথিবদ্ধ আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় যে একটি গ্রামের কুড়িজন মহিলা দল বেঁধে লাঠি, মুগুর হাতে সেই গ্রামের কোলখোজের উপর চড়াও হয় তাদের কাছ থেকে দখল করে নিয়ে আসা ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কৃষকদের অহিংস অসহযোগের আরেকটি রূপ ছিল কোলখোজের হয়ে কাজ করতে বাধ্য হলে সে কাজ অত্যন্ত শ্লথ ও দায়সারাভাবে করা। পেট্রো হ্রিহোরেঙ্কো তাঁর স্মৃতিকথায় এমন এক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। ১৯৩০ সালে গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখতে গিয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন:

> স্তেপভূমির এক বিশাল বড় গ্রাম আরখানহেলকা। সেই গ্রামে দুই হাজারেরও বেশি খামারবাড়ি ছিল। কিন্তু এখন, ফসলকাটার এই তুঙ্গ মরসুমেও চারিদিকে যেন মত্যু থমথম করছে। নয়া কোলখোজে একটা গমঝাড়াই যন্ত্রে প্রতিদিন একটা সিফ্‌ট-য়ে আটজন লোক কাজ করছে। বাকি কাজের লোকেরা— পুরুষ, মহিলা ও কমবয়সীরাও— এদিক ওদিক বসে আছে বা ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়েছে। আমি কথোপকথন শুরু করতে চাইলে লোকেরা চরম অনিচ্ছায় অতি ধীরে একটা দুটো শব্দে কথা সারতে চাইছিল। গমের দানা বোঁটা থেকে ঝরে

পড়ে নষ্ট হচ্ছে বলে তাদের সম্বিত ফেরানোর চেষ্টা করলে তারা জবাব দিল, 'নষ্ট তো হবেই, অবশ্যই নষ্ট হবে'। বুঝতে পারলাম কী তীব্র প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে জমে উঠেছে যে তারা নির্বিকারে মাঠে শস্য ফেলে রেখে নষ্ট করছে।

(পেট্রো হ্রিহোরেঙ্কো, মেময়ারস, পৃষ্ঠা-৩৯।)

নিজেদের শ্রমের ফসলে নিজেদের কোনও অধিকার থাকবে না, সব গিয়ে জমা হবে রাষ্ট্রের গুদামে রাষ্ট্রকর্তাদের মর্জিমতো ব্যবহারের জন্য, এ ব্যবস্থা কৃষকরা মেনে নিতে পারেনি। সদ্য আগের বছরের দুর্ভিক্ষের জ্বালা তখনও টাটকা। তাই কিছু কৃষক যেমন অসহযোগে ফসল নষ্ট করার পথে গেছে, তেমন আবার কিছু কৃষক সটান বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রের গুদাম ভেঙে ফসল নিজেদের দখলে আনার চেষ্টাও করেছে। এমন বিদ্রোহের উদাহরণ বেরেলোভিচ নামের এক মহিলার জবানিতে সংরক্ষিত আছে সোভিয়েত নথির লেখ্যাগারে। ১৯৩০ সালে বেরেলোভিচ তখন বাচ্চা মেয়ে। একদিন দুপুরে হঠাৎ বাবা এসে তাকে বাড়ির মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে উত্তেজিত ভাবে চলে গেল। বেরেলোভিচ ঘরের জানালার পাশে গিয়ে বসল। জানালা দিয়ে সে দেখল কয়েক গণ্ডা মানুষ, অনেকেই মহিলা, তাদের উঠোনের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে রেলগুমটির দিকে চলে গেল। খানিক্ষণ পরে তাদের কয়েকজন ফিরে এল শস্যের বস্তা টানতে টানতে। পরে বাবার কাছ থেকে সে পুরো ঘটনা শুনেছিল। আশপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামের বেশকিছু কৃষক দল বেঁধে সেদিন তাদের শহরের রেলগুমটির কাছে অবস্থিত সরকারি গুদাম আক্রমণ করেছিল। গুদামের দরজা ভেঙে তারা ঢুকে পড়েছিল তাদেরই ফলানো শস্য বস্তাবোঝাই করে রাখা ঘরগুলোয়। পাহারায় থাকা আঞ্চলিক প্রহরীরা তাদের আটকাতে পারেনি। খবর পেয়ে কাছের বড় শহর পোলতাভা থেকে সশস্ত্র পুলিশের বড় বাহিনী আসে। কৃষকরা তখন শস্যের বস্তা টেনে বের করে নিয়ে এসেছে। বস্তা টানতে টানতে গ্রামে ফেরার পথ ধরেছে। ঘোড়সওয়ার পুলিশ তাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঘোড়ার পায়ের নিচে তারা পিষ্ট হল। পুরুষ বা মহিলা কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বেশিরভাগ কৃষক ফেটে যাওয়া শস্যের বস্তার পাশে ক্ষতবিক্ষত দেহে রাস্তায় পড়েছিল। শস্য আবার বস্তায় পুরে পুলিশেরা গুদামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কৃষকদের দেহগুলো রাস্তাতেই পরে ছিল। অল্প কয়েকজনই পুলিশের হাত এড়িয়ে শস্যের বস্তা নিয়ে ফিরতে পেরেছিল।

বেরলোভিচের বর্ণিত ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা। সবক্ষেত্রে কৃষকরা শুধু মারই খায়নি, পাল্টা মার দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। ওজিপিইউ-র

সংরক্ষিত নথির মধ্যে ১৯৩০ সালে ইউক্রেনের ১৬-টি জেলা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে কোলখোজের সংগ্রহ করা ফসল 'লুট' করতে আসা গ্রামবাসীদের বাঁধানো 'দাঙ্গা' দমন করতে গিয়ে ৩৭ জন পুলিশ আহত হয়েছে, ৩১৪ জন প্রহৃত হয়েছে, আর উল্টোদিকে ২৬ জন 'প্রতিবিপ্লবী দাঙ্গাকারীকে' পুলিশ হত্যা করেছে।

ওজিপিইউ-র গোয়েন্দা-প্রতিবেদনে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের কথাবার্তাও নথিবদ্ধ হয়েছিল। তারও কিছু উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। মধ্য ইউক্রেনের গ্রামের এক কৃষক বলেছিলেন: 'ওরা যখন 'বিপ্লব'-য়ের কথা বলেছিল, তখন তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পেরেছি যে ওদের 'বিপ্লব'-য়ের মানে হল কৃষকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ন্যাংটো করে খিদের জ্বালায় পুড়িয়ে মারা।' আরেকজন ইউক্রেনিয় কৃষক বলেছিলেন: 'ওরা আমাদের ঠেলে নিয়ে এসে কোলখোজে পুরেছে যাতে আমাদের চিরন্তন দাসে পরিণত করা যায়।'

স্বতঃস্ফূর্ত কৃষকবিদ্রোহকে সংগঠিত চেহারা দেওয়ার উদ্যোগও শুরু হয়েছিল ভিতরে ভিতরে। ১৯৩০ সালে ইউক্রেনে কৃষকদের মধ্যে বেনামে প্রচারিত একটি প্রচারপত্র ডাক দিয়েছিল:

> কমরেডগণ, নিজের সম্পত্তি ও জনগণের সাধারণ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তৈরি হোন! আর অপেক্ষা নয়! নদী ও সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে কুরগানের উচ্চভূমিতে জল বইবে, রক্তের ধারা বইবে, মাটি উঠে আসবে ঝড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে।... একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে একে অপরকে রক্ষা করুন। রাষ্ট্রীয় যৌথ খামারে যোগ দেবেন না, ওদের ছড়ানো গুজবে কান দেবেন না।... কমরেডগণ, সেই অতীতকে স্মরণ করুন যখন আমরা মুক্তভাবে জীবনযাপন করতাম, ধনী ও গরিব সবাই ভালোভাবে বাঁচতাম, এখন আমাদের সবার জীবনই অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।
>
> (লিন ভায়োলা রচিত 'পিজান্ট রিবেলস আন্ডার স্তালিন: কালেকটিভাইজেশন অ্যান্ড দি কালচার অফ পিজান্ট রেজিসটেন্স' বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

লক্ষ্যণীয় যে এখানে বিপর্যয়ের যে প্রতীকী ছবি আঁকা হয়েছে— নদী-সাগর থেকে উচ্চভূমিতে জলের উঠে যাওয়া, রক্তবন্যা বওয়া, মাটি ঝুরো হয়ে ঝড়ে উড়ে যাওয়া— তার মধ্যে ধর্মীয়বিশ্বাসে থাকা সেই অন্তিমলগ্নের মহা অনর্থপাতের কল্পনার ছায়া এসে পড়ে। ইউক্রেনের গ্রামীণ পরম্পরাগত জীবনকে আদর্শ করে তা পুনর্গঠনের মধ্যেই বাঁচার পথ খোঁজা হয়। বলশেভিক

মতবাদের ধর্মহীন বৈজ্ঞানিক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার ডাকের ঠিক বিপরীত মেরুতে এর অবস্থান।

ইউক্রেনের বিভিন্ন গ্রামে কৃষকরা সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য 'পার্টিজান বাহিনী' গড়ে তুলেছিল। ১৯১৮-১৯১৯-য়ের গৃহযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্র বিভিন্ন কৃষকদের ঘরে তোলা ছিল, তা আবার তাদের হাতে উঠে এসেছিল। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই চালানোর জন্য তারা গ্রাম ছেড়ে নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখান থেকে পুলিশ, ওজিপিইউ ও সরকারি বাহিনীর উপর আক্রমণ হানত। পঁচিশ হাজারি, কোমসোমল-সদস্য ও আকটিভদের উপরও আক্রমণ হানত। কিয়েভ অঞ্চলের এক গ্রামের কোলখোজের ট্রাকটর চালক তরুণী পাশা আঞ্জেলিনা-র জবানে এই হিংসার প্রত্যক্ষ ছবি ধরা আছে:

> ১৯২৯-য়ের গ্রীষ্মের একদিন আমি, আমার ভাই কোস্তিয়া ও বোন লেলিয়া কোমসোমলের সভায় যোগ দিতে পাশের গ্রাম নোভোবেশেভে-তে যাচ্ছিলাম। তখন হঠাৎ কাটা-নল শটগান থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে একজন।... পড়িমরি করে প্রাণ বাঁচাতে কীভাবে যে আমরা ছুট দিয়েছিলাম তা কখনও ভুলব না। পা থেকে জুতো ছিটকে গিয়েছিল, খোঁচা খোঁচা ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে আমরা ছুটছিলাম, বুক ধড়ফড় করছিল বেলাগাম ভয়ে।
>
> (পাশা আঞ্জেলিনা, 'দি মোস্ট ইম্পর্টান্ট থিঙ': ফিৎজপ্যাট্রিক ও স্লেজকিন, ইন দি শ্যাডো অফ রেভলুশন, পৃষ্ঠা-৩১০)

কৃষকদের এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় সরকারপক্ষের কর্তাব্যক্তি, সেনা ও কম্যুনিস্ট কর্মীদের মনোভাবও কৃষকদের সম্পর্কে আরও বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠছিল। কোলখোজের গুদাম, দপ্তর, এমনকি চাষের মাঠেও সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার পাহারাদারদের বলা হয়েছিল যে বেয়াদপি দেখলেই তারা যেন প্রাণ নেওয়ার জন্য গুলি ছোঁড়ে।

সোভিয়েত নেতাদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়ছিল। প্রকাশ্যে তাঁরা কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কৃষি-সমবায়িকরণের সাফল্য নিয়ে প্রচার করছিলেন, কিন্তু নিজেদের ভিতরে আভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছিল। ওজিপিইউ-র ইউক্রেনিয় প্রধান বেলিয়াতস্কি ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসেই তাঁর প্রতিবেদনে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের 'প্রতিবিপ্লবী প্রতিরোধ' সংগঠিত ও সশস্ত্র হয়ে ওঠার সতর্কতা জারি করেছিলেন। কেবলমাত্র ২০শে

জানুয়ারি থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ওজিপিইউ প্রতিবিপ্লবী প্রতিরোধে যুক্ত থাকার জন্য ইউক্রেনে ১১,৮৬৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল।

এই সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বময় নেতা স্তালিন এই কৃষি-সমবায়িকরণ নিয়ে তাঁর পর্যালোচনা হাজির করলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'-র ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হল। স্তালিনের লেখার নাম 'সাফল্যে মাথা ঘুরে যাওয়া'। সেই লেখার প্রথমে গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় খামার গঠনের আন্দোলনের অচিন্তনীয় 'সাফল্য' উদাত্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে অভাবনীয় দ্রুততায় এই আন্দোলন সোভিয়েত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যকে এক বছরের মধ্যেই ছাপিয়ে গেছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামে বিপ্লবী পরিবর্তন এনে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এগোতে শুরু করেছে, এমনকি কম্যুনিস্টদের শত্রুরাও এই অগ্রগতিকে অস্বীকার করতে পারবেনা। কিন্তু এই অভাবনীয় সাফল্যে কারও কারও মাথা ঘুরে গিয়ে তাদের ভুল করার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্তালিনের ভাষায়:

> এমন বিপুল সাফল্য কখনও কখনও ফাঁপা অহংকার ও দেমাকের জন্ম দেয়।... প্রায়শই এমন সাফল্য মানুষকে বুঁদ করে ফেলে, তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, সমস্ত মাত্রাজ্ঞান ও বাস্তববোধ তাদের লোপ পায়।... তারা তখন সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের সমস্ত সমস্যাকে এক তুড়িতে সমাধান করার হঠকারী চেষ্টা করে।... এই মনোভাব আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের পক্ষে অতি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক। সুতরাং তার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালিয়ে পার্টি থেকে তাকে উৎখাত করাই হল পার্টির কর্তব্য।
>
> (স্তালিন কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৭-২০৫)

অর্থাৎ, পার্টির সর্বময় কর্তার চোখে পার্টিকর্মীদের ভুল ধরা পড়েছে। অভাবনীয় সাফল্যে মাথা ঘুরে যাওয়া পার্টিকর্মীরা অহংকার ও দেমাকে অন্ধ হয়ে হঠকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেই হঠকারী পদক্ষেপগুলো কী ? তা সর্বময় কর্তা কোথাও খোলসা করে বলেননি। হ্যাঁ,তিনি বলেছেন যে কোলখোজ গঠন কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হয়েছে এবং তাই-ই হতে হবে। তাহলে কৃষকদের থেকে জোর করে জমি-গরু-ঘোড়া-শস্য সব কেড়ে নিয়ে কোলখোজের মজুর হতে বাধ্য করা কি হঠকারী বাড়াবাড়ি ? কিন্তু তা কী করে হয়, কারণ ঠিক এই পদক্ষেপগুলোর কল্যাণেই তো সেই অভাবনীয় 'সাফল্য' এসেছে যাকে সর্বময় নেতা সমাজতন্ত্র অভিমুখে মোড় ঘোরা বলে প্রশস্তি গেয়েছেন! এই অভাবনীয় 'সাফল্য' যদি ধরে রাখতে হয়, তাহলে তো

স্বতঃস্ফূর্ততার নিকুচি করে যে জোর খাটানোর পথ নেওয়া হয়েছে, তাই-ই ধরে রাখতে হবে! ফলে কোনওকিছুই পরিষ্কার হল না, যে যার মতো ব্যাখ্যা করে নেওয়ার পথ খোলা থাকল। কেবল বোঝা গেল যে সর্বময় কর্তা কুলাক-নির্মূলিকরণ ও রাষ্ট্রীয় যৌথ খামার গঠনের যে নীতি প্রবর্তন করেছিলেন, সে নীতি অচিন্তনীয়ভাবে সফল হয়েছে। কেবল তাঁর মতো অত সবল মনের অধিকারী না হওয়ায় পার্টি-ক্যাডারদের কারও কারও মাথা ঘুরে গেছে, তাদের হঠকারী পদক্ষেপ সংকট ডেকে আনছে, তাই তাদের বেছে এখন পার্টি থেকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। ফলে দোষ চাপল ক্যাডারদের ঘাড়ে এবং সর্বময় নেতার চিন্তাধারা থেকে কে বিচ্যুত হয়েছে ও কে বিচ্যুত হয়নি সেই লড়ালড়ির আরেক প্রস্থের সূচনা হল।

অবশ্য ধূমায়মান কৃষক-প্রতিরোধকে স্তিমিত নির্বাপিত করার দিকে যে সর্বময় নেতা ও অন্যান্য পার্শ্বনেতাদের চোখ ছিল তা বোঝা যায় এই লেখা প্রকাশের ঠিক পরেই কৃষকদের জন্য কিছু ছাড় ঘোষণা হওয়ার মধ্য দিয়ে। পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যে কৃষকদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হবে না, পরিবার পিছু একটি গরু, কিছু শুয়োর-ছাগল-ভেড়া আর এক চিলতে সবজি বাগান রাখতে দেওয়া হবে। কিন্তু জল ছিটিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে ঘি ছেটানো হয়ে গেল। কৃষক-প্রতিরোধের আগুন আরও তড়বড়িয়ে জ্বলে উঠল।

সেই মিরোন দোলোতের গ্রামের কথাই ধরা যাক। গ্রামবাসীদের এক সভা ডেকে অঞ্চলে নিযুক্ত এক পার্টিকর্মী স্তালিনের 'সাফল্যে মাথা ঘুরে যাওয়া' লেখা পাঠ করে শোনালেন। পাঠের পর তিনি সাধারণের ভাষায় ব্যাখ্যা করে বললেন যে পার্টিসদস্যদের হিসেবে কিছু ভুল হয়েছিল, ফলে কিছু ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে তখন অখণ্ড নীরবতা থমথম করছে। পার্টিকর্মী তখন তাঁর ব্যাখ্যা আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য বললেন যে এতে পার্টির কোনও দোষ নেই, পার্টির মধ্যে থাকা ইহুদিরাই এর জন্য দোষী। অর্থাৎ পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নির্দোষ দাবি করে তিনি ইহুদিদের ঘাড়ে সব দোষ ঠেলে দিলেন। এরপরই এক বিস্ফোরণ ঘটল। একজন কৃষক চিৎকার করে উঠলেন, 'অনেক হয়েছে, এবার তোমরা চুলোয় যাও!' আরেকজন চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের বোকা বানানো হয়েছে! সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে চল আমরা ওই পূতিগন্ধময় কোলখোজ থেকে আমাদের গরু আর ঘোড়াগুলোকে উদ্ধার করি!' হুলুস্থূল পড়ে গেল। একে অন্যকে ঠেলাঠেলি করে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারের মধ্য দিয়েই তালগোল পাকানো

কৃষকদের দঙ্গল ছুটল কোলখোজের আস্তাবল আর গোয়ালঘরের দিকে নিজেদের গরু-ঘোড়াগুলোকে উদ্ধার করার জন্য। অন্ধকারের মধ্যেই কোলখোজের পাহারাদারদের বন্দুক গর্জে উঠল। কুড়ি জনেরও বেশি কৃষকের নিথর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। চাপ চাপ অন্ধকারে কৃষ্ণমৃত্তিকা শুষে নিল চাপ চাপ রক্ত।

দোলোতদের গ্রামের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল জুড়েই মার্চ মাসে কৃষকদের ক্ষোভের এমন স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ল। আর ইউক্রেনে কৃষক প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণের মাঝেই ক্রমাগত সংগঠিত রূপও ধারণ করতে থাকল। কৃষকরা দল বেঁধে পরিণতির তোয়াক্কা না করে সরকারি শস্যগুদামগুলোর উপর হামলা চালাতে লাগল। কোথাও পাহারাদারদের গুলিতে মৃতদেহের স্তূপ জমল। আবার কোথাও পাহারাদারদের খুন করে কৃষকরা গুদামের তালা ভেঙে শস্যের বস্তা বের করে এনে গ্রামের সবার মধ্যে বিলিয়ে দিল। বহু গ্রামে কোলখোজের দখল করা সম্পত্তি ও সরকারি সম্পত্তিতে কৃষকদের দল আগুন লাগাল। কোথাও কোথাও পঁচিশ হাজারি, কোমসোমল-সদস্য ও আকটিভরাও কৃষকদের হাতে খুন হল, আবার কোথাও তারা কৃষকদের খুন করল।

এই সময়েই ইউক্রেনের গ্রামে গ্রামে দেখা গেল সম্পূর্ণ মহিলাদের সংগঠিত বিদ্রোহ। তা পরিচিত হয়েছিল 'বাবস্কি বান্টি' নামে। ইউক্রেনিয় ভাষায় 'বাবা' শব্দের অর্থ মহিলা। তবে সাধারণভাবে যে কোনও মহিলাকে 'বাবা' বলা হত না, গ্রাম্য অপরিশীলিত মহিলাদের 'বাবা' বলা হত। বাংলায় তাই আমরা 'বাবা'-র সমার্থক হিসেবে 'মাগী' শব্দটাকে ধরতে পারি। 'বাবস্কি বান্টি'-র মানে তাহলে বহে 'মাগীদের দাঙ্গা'। গ্রামীণ মহিলারা দঙ্গল বেঁধে এসে কম্যুনিস্ট পার্টিকর্মী, সোভিয়েত আধিকারিক বা সফররত প্রশাসনিক কেষ্টবিষ্টুদের ঘিরে ধরত, চিৎকার-চেঁচামেচি করে তাদের অধিগৃহীত হয়ে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি ফেরত চাইত। তারা চিৎকার করে দাবি আউড়াত, গালাগাল করত, ব্যাঙ্গাত্মক রসাল গানও গাইত। তবে কেবল এমন দাবি পেশ নয়, আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে অন্যভাবেও তারা সক্রিয় হত। মিৎসিক গ্রামের লিওনিদা ফেদোরিভনা খাচুক সংগৃহীত তাঁর মৌখিক স্মৃতিচারণে এমন এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। তাঁর তখন অল্প বয়স। খিদে তখন তাঁর এবং তাঁদের পড়শিদের পরিবারে পাথরের মতো চেপে বসেছে। একদিন তাঁর মা এবং পাড়ার এমনই কিছু ক্ষুধার্ত মহিলা দল বেঁধে গ্রামের কোলখোজের শস্যগুদামের উপর হামলা

চালাল। লিওনিদার চোখের সামনেই তার মা ও অন্যান্যরা গুদামের তালা ভেঙে শস্যের ভাণ্ডগুলো বের করে আনল। কোলখোজের আধিকারিকরা এই 'মাগী'দের রণমূর্তি দেখে নিজেরা সামনে আসতে ভরসা পায়নি। তারা উচ্চতর পার্টি আধিকারিকদের বিপদবার্তা পাঠিয়েছিল। ওজিপিইউ-র সেনা কোমসোমলের বাহিনী নিয়ে সেই উচ্চতর আধিকারিকরা হাজির হলেন। মহিলাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হল। দুই সপ্তাহ তাদের জেলে কাটাতে হয়েছিল। ওজিপিইউ-র সংরক্ষিত নথি থেকেও এমন নানা ঘটনা পাওয়া যায়। তার একটা মারিউপোল অঞ্চলের এক গ্রামের ঘটনা। ৩০০ জন মহিলার একটা দঙ্গল গ্রামে সোভিয়েত প্রশাসকদের দপ্তরে হানা দেয়। গ্রামের গির্জাটিকে কিছুদিন আগে প্রশাসনিক ভবনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মহিলারা সেই গির্জার চাবি দাবি করতে থাকে। তারপর মহিলারা চিৎকার করে দোষারোপ করতে থাকে যে গ্রামের সোভিয়েতের কর্তা নাউমেঙ্কো গির্জা-কাউন্সিলের এক সদস্যের ঘরের দরজা গুণ্ডাদের দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। নাউমেঙ্কো তা অস্বীকার করতে থাকে। মহিলারা তখন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে একটা কাঠের ঠেলায় বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সেই গির্জা-কাউন্সিল সদস্যের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে আরও লোকজন জড়ো হয়ে যায়। সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রমাণিত হয় যে নাউমেঙ্কো সত্যিই দরজা ভাঙার সময় হাজির ছিলেন ও গুণ্ডাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সমবেত জনতার বিচারে নাউমেঙ্কোকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে বাধ্য করা হয় লিখিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে যে ওই গির্জা-কাউন্সিল সদস্যের কাজে ভবিষ্যতে আর কোনও বাধা দেওয়া হবে না। তারপর মহিলারা ফিলোমিনোভ নামে আরেক সোভিয়েত আঞ্চলিক কর্তাকে একইভাবে জনতার বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে। নাউমেঙ্কো ও ফিলোমিনোভকে ঘিরে ধরে তারা তাদের অপদস্থ করতে থাকে। সবাই মিলে ওই দুজন সোভিয়েত কর্তার চোখেমুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়, কম্যুনিস্ট আধিকারিকরা সবাই দস্যুর জাত বলে গালিগালাজ করতে থাকে। ওজিপিইউ-র সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে তবে ওই দুজন সোভিয়েত কর্তাকে 'মাগী'-দের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে। এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে মহিলারা লাঠিসোঁটা হাতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি গালিগালাজ চালিয়ে গেছে, তাদের অধিগৃহীত হয়ে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দাবি করে গেছে। ১৯৩০-য়ের মার্চ মাসের শেষে ওজিপিইউ হিসেব করেছিল যে ওই মাসে ইউক্রেনের বিভিন্ন গ্রামে এমন ২,০০০টি 'মাগীদের দাঙ্গা' ঘটেছিল।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে তুলচিন জেলার একগুচ্ছ গ্রামে পরপর কৃষকবিক্ষোভ ঘটতে থাকে। ওজিপিইউ-র সংরক্ষিত নথিতে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সেই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা সব গ্রামেই সবচেয়ে বেশি যে স্লোগান তুলত তা হল: 'কৃষকদের লুট করে এমন নেতা আমরা চাই না', 'দেশকে বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কম্যুনিস্টরা নিপাত যাক!' তুলচিনের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহী কৃষকরা সোভিয়েত প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের খুন করেছিল অথবা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বহু গ্রামে সোভিয়েত পরিচালিত রুশ ভাষামাধ্যমের স্কুলগুলোর শিক্ষকদেরও গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল কৃষকরা। সোভিয়েত রাষ্ট্রাধীন কোলখোজগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল। গ্রামের সব কৃষকদের সভা বসেছিল। সেই সভায় ঐতিহ্যগত প্রথা অনুযায়ী গ্রামবুড়ো বা 'স্তারোস্তা' নির্বাচন করে গ্রামসভা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলার কথা ঠিক হয়েছিল, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করা হবে না বলে ঠিক করা হয়েছিল, কোলখোজের দখল করা সম্পত্তি কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং কৃষকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ফসল বেচাকেনা করবে বলে ঠিক হয়েছিল। ওজিপিইউ-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমন গ্রামসভায় সেন্ট্রাল রাদা-র আমলে নির্ধারিত ইউক্রেনের জাতীয় সঙ্গীত 'ইউক্রেন এখনও বেঁচে আছে' গাওয়া হত। কৃষকদের এই 'জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লব' দমন করতে ওজিপিইউ কোমর বেঁধে নামল। বেলিয়াতস্কি তাঁর ওজিপিইউ-বাহিনীকে বললেন যে স্তালিন স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন 'ভাষণ বন্ধ করে কাজ করে দেখাতে'। গোটা তুলচিন জেলাকে ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটা অঞ্চলের জন্য বিশেষ সেনা ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে নিযুক্ত করল ওজিপিইউ। নির্মম রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তারা কৃষক বিদ্রোহ দমন করল। কোলখোজ ও সোভিয়েত প্রশাসন আবার ফিরে এল।

কৃষক বিদ্রোহের আরেকটা কেন্দ্র ছিল পাভলোহ্রাদ। নিপরোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের এই জেলার কৃষকরা ১৯১৯ সালে বড় সংখ্যায় মাখনোভিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারও আগে পাভলোহ্রাদ শহরটির পত্তন হয়েছিল কসাক স্বশাসনের একটি কেন্দ্র হিসেবে। সুতরাং কোলখোজ গঠনে ও পরিচালনায় কড়া বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা আগে থেকেই আন্দাজ করে ওজিপিইউ-র তত্ত্বাবধানে পুলিশ ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ৭৯ জন কৃষককে গ্রেফতার করে এবংতার মধ্যে ২১ জনকে 'প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্রকারী' আখ্যা দিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এই আগাম সন্ত্রাস দিয়েও কৃষক বিদ্রোহ আটকানো

যায়নি। মার্চ মাসে ওই গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে একজন, কিরিলো শোপিন, জেল থেকে পালান এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক ছড়াতে থাকেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আরো বহুজন যোগ দেন। শোপিন ১৯১৯ সালে স্কোরোপাদস্কির বাহিনীর সেনা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে কেউ আগে পেটলিউরার বাহিনীতে সেনা ছিল, কেউ মাখনোর বাহিনীতে সেনা ছিল। এপ্রিলের গোড়ায় তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বোহদানিভকায় মিলিত হলেন এবং সোভিয়েত শাসন বিরোধী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করলেন। এই পরিকল্পনাসভায় হাজির কৃষকদের মধ্যে বহুজনই কোলখোজ গঠনের প্রক্রিয়ায় নিজেদের সর্বস্ব হারিয়েছেন এবং তা ফিরে পাওয়ার আশা নিয়েই সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিসম্পত্তি পুনরুদ্ধার ছাড়াও সে সমাবেশে বেশকিছু সাধারণ রাজনৈতিক স্লোগানও গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন: 'সোভিয়েত ক্ষমতা নিপাত যাক!', 'অন্য এক ধরনের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা যাক'। এই প্রথম গোপন সমাবেশের পর প্রতিনিধিরা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে ছোট ছোট বিদ্রোহীদল গড়ে তুলতে থাকে। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ঠা এপ্রিল বোহদানিভকার নিকটবর্তী ওসাদচি নামের এক ছোট গ্রামে দলবল সমেত এসে জড়ো হতে থাকে। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে সেখানে নেতারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে এবং তারা অভ্যুত্থানে যোগ দেবে। তাদের নেতারা ইতিমধ্যেই পাভলোহ্রদের সোভিয়েত বাহিনীর সেনাদের কাছে গোপনে আহ্বান পৌঁছে দিয়েছিল সেনাকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোভিয়েত-বিরোধী অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়ার জন্য। নেতাদের পরিকল্পনা ছিল সমবেত কৃষকবাহিনী নিয়ে পাভলোহ্রদে গিয়ে বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে মিলে সেনা-অস্ত্রাগার থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র জুটিয়ে নিপরোপেট্রোভস্ক-য়ের প্রশাসনকেন্দ্রের উপর আক্রমণ হানা, নিপরোপেট্রোভস্ক দখলে নেওয়ার পর ক্রমশ বাকি ইউক্রেন দখলের পথে যাওয়া। তারা নিশ্চিত ছিল যে নিপরোপেট্রোভস্ক-য়ে সোভিয়েত সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চল জুড়ে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা উঠে দাঁড়াবে এবং নিজ নিজ গ্রামে সোভিয়েত প্রশাসকদের গ্রামছাড়া করবে। ৫ই এপ্রিল ভোরে ওসাদচি গ্রাম থেকে অভ্যুত্থান শুরু হয়। ওসাদচি গ্রামের সোভিয়েত প্রশাসন ও কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তিদের বিদ্রোহীরা খুন করে এবং তারপর আশেপাশের গ্রামগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সব গ্রামে আরও কৃষক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। দিন যত গড়াতে থাকে, বিদ্রোহীরা একের পর এক কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্য,

কোমসোমোল সদস্য, কোলখোজ আধিকারিক ও স্থানীয় সোভিয়েত প্রশাসনের আধিকারিকদের খুন করতে থাকে, টেলিফোনের তারও কেটে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই গ্রামের প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাভলোহ্রাদের সরকারি সেনার কাছে বিপদসংকেত চলে গিয়েছিল। পাভলোহ্রাদের সরকারি বাহিনীর সেনারা অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়ার আবেদনে সাড়া দেয়নি। সরকারি সেনাবাহিনী বিকেলে এসে পৌঁছল ওসাদচি গ্রামে। তাদের আক্রমণের মুখে বিদ্রোহী কৃষকরা পিছু হঠতে বাধ্য হল। কিন্তু ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী তেরনিভকা গ্রামে বিদ্রোহী কৃষকরা সরকারি প্রশাসন, কম্যুনিস্ট পার্টি ও কোলখোজের দপ্তর দখল করে নিয়েছে। পরের দিন, ৬ই এপ্রিল, নিপরোপেত্রোভস্ক থেকে ওজিপিইউ-র বিশাল সশস্ত্র বাহিনী— ২০০ জন সেনা, ৫৮ জন ঘোড়সওয়ার— এসে পৌঁছাল। ওজিপিইউ-র নেতা বেলিয়াতস্কির তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'এই প্রতিবিপ্লবী ডাকাতদলকে একেবারে খতম করে আসতে হবে।' ওজিপিইউ ও অন্যান্য সরকারি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষকদের যুদ্ধ টানা দুদিন ধরে চলল। রাষ্ট্রের সংগঠিত ঘাতকবাহিনীর অস্ত্রবলের কাছে অসংগঠিত কৃষকদের নতিস্বীকার করতে হল। যুদ্ধে কতজন কৃষক মারা গিয়েছিল, তা কেউ গুনে রাখেনি। ওজিপিইউ যাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ করে 'প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের' আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য, তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০-র বেশি। জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ায় ওজিপিইউ-র মুখ খোলানোর ওষুধের ঘায়ে ১৩ জন মারা গিয়েছিল, ২০ শে মে ২৭ জনকে শাস্তিস্বরূপ খুন করা হয়েছিল আর বাকিরা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বন্দিশিবিরে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল।

বিদ্রোহীদের আঘাত ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রত্যাঘাতে পাভলোহ্রাদের কৃষক বিদ্রোহের মতো নৃশংস ও রক্তক্ষয়ী না হলেও ইউক্রেনের গ্রামে গ্রামে আরও বহু কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল। তেমনই একটা হল ক্রিভিরিহ-র কৃষকবিদ্রোহ। মার্চের গোড়ায় এখানকার সোভিয়েত কর্মকর্তারা বড়াই করে দাবি করেছিলেন যে তাঁরা সমবায়িকরণের কাজ ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। ওজিপিইউ-রও মূল্যায়ন ছিল যে এখানকার কৃষকরা বেশ বাধ্য স্বভাবের। কিন্তু বসন্তের ফসল বোনার মরশুমের আগে কোলখোজ-কর্তারা যখন সব কৃষকদের ঘর থেকে সমস্ত শস্যবীজ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ জারি করলেন, পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল। ওজিপিইউ-র নজরদারদের কানে এল যে কৃষকরা বলাবলি করছেন: 'ওরা সব খাদ্য ইউক্রেন থেকে চেঁছেপুঁছে নিয়ে চলে যাবে', 'ইউক্রেনের জন্য

কিছু পড়ে থাকবে না, শস্যের শেষ দানাটুকু কেড়ে নিয়ে ওরা কৃষকদের না খাইয়ে মারবে'। স্তালিনের লেখা উল্লেখ করে কৃষক-মহিলাদের জটলায় আওয়াজ উঠতে লাগল: 'স্বেচ্ছায় যারা যাবে তাদের নিয়ে যৌথ খামার হওয়ার কথা অথচ এখানে ওরা জোর খাটিয়ে আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে!' দল বেঁধে কৃষকঘরের পুরুষ ও মহিলারা সোভিয়েত প্রশাসনের দপ্তরে গিয়ে কোলখোজের দখল থেকে তাদের সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সংগঠিতভাবে দাবিপত্র পেশ করল। তাতে কোনও সাড়া না পাওয়ায় ১৪ই মার্চ প্রায় ৫০০ জন পুরুষ ও মহিলার একটা দঙ্গল সোভিয়েত প্রশাসনের দপ্তর ঘেরাও করল। তাদের দাবি: সব শস্যবীজ ফেরত দিতে হবে, কোমসোমোলের সংগঠন ভেঙে দিতে হবে, জোর করে দখল করা সমস্ত সম্পত্তি কৃষকদের ফেরত দিতে হবে এবং ছলেবলেকৌশলে আদায় করা সমস্ত আর্থিক জরিমানা ফেরত দিতে হবে। ক্রমশ আরও কৃষক সেই ঘেরাওয়ে যোগ দিতে লাগল, হেস্তনেস্ত না করে কেউ ঘরে ফিরবে না জানিয়ে দিল। এরপর আবার সেই একই কাহিনি। ওজিপিইউ-র সশস্ত্র বাহিনি এল, নিরস্ত্র কৃষকদের উপর হামলা চালিয়ে ছত্রখান করে দিল, 'প্রতিবিপ্লবে উস্কানিদাতা' বলে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র এভাবে ক্রমাগত বলপ্রয়োগ, নজরদারি ও দমনশক্তি নির্ভর এমন এক যন্ত্রের চেহারা নিল যে সবসময় আপামর মানুষকে চরম সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে। রাষ্ট্র তার নিজের চূড়ান্ত আধিপত্যকামী অভিপ্রায়কে 'বিপ্লব ও প্রগতির অভিপ্রায়' বলে পবিত্র আসনে বসাল। আর জনতার যে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকে 'প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে নির্মম দমনের বস্তু করে তুলল। ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করতে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাপন্থীদের 'উস্কানিদাতা কুচক্রী' বলে স্থির করা হল। আধা-সত্য ও মিথ্যা মিশিয়ে বেলিয়াতস্কি ও অন্যান্য ওজিপিইউ-নজরদাররা জাতীয়তাবাদীদের চক্রান্তের নানা কাহিনি বানালেন যা তাঁদের পূর্বনির্ধারিত সন্দেহকেই অকাট্য বাস্তব বলে হাজির করল। ফলে ইউক্রেনিয় কৃষক এবং জাতীয়তাপন্থীরা সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু হয়ে উঠল। শত্রুদমনে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র এরপর পরিকল্পিত গণহত্যার পথ নেবে, কৃষকদের আশঙ্কা সত্যি করে তাদের না খাইয়ে মারা হবে, জাতীয়তাপন্থীদেরও বন্দিশিবিরে নিকেশ করা হবে, সেই যন্ত্রণাকর অধ্যায়ে এখন আমরা প্রবেশ করব।

১৫

হোলোদোমোর: অভুক্ত রেখে গণহত্যা

১৯৩২-১৯৩৩ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্র ইউক্রেনের কৃষকদের কাছ থেকে শেষতম শস্যবিন্দু ও খাদ্যের শেষ টুকরোটুকুও কেড়ে নিয়ে তাদের দীর্ঘ অনাহারের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাকর মৃত্যুর দিকে পরিকল্পিতভাবে ঠেলে দিয়েছিল। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল না হওয়া বা ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে তা ঘটেনি। রাষ্ট্রনেতারা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে সোভিয়েত ইউক্রেনের কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদটুকুও কেড়ে নিয়েছিল। আশপাশের শহরে বা অন্য প্রদেশে গিয়ে দয়াভিক্ষা করেও যাতে কৃষকরা খাবার জোগাড় করতে না পারে, তার জন্য ইউক্রেনের গ্রামগুলোকে ঘিরে লালফৌজ ও কম্যুনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রামে জমে উঠেছিল মৃতদেহ। দীর্ঘ অনাহারের ফলে দেহগুলো বেঢপ ফুলে গেছে, চামড়া পাতলা হয়ে যেন প্রায় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ঘরে, রাস্তায়, মাঠেঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে এমনই কোনও দেহ— পুরুষ অথবা নারী, শিশু, কিশোর অথবা বয়স্ক। প্রশাসনের কম্যুনিস্ট কর্তারা ও কোমসোমলের কম্যুনিস্ট যুববাহিনী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গাড়িভর্তি লাশ তুলে এনে হতচ্ছেদ্দার গণকবরের ব্যবস্থা করত। সর্বোচ্চ নেতা স্তালিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই খাদ্য কেড়ে নিয়ে মানুষ মারার কর্মসূচি চালানো হয়েছিল। আর স্তালিনের নির্দেশেই চরম 'গোপনীয়তা' বজায় রাখা হয়েছিল। শুধু সেই সময়েই নয়, যতদিন সোভিয়েত রাষ্ট্র টিকে ছিল, ততদিন কোনও কম্যুনিস্ট নেতা বা কর্মী স্বীকার করেন নি যে সোভিয়েত ইউক্রেনে ১৯৩২-১৯৩৩-য়ে অনাহারে মানুষ গণহারে মারা গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার মোড়কে এভাবে কত মৃত্যুকে চাপা দেওয়া হয়েছিল ? ১৯৩২-১৯৩৩ সালে সোভিয়েত ইউক্রেনের গ্রামে না খাইয়ে রেখে কতজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ? ইতিহাস গবেষকদের হিসেব যে কম করে ৫০ লাখ, আর

সর্বোচ্চ ১ কোটিও ছাড়িয়ে যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় খামার ও নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার স্তালিনিয় পরিকল্পনায় বাধ সাধার অপরাধে ইউক্রেনের কৃষকদের উপর এই ছিল স্তালিন-প্রদত্ত শাস্তি।

১৯৩২ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রের জোর খাটিয়ে রাষ্ট্রীয় খামার কোলখোজ গঠনের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল বললেই চলে। ইউক্রেনিয় কৃষকদের ৭০ শতাংশেরও বেশি রাষ্ট্রীয় খামারের স্বল্পবেতনের মজুরে পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় খামার গঠনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ যখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, তখনই রাষ্ট্রকর্তা স্তালিনের নৃশংসতম আক্রমণটি শুরু হল। মস্কোর কেন্দ্রীয় সোভিয়েত থেকে ১৯৩২ সালের শস্য সংগ্রহের লক্ষ্য হিসেবে ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকারকে জানানো হয়েছিল যে ইউক্রেন থেকে ৭৭ লাখ টন শস্য সংগ্রহ করে দিতে হবে। ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা-আধিকারিকরা প্রথমে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই বলে যে নির্দিষ্ট করা ওই পরিমাণ অবাস্তব রকমের বেশি, যদি অতো শস্য আদৌ সংগ্রহ করা যায়, তবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের খাদ্য হিসেবে আর কিছুই পড়ে থাকবে না। কিন্তু মস্কোয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তারা এই প্রতিবাদে কান দিতে রাজি ছিলেন না। সর্বোচ্চ কর্তা স্তালিনের দূত হিসেবে ভিয়াচেস্লাভ মলোটভ এসেছিলেন ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট নেতা-আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে। বৈঠকে ইউক্রেনিয় নেতা-আধিকারিকদের সমস্ত 'ওজর-আপত্তি' উড়িয়ে দিয়ে মলোটভ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন যে শস্যসংগ্রহের লক্ষের পরিমাণ কমানো সংক্রান্ত যে কোনও কথা হল 'বলশেভিক-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী' মানসিকতার প্রতিফলন, তাই সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য তো কমাবেই না, লক্ষ্যপূরণের কাজে কোনওরকম ঢিলেমি বা দোলাচলও কঠোর হাতে দমন করবে। স্তালিনের প্রতিনিধির এই 'কড়া ধমক' ইউক্রেনিয় কমরেডদের মুখে কুলুপ এঁটে দিল, বিশ্বস্ত পার্টিকর্মী হিসেবে তাঁরা কৃষকদের খাদ্য কেড়ে নেওয়ার কাজে নামলেন।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত সরকার একটি সরকারি নির্দেশ ('ডিক্রি') জারি করল। তাতে ঘোষণা করা হল যে রাষ্ট্রীয় খামার সহ সমস্ত যৌথ খামারের অধীন সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে একমাত্র রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হল, রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই সম্পত্তির কোনও অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করলে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং কঠোরভাবে তার শাস্তি দেওয়া হবে। এই নতুন আইনকে হাতিয়ার করে সোভিয়েত আধিকারিকরা ফসল সংগ্রহ করার দল

পাঠাতে লাগল সোভিয়েত ইউক্রেনের গ্রামে। এই দলে সরকারি আধিকারিক ছাড়াও থাকত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী, কম্যুনিস্ট যুবসংগঠন কোমসোমলের কর্মী, ওজিপিইউ-র গুপ্তপুলিশ ও লালফৌজের সশস্ত্র সেনা। রাষ্ট্রীয় খামার সহ সমস্ত যৌথ খামার থেকে উৎপাদিত সমস্ত ফসল তারা দখল করে নিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের নির্ধারিত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়া তখনও অনেক দূরে। ফলে আরও শস্য চাই। তাই সংগ্রহকারী দল এবার হানা দিল গ্রামে কৃষকদের ঘরে ঘরে। তাদের সন্দেহ যে কৃষকরা 'কুলাক-মনোবৃত্তি' থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য 'চুরি করে' শস্য নিজেদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। কৃষকদের ঘরে গিয়ে নির্মম তল্লাশি চালানো হল। গোটা বাড়ি তল্লাশি করে কিছু না পেলেও ঘরের মেঝে খুঁড়ে, দেওয়াল ফাটিয়ে, উনুন ভেঙে তল্লাশি করা হল কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। কৃষক পরিবারের পুরুষ বা মহিলা, শিশু বা বয়স্কদের উপর জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে শারীরিক অত্যাচার করা হল যাতে তাদের মুখ থেকে বের করা যায় কোথায় তারা 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি' শস্য লুকিয়ে রেখেছে। কারও ঘরে একপাত্র গম বা দুয়েক বস্তা শস্যদানা বা আলু বা অন্য খাদ্য পেলেও তা নির্মমভাবে কেড়ে নেওয়া হল গোটা পরিবারটির অনাহার নিশ্চিত করে, উপরন্তু পরিবারের প্রধান পুরুষটিকে গ্রেপ্তার করা হল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী হিসেবে। গ্রেপ্তার হওয়া এই কৃষকদের বহুজনকে 'কঠোর শাস্তি' দেওয়ার নামে গুলি করে মারা হল, বাকিদের চালান করা হল সাইবেরিয়া বা কাজাখস্তানের কুখ্যাত লেবার ক্যাম্পে— অমানুষিক নির্যাতনে বন্দি অবস্থায় খনিতে কাজ করে বা মেরুঅরণ্যে গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহ করে অর্ধভুক্ত অর্ধমৃত মানুষগুলো যেখানে একদিন বিষণ্ণ একাকী মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে যাবে পরিচিত আত্মীয়স্বজন সকলের অজান্তে আর তার লাশ বস্তাবন্দি হয়ে ঠাঁই পাবে গণকবরে।

ইউক্রেনিয় কৃষকদের উপর এই নৃশংস আক্রমণের ঘটনা তৎকালীন কোনও সংবাদমাধ্যমে ঠাঁই পায়নি, বরং সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কম্যুনিস্ট পার্টি তার সমস্ত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে 'প্রতিক্রিয়াশীল কুলাকদের বিরুদ্ধে নির্ধারক শ্রেণিসংগ্রাম' হিসাবে গরিমাণ্বিত করেছিল। তদানীন্তন কোমসোমলের সদস্য লেভ কোপেলেভ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর যখন কানাডায় অভিবাসী, তখন সেখানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

> বহুজনের মতো আমিও বিশ্বাস করতাম যে গ্রামগুলোর ঝুঁটি ধরে ভালোরকম ঝাঁকুনি দিতে হবে, তবেই লুকিয়ে রাখা শস্য উদ্ধার করা যাবে।... আমরা

বিশ্বাস করতাম যে গ্রামবাসীদের কোনও সচেতনতা নেই, তারা পশ্চাৎপদ, তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়েই চিন্তা করে, শ্রমিকদের নিয়ে তাদের কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। আমরা ভাবতাম যে সমাজতন্ত্র গঠনের সাধারণ সমস্যা নিয়ে বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করা নিয়ে এই গ্রামবাসীদের কোনও উৎসাহই নেই।... স্কুলের পাঠঘরে ও কোমসোমলের বৈঠকে আমাকে এমনটাই শেখানো হয়েছিল। সংবাদপত্রেও আমি এমনটাই পড়তাম। বিভিন্ন সভাতেও এমনটাই বলা হত। সমস্ত তরুণরাই এমনটা ভাবত।

(অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃষ্ঠা-২৩৭-তে উদ্ধৃত।)

কোপেলেভের চারপাশের তরুণরা এমনটাই মনে করত। কিন্তু গ্রামের কৃষকঘরের তরুণরা ? সেই 'অসচেতন, পশ্চাৎপদ' পরিবারের তরুণরা কী মনে করত তা কোপেলেভের মতো সচেতনতা-গর্বী তরুণরা তখন জানা প্রয়োজন বলেই বোধ করেনি। 'অসচেতন, পশ্চাৎপদ' বলে কাউকে দেগে দিলে, 'প্রগতির যজ্ঞে বাধা' বলে চিহ্নিত করে 'শত্রু' হিসেবে সামনে খাড়া করে দিলে তাদেরও কোনও কথা যে বিবেচ্য হতে পারে, সেই বোধটাই বোধহয় আর থাকে না। অবশ্য সেই গ্রামের ঘরের তরুণ-তরুণীদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জমা কথা সমাজ থেকে একেবারে তো আর মুছে ফেলা যায়না, যৌথস্মৃতিতে তার ধারা রয়ে যায়। সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়ার পর ইউক্রেনিয় ইতিহাসবিদ ভ্যালেন্তিনা বোরিশেঙ্কো একটি মৌখিক ইতিহাসের সংগ্রহ প্রকাশ করেন ২০০৭ সালে, যেখানে ১৯৩২-১৯৩৩ সালের ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে কৃষক পরিবারের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তখনকার তরুণ-তরুণীদের মুখে। ইউক্রেনিয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে বইটি ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় 'এ ক্যাণ্ডেল ইন রিমেমব্রেন্স: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দি ইউক্রেনিয়ান জেনোসাইড অফ ১৯৩৩-১৯৩৪' নামে। সেখান থেকে দেখা যাক গ্রামের কৃষক পরিবারদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ওলহা সিমবালিউক স্মৃতিচারণ করেছেন:

আটা, ময়দা. ছাতু, খাদ্যশস্য, পাত্রে বা বোতলে সংরক্ষিত যে কোনও কিছু, জামাকাপড়, গৃহপালিত পশু —সংগ্রহ-ব্রিগেড সবকিছু নিয়ে যেত। লুকিয়ে রাখা ছিল অসম্ভব। লোহার রড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তারা তল্লাশি করত... মেঝে ভেঙে ফেলে, দেওয়াল ভেঙে তল্লাশি করত, উনুনের মধ্যে তল্লাশি করত।

আরেকজন বলেছেন:

খাদ্যশস্য তো তারা নিতই, ঘরের লাগোয়া ছোট সবজিবাগান থেকেও তারা সব লুটে নিয়ে যেত— গাছ থেকে সব ফল পেড়ে নিয়ে যেত, সবজি-তরিতরকারির গাছ ফাঁকা করে সব নিয়ে যেত, বীজদানাগুলোও নিয়ে যেত। মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে যেত। মাখন বা দুধ, মাংস বা সসেজ যা থাকত সব নিয়ে যেত।

কিয়েভ প্রদেশের গ্রামের বসিন্দা মিকোলা প্যাট্রিনচুক বলেছেন:

ঘরে যা খাবার থাকত সব নিয়ে যেত। এমনকি আমাদের পোষা কুকুরটাকেও মেরে তার দেহটা নিয়ে গিয়েছিল।

আরেকজন বলেছেন:

আমার বোন তখন সবে জন্মেছে। আমাকে আর বোনকে খাওয়ানোর জন্য মা কিছু জোয়ারদানা একটা থলিতে পুরে চিমনির মধ্যে ঢুকিয়ে তার মুখ সিমেন্ট দিয়ে লেপে বন্ধ করে দিয়েছিল। সংগ্রহ ব্রিগেড তল্লাশিতে এসে সিমেন্টের নতুন লেপন দেখে সন্দেহ করল। সিমেন্ট চটিয়ে তারা জোয়ারদানার থলি পেয়ে গেল। মা অনুনয় বিনয় করছিল যে ওগুলো নিয়ে গেলে সদ্যোজাত বাচ্চাটা খাওয়ার না পেয়ে মারা যাবে। তাদের পা ধরে মা ভিক্ষা করছিল জোয়ারদানার থলিটার জন্য। কিন্তু তারা লাথি মেরে মাকে ফেলে দিয়ে সব নিয়ে চলে গেল। আমার মনে হচ্ছিল ভগবান যিশুকে ক্রসে চড়ানো অমানুষগুলোও নিশ্চয়ই এমনই ছিল।

চেরনিহিভ অঞ্চলের এক মহিলা বলেছেন:

তল্লাশিতে এসে সংগ্রহ-ব্রিগেডের 'অ্যাকটিভিস্ট'-রা প্রশ্ন করেছিল যে কোথায় আমরা আমাদের সোনাদানা আর খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখেছি। আমার মা বলল যে দুটোর কোনওটাই আমাদের নেই। তারা মায়ের উপর অত্যাচার করতে লাগল। দরজার ফ্রেম আর পাল্লার ফাঁকে মায়ের হাতের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে ওরা সজোরে দরজা চেপে বন্ধ করল। মায়ের হাতের সবকটা আঙুল ভেঙে গেল। রক্তে ভরে গেল, মা অচেতন হয়ে নেতিয়ে পড়ল। ওরা মায়ের মাথার উপর জল ঢেলে মায়ের জ্ঞান ফেরাল, তারপর আবার আগের মতো জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে লাগল। তারা মাকে মারধোর করল। যে হাতের আঙুলগুলো আস্ত ছিল, তার নখের নিচে সুঁচ গিঁথে দিতে লাগল...।

ঝিটোমির প্রদেশের গ্রামবাসী দুই বোনের বয়ান এইরকম:

আমাদের বাবা তিন বালতি যব চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। গোপনে আমাদের মা সেদিন সন্ধ্যায় খিদের হাত থেকে আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যবের মণ্ড করে দিয়েছিল। কিন্তু কেউ টের পেয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই সরকারের লোকেদের জানিয়ে দিয়েছিল। সংগ্রহ-ব্রিগেড তাই আবার ফিরে এল পরের

দিন। আগের তল্লাশির সময় ওই যবদানা লুকিয়ে রাখার জন্য তারা বাবাকে নির্মমভাবে মারধোর করল... বাবার হাতের আঙুল দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে জোরে দরজা বন্ধ করে তারা সবকটা আঙুল ভেঙে দিল, রক্তাক্ত বাবাকে মেঝেতে ফেলে অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে এলোপাথাড়ি লাথি মারতে লাগল। তারপর বাড়ির জিনিষপত্র সবকিছু লুট করে নিয়ে চলে গেল। এমন গালিগালাজ আর মার আমাদের হতবাক অসাড় করে দিয়েছিল। আমাদের পরিবারে বাবার সামনে নম্রভাবে কথা বলার শিক্ষা ছিল, এমন হিংসা ছিল আমাদের কল্পনার অতীত...।

ভিনিতসিয়া প্রদেশের গ্রামের এক কামারের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন একজন:

গোটা কয়েক গমের ছড়া ওই কামার চুরি করেছিল তার তিন শিশু সন্তানের মুখে কিছু খাবার তুলে দেওয়ার জন্য। তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল সরকারি গ্রামকমিটির সামনে। সেখানে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য মারধোর ও নির্যাতন করা শুরু হয়। শেষ অবধি তার ঘাড় মচকে মাথা ঘুরিয়ে মুখটাকে সামনে থেকে পুরো পিছনে নিয়ে আসা হয় এবং তারপর সিঁড়ির উপর থেকে ধাক্কা মেরে তার দেহটাকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়।

আরেকটি গ্রামের বাসিন্দার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়:

আমাদের গ্রামে যে কৃষকরা সংগ্রহ-ব্রিগেডের হাতে তাদের দাবি অনুযায়ী খাদ্যশস্য তুলে দিতে পারত না, তাদের ধরে গ্রাম-সোভিয়েতের দপ্তরে নিয়ে আসা হত। গ্রাম-সোভিয়েতের চেয়ারম্যান তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করত। সেই ব্যবস্থা হল 'ঠাণ্ডা করার ঘরে' অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা। এই ঘর আসলে গ্রামের সভাঘরের পিছনদিকে একটা ঘর। সেখানে কোনও বিছানা, বেঞ্চি বা অন্য আসবাব ছিল না। ঘরের মেঝেয় খড় পাতা ছিল। সেখানেই পুরুষ ও মহিলা বন্দিদের ঠেসাঠেসি করে সর্বক্ষণ কাটাতে হত, তাদের কিছু খেতে দেওয়া হত না। তাদের পরিবারের কেউ বা আত্মীয়স্বজন দাবিমতো খাদ্যশস্য বা অন্য খাদ্যদ্রব্য গ্রাম-সোভিয়েতে এসে জমা করতে পারলে তবে তাদের ছাড়া হত।

১৯৩২ সালের গোটা হেমন্ত ও শীতকাল ধরে সোভিয়েত সংগ্রহ-ব্রিগেড এমন নির্মম তাণ্ডব চালিয়েও কেন্দ্রীয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট করা শস্যসংগ্রহের 'কোটা' পূরণ করতে পারল না। এটা কি খুব সহজভাবে এটাই দেখায় না যে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইউক্রেনের জন্য নির্দিষ্ট করা 'কোটা'-টা কেবল বেশি নয়, অতিরিক্ত রকমের বেশি ছিল? না, স্তালিন এবং তাঁর পার্ষদ অন্যান্য

সোভিয়েত নেতৃবর্গ তেমনটা মনে করলেন না তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কুলাকদের রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও ফসল লুকিয়ে রাখার জন্যই ফসলসংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়নি, সুতরাং বিপ্লবের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে 'আপোষহীন শ্রেণিসংগ্রাম' আরও তীব্র, আরও নির্মম করতে হবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমস্ত প্রচারমাধ্যম সেই কথা আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে লাগল। এই মতে সওয়ার হয়ে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্র আরেকটি 'ডিক্রি' জারি করল। সেই ডিক্রিতে বলা হল, যে যে গ্রাম তাদের ফসলের কোটা পূরণ করতে পারেনি, সেইসব গ্রামে কারখানাজাত দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হবে না এবং ভবিষ্যৎ কৃষিকাজের জন্য কোনও অগ্রিম অর্থও বরাদ্দ করা হবে না। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে এর মানে গ্রামগুলোয় দ্রব্যসামগ্রি সরবরাহের সমস্ত পথ আটকে দিয়ে শুকিয়ে মারা।

গোটা হেমন্ত ও শীত ধরে চলা সংগ্রহ-ব্রিগেডের লুটতরাজ ও বছরশেষে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এই অর্থনৈতিক অবরোধ গ্রামের কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে দিল। এককণা খাদ্যদ্রব্যও আর থাকল না কৃষকদের ঘরে। রাষ্ট্রের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ-অনাহার ১৯৩৩-য়ের বসন্ত ও গ্রীষ্মে মহামারির চেহারা নিল।

এই নির্মম নিরন্তর অনাহারের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে এই দুর্ভিক্ষের ইতিহাস রচনাকারী অ্যান অ্যাপেলবম লিখেছেন:

> অনাহারের কবলে পরার পর মানবদেহ একটাই পথে এগোয়। প্রথম পর্বে দেহ তার সঞ্চিত শর্করার ভাণ্ডার নিঃশেষে গ্রাস করতে থাকে। তীব্র খিদের অনুভূতি চেপে বসে, সবসময় খাবারের চিন্তা মাথায় ঘোরে। এরপর দ্বিতীয় পর্ব যা চলতে পারে বহু সপ্তাহ ধরে। তখন দেহ তার নিজের চর্বি গ্রাস করতে থাকে আর মানুষটি ভয়ঙ্কর দুর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয় পর্বে এসে দেহ গ্রাস করে তার নিজের প্রোটিনসমূহ, নিজ পেশী ও গ্রন্থিকলা নিজেই খেতে থাকে। ক্রমশ চামড়া পাতলা হতে থাকে, চোখদুটো অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত হতে থাকে, পা ও পেট ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে কারণ চূড়ান্ত অসঙ্গতির মুখে পড়ে দেহ জল সংরক্ষণ করে রাখতে থাকে। অল্প নড়াচড়া করলেই চরম ক্লান্তি চেপে বসে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারে: প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্যের অভাবের কারণে ঘটা এই রোগগুলো হতে পারে স্কার্ভি, কোয়াসিওরকোর, মারাসমাস, নিমোনিয়া, টাইফাস, ডিপথেরিয়া বা বিভিন্ন রকমের সংক্রমণ ও চর্মরোগ।
>
> (অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃষ্ঠা-২৪৬।)

বিমূর্ত অনাবেগি এই 'বৈজ্ঞানিক' বর্ণনায় বলা অবস্থা মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় কী রূপ ধারণ করে ? একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যই বোধহয় তা তুলে ধরতে পারে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় তথ্য-অবদমনের ফলে এমন সাক্ষ্য ইউক্রেনের বাইরে আমাদের জানা সম্ভব ছিলনা। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর ইউক্রেনিয় ইতিহাসপ্রণেতাদের উদ্যোগে এখন তা সম্ভব। আগেই আমরা ভ্যালেন্তিনা বোরিশেঙ্কো-র সংগ্রহ করা মৌখিক ইতিহাস ব্যবহার করেছি। এ ছাড়াও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কিয়েভের কিয়েভো-মোহিলিয়ানস্কা আকাদেমিয়া থেকে 'ইউক্রেনস্কি হোলোকস্ত ১৯৩২-১৯৩৩' নামে। এই উৎসগুলো থেকে কয়েকটি মানব-অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেখা যাক।

কিয়েভ প্রদেশের গ্রামের বাসিন্দা তেতিয়ানা পাভলিচকা স্মৃতিচারণ করেছেন:

> আমার বোন তামারার পেটটা ফুলে বিশাল হয়ে গিয়েছিল, সরু লম্বা কাঠির মতো তার গলাটা পাখির গলার মতো দেখাত। মানুষদের তখন মানুষের মতো দেখাত না, অনাহারী ভূতপ্রেতের মতো দেখাত।

আরেকজন বলেছেন:

> আমার মাকে ঝরনার স্বচ্ছ জলে ভরা কাঁচের বোতলের মতো দেখাত। তাঁর দেহের অনাবৃত অংশের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যেত, যেন কোন প্লাস্টিকের থলিতে জল ভরা আছে।

আরেকজন স্মরণ করেছেন:

> মাথা ঘুরত সবসময়, চোখ ঝাপসা হয়ে থাকত যেন সবকিছু কুয়াশায় ঢাকা। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হত, যেন কেউ শিরা-পেশি টেনে ছিঁড়ে বের করে আনছে।

নিপরোপেত্রোভস্ক প্রদেশের গ্রামবাসী নাদিয়া মালিসকো তার মায়ের কথা স্মরণ করেছেন:

> মায়ের সারা দেহ ফুলেফেঁপে উঠেছিল, দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মাত্র ৩৭ বছর বয়স হলেও মনে হত যেন কত বুড়ো হয়ে গেছে। মায়ের পা দুটো চকচকে হয়ে উঠেছিল আর চামড়া ফেটে যাচ্ছিল।

খেমেলনিতস্কি প্রদেশের হ্লাফিরা ইভানোভা স্মরণ করেছেন:

> মানুষজনের দেহ কালচে হলদেটে হয়ে উঠছিল। ফুলে ওঠা দেহগুলোর চামড়া ফেটে গিয়ে ঘা হয়ে পুঁজ গড়াত।

আনাসতাসিয়া মাকসিমিভনা কুচেরুক স্মরণ করেছেন:

> পা ফুলে গেছে, চামড়া ফেটে ঘা হয়ে পুঁজ গড়াচ্ছে, এমন মানুষরা বসতে পারত না। বসতে গেলেই চামড়া আরও ফেটে গিয়ে আরও পুঁজ গড়াতে শুরু করত, অসহ্য যন্ত্রণা হত আর সে পুঁজের গন্ধ ছিল বীভৎস।

মিসচেঙ্কো স্মরণ করেছেন কীভাবে মৃত্যু আসত:

> ক্লান্তি বাড়তে বাড়তে সবকিছু ছেয়ে দিত, ভুক্তভোগী আর বিছানাতেও উঠে বসতে পারত না, নড়াচড়া করতে পারত না একটুও। আচ্ছন্ন এক অবস্থার মধ্যে কাটত সপ্তাহখানেক। তারপর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তার হৃদপিণ্ডও একসময় নিথর হয়ে যেত।

পিতিরিম সোরোকিন তাঁর অনাহারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন:

> খাবার ছাড়া অন্য কোনও কিছুর চিন্তায় অল্পক্ষণের জন্য মনোনিবেশ করাও দুষ্কর হত। কিছুক্ষণের জন্য যদিবা জোর করে খিদের চিন্তাকে চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম, অচিরেই আবার তা ফিরে এসে চেতনাকে গ্রাস করত। খাবারের চিন্তা নানা বিচিত্র রূপ ধরে এমন অভূতপূর্ব তীব্রতায় চেতনাকে ছেয়ে দিত যে প্রায়শই তা মতিভ্রমের আকার ধারণ করত। অন্য সমস্ত চিন্তা অনাগ্রহের বিষয় হয়ে আবছাভাবে চেতনার গণ্ডির বাইরে পড়ে থাকত।

খাবারের চিন্তায় তাড়িত হয়ে মরীয়া মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত। সেখানেও মৃত্যু ওত পেতে থাকত। হ্রিহোরি সিমিয়া স্মৃতিচারণ করেছেন :

> তখন ১৯৩৩-য়ের বসন্ত। গ্রামের রাস্তার ধারের গমের ক্ষেত থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসছিল। মাঠে নেমে পচনধরা কয়েকটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। খিদের জ্বালায় এরা কখনও লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাঠে নেমে এসেছিল, গমগাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কয়েক ছড়া গম কেটে মুখে পুরেছিল। কিন্তু তাদের এতদিনের উপবাসী পেটে তা হজম করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাতেই তাদের মৃত্যু হয়।

এইসব ক্ষেতের ফসল যেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত, গ্রামের কৃষকরা যাতে তা 'চুরি' না করতে পারে তার জন্য গ্রামের সোভিয়েত থেকে সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছিল পাহারা দেওয়ার জন্য। কয়েকছড়া গম বা কয়েকটা আলু বা বিট লুকিয়ে নিতে গিয়ে এই পাহারাদারদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে বহুজন।

গ্রামের কৃষকঘরের মানুষজন খাবারের খোঁজে কাছের রেলস্টেশন বা শহরে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিত। শহরের বাসিন্দাদের জন্য সরকারি বিপণি থেকে রুটি সরবরাহ হত। এই বিপণিগুলোর সামনে শহুরে মানুষদের লম্বা লাইন পড়ত। গ্রামের কৃষকরা তাদের থেকে ভিক্ষা চাইত একটুকরো রুটি। গ্রাম থেকে হেঁটে শহরে যাওয়ার পথেই অনেকের অনাহারক্লান্ত অবসন্ন দেহ পথের ধারে লুটিয়ে পড়ত অচেতন হয়ে, মৃত্যু হত কারও। শহরে যারা পৌঁছতে পারত, তাদের সঙ্গেও মানুষের মতো ব্যবহার করা হতনা। মারিউপোল শহরের এক বাসিন্দা এমনই এক ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন:

> একদিন বিপণির সামনে রুটি কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় দেখলাম গ্রামের কৃষক ঘরের একটা মেয়ে, বছর পনেরো বয়স, ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, অনাহার তার চোখের দৃষ্টিতে লেখা। যে-ই রুটি কিনছিল, মেয়েটি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দু-এক কণা রুটি ভিক্ষা করছিল। শেষ অবধি সে বিপণিচালকের কাছে গিয়ে হাত পাতল। এই বিপণিচালক নিশ্চয়ই নতুন বদলি হয়ে এসেছে, এ অঞ্চল তার অপরিচিত। হয় সে ইউক্রেনিয় ভাষা বলতে পারে না অথবা তা বলতে চায় না। সে মেয়েটাকে গালাগাল করতে শুরু করল, বলতে লাগল যে এইসব শুয়োরগুলো এতই অলস ও ফাঁকিবাজ যে রাষ্ট্রীয় খামারে খাটবে না। আর গালাগাল করতে করতে সে তার হাতের রুটিকাটার ছুরির ভোঁতা দিকটা দিয়ে সজোরে মেয়েটার বাড়িয়ে দেওয়া হাতে ঘা বসাল। দুর্বল মেয়েটা সেই ঘা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল, তার অন্য হাতের মুঠো খুলে গিয়ে এতক্ষণ ভিক্ষে পাওয়া দুয়েক টুকরো রুটিও মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। বিপণিচালক এবার এগিয়ে এসে মাটিতে পড়া মেয়েটির গায়ে লাথি মারতে মারতে গর্জন করতে লাগল: 'উঠে পড়! ভাগ এখান থেকে! ঘরে গিয়ে গতর খাটা!' মেয়েটির দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল, তার গলা দিয়ে গোঙানি ছিটকে বেরল, তারপর তার দেহটা কুণ্ডলী ছাড়িয়ে নেতিয়ে পড়ল, সে দেহে আর প্রাণ নেই। রুটির লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কম্যুনিস্ট বিপণিচালক তা খেয়াল করে হুমকির সুরে গর্জে উঠল: 'কেউ কেউ দেখছি আর আবেগ সামলাতে পারছে না! এসব জনগণের শত্রুদের দেখলেই চেনা যায়।'
>
> (এস ও পিধাইনি সম্পাদিত দি ব্ল্যাক ডিডস অফ ক্রেমলিন: এ হোয়াইট বুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।)

খিদের জ্বালায় মানুষের মানুষকে মেরে খাওয়ার ঘটনাও ঘটল। কিয়েভ প্রদেশের গ্রামবাসী লারিসা ভেনঝিক স্মৃতিচারণ করেছেন:

প্রথমে আমাদের গ্রামে কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল যে শিশুসন্তানরা কোথায় নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, অধঃপতিত মা-বাবা-রা সন্তানদের খেয়ে ফেলছে। ক্রমে বোঝা গেল যে এ গুজব নয়, এ নিদারুণ সত্য। আমাদের পাড়াতেই আমাদের পড়শির দুই মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। মেয়েদুটোর ৬ বছর বয়স্ক ভাই মিশা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে লাগল, চুরিও করত কখনও কখনও। কেন সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে না জিজ্ঞাসা করলে সে বলত যে বাবা তাকে মেরে কেটে খেয়ে ফেলবে আশঙ্কায় তার ভয় করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সেই বাড়িতে তল্লাশি করে কন্যাসন্তানদের হত্যা করে খাওয়ার প্রমাণ পেল এবং সেই দম্পতিকে গ্রেফতার করল। বাবা-মা-কে গ্রেফতার করা হল, কিন্তু মিশার জন্য কেউ কোনও ব্যবস্থা করল না, তাকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্তানদের মেরে খাওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হওয়া এমন কয়েকজন মায়ের সঙ্গে পোল্যান্ডের তরুণী ওলগা মেন-য়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওলগা মেন পোল্যান্ড থেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে এসেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁকে সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ চরবৃত্তির সন্দেহে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে। কিছুদিন পর তাঁকে সোলোভেতস্কি দ্বীপপুঞ্জের মুকসালমা দ্বীপের কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে ইউক্রেন থেকে গ্রেফতার করা প্রায় ৩০০ জন নরখাদক বন্দি আছে বলে তিনি শুনেছিলেন অন্যান্য বন্দিদের কাছে। মুকসেলমায় এসে সেই নরখাদকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি লিখেছেন:

নরখাদক সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিস্ময়ের ধাক্কা দ্রুতই কেটে গেল যখন এই খালি পায়ের আধা-উলঙ্গ দুঃখী ইউক্রেনিয়দের চাক্ষুষ করলাম। প্রাচীন ধর্মীয় মঠের বাড়িগুলোয় তাদের রাখা হত: তাদের অনেকেরই পেট অনাহারে ফুলে গেছে, বেশিরভাগই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি তাদের যত্ন করার চেষ্টা করতাম, তাদের স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিগত কথা শুনতাম। তারা বর্ণনা করত কীভাবে তাদের সন্তানরা খিদেয় মারা গিয়েছিল, আর তারপর কীভাবে তারা নিজেরা অনাহারের জ্বালায় নিজেদের সন্তানদের মৃতদেহ কেটে রান্না করে খেয়েছিল। খিদের তাড়নায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিল। পরে তাদের বোধ প্রকৃতিস্থ হলে যখন তারা উপলব্ধি করেছিল যে কী ঘটনা তারা ঘটিয়েছে, তখন মানসিক সমস্ত ভারসাম্য তারা হারাল। তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি হত, তাদের সঙ্গে দয়ালু আচরণ করার চেষ্টা করতাম, অনুতাপের আগুনে পুড়ে যখন তারা বেসামাল হয়ে উঠত তখন তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার

মতো কথা খুঁজতাম। খানিক্ষণের জন্য হলেও তাতে কাজ দিত। তারা কিছুটা শান্ত হত, কাঁদতে শুরু করত, আর আমিও তাদের সঙ্গে কাঁদতাম।...

(অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃষ্ঠা-২৬৬-তে উদ্ধৃত।)

১৯৩৩-য়ের বসন্তে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলে রোজ মানুষের মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠত। সোভিয়েত প্রশাসন লাশ সংগ্রহের জন্য কম্যুনিস্ট অ্যাকটিভিস্ট ও কোমসোমলের সদস্যদের দিয়ে দল তৈরি করে গ্রামে গ্রামে পাঠাত। কঠোরভাবে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নেওয়ানো হত। শহরের আশপাশ থেকে গুপ্ত পুলিশ ওজিপিইউ-র লোকেরা রাতের অন্ধকারে লাশ সংগ্রহ করে গণকবর দিয়ে দিত যাতে সথাসম্ভব চোখের আড়ালে সবকিছু সেরে ফেলা যায়। সোভিয়েত মহাফেজখানার ওজিপিইউ নথি থেকে জানা যায় যে ১৯৩৩-য়ের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন সময়কালে কেবলমাত্র খারকিভ শহরের আশপাশ থেকে ২,৭৮৫টি লাশ এভাবে গোপনে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামে শব-সংগ্রাহক দল টানাগাড়িতে লাশের স্তূপ জড়ো করার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে যাদের দেহে মাটি খোঁড়ার শক্তি অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে রুটি খেতে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে গণকবর খোঁড়ার জন্য নিয়ে যেত। মাটি খুঁড়ে গর্ত করে পরিচিতজনেদের লাশ তালগোল পাকিয়ে তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে মাটি চাপা দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসাবে বহুদিন অনাহারের পর একটা গোটা রুটি তাদের হাতে আসত।

১৯৩২-১৯৩৪ সময়কালে সোভিয়েত ইউক্রেনে রাষ্ট্রের তৈরি দুর্ভিক্ষে কতজন মারা গিয়েছিল? এখনকার গবেষকদের সংকলিত হিসাব হল:

প্রদেশের নাম	মৃতের সংখ্যা	জনসংখ্যার শতকরায়
কিয়েভ	১১,১০,৮০০	২০%
খারকিভ	১০,৩৭,৬০০	১৮.৮%
ভিনিতসিয়া	৫,৪৫,২০০	১২.৮%
মোলদোভা	৬৮,৩০০	১১.৮%
ওডেসা	৩,২৬,৯০০	১০.৯%
নিপরোপেত্রভস্ক	৩,৬৮,৪০০	১০%
চেরনিহিভ	২,৫৪,২০০	৯.৪%
ডোনেতস্ক	২,৩০,৮০০	৫.৪%
মোট:	৩৯,৪২,২০০	

(সূত্র: অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন)

১৬

সাহিত্যের সাক্ষ্য: জনৈক কম্যুনিস্ট অ্যাকটিভিস্টের ফিরে দেখা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কৃষক গণহত্যা সোভিয়েত রাষ্ট্র অম্লানবদনে অস্বীকার করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মান্য ইতিহাসের বাইরে রাখতে চেয়েছিল। সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক বা ইতিহাসলেখকদের কাছে এ ছিল নিষিদ্ধ বিষয়। তবু কেবল ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিতেই নয়, এ ঘটনার লিখিত বিবরণ রচিত হয়েছিল সমসাময়িক এক কথাসাহিত্যিকের কলমেও। তিনি ভাসিলি গ্রসমান। ইউক্রেনেই এক রুশভাষী ইহুদি পরিবারে জন্ম। প্রকাশনা ব্যবস্থা যখন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, তখন মুদ্রিত করে প্রকাশ করা যাবে না জেনেও তিনি 'এভরিথিঙ ফ্লোজ' নামে এক উপন্যাসে এই বিবরণ লিখেছিলেন। রুশ ভাষায় লেখা এই উপন্যাস অপ্রকাশিত অবস্থায় আড়ালেই পড়ে ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের শাসনকালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত লালফৌজের সঙ্গী হয়ে নাজিবিরোধী যুদ্ধের ফ্রন্ট থেকে পাঠানো প্রতিবেদনের জন্য সোভিয়েত পাঠকমহলে তাঁর জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল। তাঁর লেখা ত্রেবলিয়াঙ্কায় নাজি মৃত্যুশিবিরের বর্ণনাও প্রথম বিশ্বের সামনে নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেহারা উন্মুক্ত করেছিল, ম্যাক্সিম গোর্কিও সেই লেখার উচ্চ প্রশংসা করেছিল। কিন্তু যখনই তাঁর লেখা স্তালিনীয় রাষ্ট্রের প্রোপাগান্ডায় নির্মিত বাস্তবকে পুনরাবৃত্ত না করে সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্রশাসনের দৈনন্দিন চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছে, সোভিয়েত দেশে তাঁর লেখা মুদ্রণশালা অবধি আর পৌঁছতে পারেনি। স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নিস্তালিনীকরণ চলাকালীনও তার অন্যথা হয়নি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লাইফ অ্যান্ড ফেট' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ক্রুশ্চেভ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছিল। পান্ডুলিপির একটি অনুকরণ এক বন্ধুর কাছে লুকিয়ে থেকে যাওয়ায় এই ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মটি সর্বাত্মকতাবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর পাঠকদের সামনে হাজির হতে পেরেছিল। 'লাইফ অ্যান্ড ফেট' লেখার পর ভাসিলি গ্রসমান লেখেন আরও একটি ধ্রুপদী উপন্যাস—

'এভরিথিঙ ফ্লোজ'। 'লাইফ অ্যান্ড ফেট'-য়ের তুলনায় কৃশতনু হলেও তা যেন আরও হৃদয় উজাড় করে লেখা। সোভিয়েত সর্বাত্মকতার কালে তার প্রকাশও ছিল নিষিদ্ধ। পরিচিতজনের কাছে লুকিয়ে পড়েছিল সেই পান্ডুলিপিও। সোভিয়েত শাসনের পতনের মুখে ১৯৮৯ সালে তা প্রথম রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। লেখক তখন মৃত। ২০১০ সালে তা ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়। আন্না সেরগিয়েভনা নামক এক মহিলার জবানিতে সেখানে ইউক্রেনের হোলোদোমোরের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। কিশোরী কোমসোমোল সদস্য হিসেবে আন্না ইউক্রেনের গ্রামে রাষ্ট্রের ফসল-সংগ্রহ অভিযানে সামিল হয়েছিল। পরিণত বয়সে প্রায় ২৫ বছর পরে সেই দিনগুলো তার স্মৃতিতে আবার ফিরে আসছে এভাবে:

তখন আমার বয়স ২২।...

জেলা এগজিকিউটিভ কমিটির ভবনে আমি একজন সাফাইকারী হিসেবে কাজ করতাম; মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করা ছিল আমার কাজ। আমার এক বন্ধু ভূমি দপ্তরের মেঝে ধোয়ার কাজ করত। অনেক কিছুই আমাদের কানে আসত। তখন কী ঘটেছিল তার সবকিছু, হ্যাঁ, সবকিছু আমি তোমায় বলতে পারি। ওখানকার বৃদ্ধ হিসাবরক্ষক আমার সম্পর্কে বলত যে আমার সরকারি মন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল। কথাটা মিথ্যা নয়— যে কোনও জিনিষ আমি চটপট ধরতে পারি আর আমার স্মৃতিশক্তিও বেশ ভালো।

নিকুলাকীকরণ (Dekulakisation) শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালের শেষদিকে এবং সবচেয়ে হিংস্র রূপ ধারণ করেছিল ১৯৩০-য়ের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে।

একদম শুরুতে, ধরপাকড় ও গ্রেফতার শুরু হওয়ার আগে, কুলাকদের উপর একটা বিশেষ কর চাপানো হয়েছিল। কোনও না কোনওভাবে সেই অর্থ জোগাড় করে কুলাকরা তা মিটিয়েও দিয়েছিল। তারপর তাদের উপর দ্বিতীয়বার আবার কর বসানো হল। যাকিছু বিক্রি করা যায় তা বিক্রি করে কুলাকরা তাও মেটানোর চেষ্টা করেছিল। তারা ভেবেছিল যে তা মিটিয়ে দিতে পারলে রাষ্ট্র তাদের দয়া করে দেবে। কেউ কেউ অবশ্য বছরের খোরাকির শস্য দিয়ে ভদকা বানিয়ে আর হালের গরু নিধন করে পানাহার করেছিল যথেচ্ছ, কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে তাদের জীবনে এখানেই দাঁড়ি পড়তে চলেছে।

অন্য প্রদেশে অন্যরকম কিছু হলেও হতে পারে, আমাদের প্রদেশে এমনটাই ঘটেছিল। প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেবল পরিবারের মাথাদের। গ্রেপ্তার করা পুরুষদের মধ্যে বেশিরভাগই শ্বেতফৌজের হয়ে বা দেনিকিনের কসাক

বাহিনীর হয়ে অতীতে লড়েছিল। গ্রেপ্তারপর্বের এই প্রথম ঢেউ চালিয়েছিল ওজিপিইউ; পার্টি-অ্যাকটিভিস্টরা তাতে কোনও ভূমিকা নেয়নি। আর গ্রেপ্তার করা প্রত্যেককে সরাসরি গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, একজনের ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। অবশ্য ডিসেম্বরের শেষদিকে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের দুই-তিন মাস কারাগারে বন্দি রেখে তারপর দূরে বিশেষ শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন কোনও পরিবার থেকে পিতাকে গ্রেপ্তার করা হত, বাকি পরিবারকে সহায়হীন করে রাখা হত, তাদের সমস্ত বিষয়আশয়ের ফর্দ করা হত এবং সেসবের উপর তাদের আর কোনও মালিকানা থাকত না, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকত।

প্রাদেশিক পার্টি কমিটি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে তার অধীন প্রতিটি জেলা পার্টি-কমিটির কাছে পাঠাত। সেখানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকত মোট কত সংখ্যক গ্রেপ্তার করতে হবে। জেলা পার্টি-কমিটি তারপর নির্ধারণ করত তার অধীন গ্রামগুলোর কোনটায় কত সংখ্যক কুলাককে গ্রেপ্তার করতে হবে। আর তারপর গ্রামে কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তার ফর্দ কে তৈরি করত? সেই ফর্দ তৈরি করত তিনজনের এক 'ত্রোইকা'। তিনজন সাধারণ ঘোলাটে মাথার ব্যক্তি নির্ধারণ করত কে বাঁচবে আর কাকে মরতে হবে। রাখঢাকের বালাই ছিল না। ঘুষের কারবার চলত, কোনও মহিলার প্রতি ব্যক্তিগত লালসা বা অতীত থেকে পুষে রাখা প্রতিহিংসা মেটানো চলত, আর তার ফলে প্রায়শই দেখা যেত যে সবচেয়ে দরিদ্র কৃষকদের নামই কুলাকদের তালিকায় উঠেছে আর তুলনায় ধনী কৃষকরা নজরানা পাঠিয়ে নিজেদের সেই তালিকার বাইরে রেখেছে।

এখন অবশ্য আমি বুঝতে পারি যে সমস্যাটা কেবল ভুল লোকদের হাতে ফর্দ তৈরির দায়িত্ব থাকার মধ্যে ছিলনা। পার্টি-অ্যাকটিভিস্টদের মধ্যে বদমাশ লোক যত ছিল, তার থেকে বেশি সৎ নিষ্ঠাবান লোক ছিল। সমস্যাটা ছিল এখানেই যে এমন ফর্দের অবতারণাই ছিল অন্যায় ও অমঙ্গলকর। কাকে সে ফর্দে ঢোকানো হবে কি হবে না তা তর্কের বিষয় হতে পারেনা। আইভান নির্দোষ— পিওতরও তার চেয়ে কম নির্দোষ নয়। তিনি কে যিনি গোটা দেশের জন্য গ্রেফতার করার সংখ্যাটা নির্ধারণ করতেন? সমগ্র পরিকল্পনাটা কে ছকতেন? কে তাতে সই করে সরকারি মান্যতা দিত?

পরিবারের পিতারা যখন প্রায় সবাই কারাগারে, তখন, ১৯৩০ সালের গোড়ায়, রাষ্ট্রকর্তারা পরিবারের অন্যদেরও চেঁছেপুঁছে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল। কিন্তু এই কর্ম কেবল ওজিপিইউ-র দ্বারা নিষ্পন্ন করা সম্ভব ছিলনা, তাই পার্টি-অ্যাকটিভিস্ট-দেরও এই কাজে জোতা হল। পার্টি-অ্যাকটিভিস্টরাও তো

অন্যদেরই মতো গ্রামের একজন, সকলের সঙ্গেই তো তাদের জানাশোনা, কিন্তু তারা যেন সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধি সব খুইয়ে বসল। তাদের দেখে মনে হত তারা যেন এক ঘোরের মধ্যে আছে, কোনও জাদুমন্ত্র যেন তাদের বশ করেছে, নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা আর তাদের নেই। বন্দুক উঁচিয়ে তারা মানুষকে ভয় দেখাত। ছোট ছোট শিশুদের তারা 'কুলাক বেজন্মা' বলে গাল পাড়ত। 'তোরা রক্তচোষা! রক্তচোষার দল!' বলে তারা হুঙ্কার করত। আর সেই 'রক্তচোষা'-রা তখন কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে— ধমনীতে তাদের দুয়েক ফোঁটা রক্তও অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। অ্যাকটিভিস্ট-দের চোখের দিকে তাকালে মনে হত যেনবা তা কাঁচের তৈরি, যেনবা তা মানুষের নয়, বিড়ালের চোখ। অথচ তারা তো প্রধানত আমাদেরই গ্রামের লোক। তারা নিশ্চয়ই কোনও জাদুর বশে নিজেদের হারিয়েছিল। তারা নিজেদের বুঝিয়েছিল যে কুলাকরাই হল সমস্ত অমঙ্গলের উৎস, কুলাকদের ছোঁয়াও এড়িয়ে চলা উচিত। 'ওই পরজীবী'-দের সঙ্গে একত্রে খেতে বসতেও তারা অস্বীকার করত। কুলাকদের গামছাপাতি সব নোংরা, কুলাকদের শিশুরা ঘৃণ্য, কুলাক তরুণীরা রক্তচোষা উকুনেরও অধম। যাদের কাছ থেকে সমস্ত সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হত, অ্যাকটিভিস্টদের চোখে তারা ছিল গরু-গাধা-শুয়োরের সমতুল্য। কুলাক মানেই শয়তানির আখড়া— তারা নিজেরা শয়তান, তাদের কোনও হৃদয়বৃত্তি নেই, তারা পূতিগন্ধময়, তারা যৌনরোগের ডিপো, আর তারও চেয়ে যা খারাপ তা হল এই যে তারা অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে তাই তারা জমগণের শত্রু। দরিদ্রজন, কোমসোমল-সদস্য আর পুলিশ— এরা প্রত্যেকে চাপায়েভের মতো এক একজন নায়ক। বাস্তবে অবশ্য এই অ্যাকটিভিস্টদের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যেত যে তারা নিতান্তই কাঁচা ও অনভিজ্ঞ, আর বেশ কিছু জন হল নিখাদ বদমাশ।

ওই সমস্ত কথা আমার উপরেও প্রভাব ফেলত। আমি তখন নিতান্তই এক কিশোরী— সভাসমিতিতে, বিশেষ সংক্ষিপ্তসার-জ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, বইপত্রে, নিবন্ধে ও বেতার-সম্প্রচারে, স্বয়ং স্তালিনের মুখ থেকে সবসময় একই কথা শুনতাম, শুনতাম যে কুলাকরা হল পরভোজী, কুলাকরা রুটি পুড়িয়ে নষ্ট করে, কুলাকরা শিশুদের হত্যা করে। জনগণের রোষ তাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে— হ্যাঁ, ঠিক এই কথাগুলোই বলা হত; ঘোষণা করা হত যে শ্রেণি হিসাবে কুলাকদের ধ্বংস করতে হবে, একজন শয়তানকেও ছাড় দেওয়া যাবে না... এই কথাগুলো আমাকেও বশ করতে লাগল। মনে হতে লাগল যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই কুলাকদের দোষে ঘটছে; এই কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে সবার

জন্য সুখের দিনের উদয় ঘটবে। কুলাকদের প্রতি কোনও দয়া দেখানো চলবে না। তারা এমনকি মানুষের পদবাচ্য নয়, কে জানে তারা কী— পশুজাতীয় কিছু হবে বুঝি। আর আমিও একজন অ্যাকটিভিস্ট হয়ে উঠলাম। আমাদের অ্যাকটিভিস্টদের মধ্যে সব ধরনের লোকই ছিল। এমনজনরা ছিল যারা প্রকৃতই বিশ্বাস করত, ঘৃণা করত 'পরজীবী'-দের আর দরিদ্রতম কৃষকদের জন্য যথাসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করত; আবার এমনজনরা ছিল যারা কেবল নিজেদের স্বার্থপর লক্ষ্য দ্বারা চালিত হত; আর বাকিরা— যারাই সংখ্যাগুরু— ছিল নিতান্তই হুকুমপালক, নির্দেশ করা হলে তারা নিজের বাবা-মা-কেও পিটিয়ে মেরে ফেলতে প্রস্তুত ছিল। কুলাকদের ধ্বংস করতে পারলেই সর্বজনের সুখী জীবন শুরু হবে বলে যারা বিশ্বাস করত, এই নানা ধরনের মধ্যে তারাই সবচেয়ে ভয়ানক ছিল না— দেখতে সবচেয়ে বুনো এমন জন্তুই সর্বদা সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়না। সবচেয়ে ভয়ানক ছিল তারা যারা নিজেদের স্বার্থপর লক্ষ্যের দ্বারা চালিত হত। তাদের মুখে রাজনৈতিক সচেতনতার বুলি ঝরত অবিরাম— আর সেই বুলি আওড়াতে আওড়াতেই তারা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটাত, চুরি করত, লুট করত, অপরের জীবন ধ্বংস করত। নেহাত এক পাটি জুতো বা এমনই কিছু ছোটখাট বিষয়আশয় হস্তগত করার জন্য তারা অপরকে ধ্বংস করত। ধ্বংস করা তো ছিল খুবই সহজ কাজ: দোষ বা অপরাধ চিহ্নিতকরণের একটা বয়ান লিখে জমা করে দাও, নিজের নামও তাতে সই না করলে চলবে। কেবল বলে দাও যে তোমার পড়শি তিনটে গরুর মালিক, বা সে কাজের জন্য লোক ভাড়া করেছে— ব্যস, তুমি তাকে কুলাক বানিয়ে দিতে পারলে। কী ঘটে চলেছে তা আমার চোখে পড়ত, আর আমার মনে অশান্তি দেখা দিত— কিন্তু তা কোনও গভীর প্রভাব ফেলত না। খামারের কোনও গরুকে বেঠিকভাবে কোতল করলে যেমন হতে পারে আরকি— তাও আমার মনে অশান্তি তৈরি করত— কিন্তু তা নিয়ে আমার ঘুম ছুটে যেত না।...

আজ যখন আমি পিছন ফিরে দেখি, কুলাকদের নির্মূল করার বিষয়টা আমার কাছে অন্যভাবে হাজির হয়। আমি এখন আর কোনও জাদুর বশে নেই। এখন আমি বুঝতে পারি যে কুলাকরাও মানুষ ছিল। কিন্তু সেই সময়ে আমার হৃদয় কেন অমন পাথর হয়ে গিয়েছিল? এত ভয়ঙ্কর কাণ্ড যখন চারদিকে ঘটানো হচ্ছে, আমার চারদিকে যখন এত দুর্ভোগ? সত্যটা হল এই যে তখন আমি তাদের মানুষ বলে মনে করতাম না। 'ওরা মানুষ নয়, ওরা কুলাক, ওরা আবর্জনা!'— এ কথাই বারবার শুনতাম, বারবার এ কথাই সবাই পুনরাবৃত্তি করত। আর এখন ফিরে তাকিয়ে ভাবতে বসলে প্রশ্ন জাগে যে কে প্রথম

কুলাকদের আবর্জনা বলে চিহ্নিত করেছিল। লেনিন? সত্যিই লেনিন করেছিলেন? কী নিপীড়নই না কুলাকদের সহ্য করতে হয়েছে! কুলাকদের হত্যা করার জন্য তারা মানুষ নয় বলে ঘোষণা করা দরকার হয়ে পড়েছিল। ঠিক যেমন জার্মানরা ঘোষণা করেছিল যে ইহুদিরা মানুষ নয়! লেনিন ও স্তালিনও তেমনই ঘোষণা করেছিল: কুলাকরা মানুষ নয়। কিন্তু তা তো মিথ্যা! তারা জনগণ। তারা মানুষ। আমরা সবাই-ই যে মানুষ তা বুঝতে এখন আর আমার কোনও অসুবিধা হয় না।

সুতরাং ১৯৩০ সালের গোড়ায় তারা কুলাকদের পরিবারদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করতে শুরু করল। তা সবচেয়ে উন্মত্ত চেহারা ধারণ করল ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে। পার্টির জেলা কমিটি নিরন্তর তাড়া দিচ্ছিল। শরৎকালের ফসল বোনার সময় আসার আগেই তারা সব কুলাকদের উৎখাত করতে চাইছিল। বলা হচ্ছিল যে তারপর নতুন জীবন শুরু হবে। 'যৌথ সমবায়ের আসন্ন প্রথম শরৎ'-য়ের কথা আমাদের মুখে মুখে ঘুরছিল।

স্বাভাবিকভাবেই, বিতাড়নের দায়িত্ব সঁপা হয়েছিল অ্যাকটিভিস্টদের কমিটির হাতে। কিন্তু কোনও বিশদ নির্দেশিকা তাদের দেওয়া হয়নি। কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় খামারের চেয়ারম্যান বিতাড়নকার্য নির্বাহের জন্য এতগুলো টানাগাড়ি জড়ো করত যে কীভাবে তাদের সদ্ব্যবহার করা হবে কেউ বুঝে উঠতে পারত না। 'সম্পত্তিলোভী কুলাক'-দের কাছে এত সম্পত্তি ছিল না যা টানাগাড়ি ভর্তি করতে পারে, তাই আধ-ফাঁকা টানাগাড়িতে সওয়ার হয়েই তাদের নির্বাসনযাত্রা শুরু হত। অপরপক্ষে অবশ্য আমাদের গ্রামে কুলাকদের পায়ে হাঁটিয়েই নির্বাসনে পাঠানো হত। কাঁথা-কম্বল ও জামাকাপড়, যতটুকু তারা নিজেদের পিঠে বইতে পারে ততটুকু নিয়েই পায়ে হেঁটে তাদের পাড়ি দেওয়ানো হত। রাস্তায় কাদার আস্তরণ এত পুরু যে জুতো বসে গিয়ে পা থেকে খুলে আসত। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। তারা হেঁটে চলেছে লম্বা সারিতে, ক্ষণে ক্ষণে ফিরে ফিরে দেখছে তাদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ির দিকে। তখনও বোধহয় তাদের গায়ে লেগে আছে তাদের ঘরের উনুনের উত্তাপ। ঈশ্বরই জানেন তখন তাদের মনের মধ্যে কী হত! এই ফেলে যেতে হওয়া ঘরেই একদিন তাদের জন্ম হয়েছিল, এই ঘরেই তারা তাদের কন্যার বিবাহ দিয়েছে। তাদের ঘরের উনুনের আঁচ হয়ত এখনও নেবেনি, বাঁধাকপির সুপ হয়তো আধা-রান্না অবস্থায় এখনও পড়ে আছে, খাওয়ার সময় না পাওয়া দুধও হয়তো পড়ে আছে। তাদের বাড়ির উপর চিমনির থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার শীর্ণ রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে। মহিলারা ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ভয় তাদের এতই জবুথবু করে দিয়েছে যে চিৎকার করে

কাঁদতেও পারছে না। কিন্তু আমাদের কী এসে যায়? আমরা যে অ্যাকটিভিস্ট। একপাল হাঁসকে তাড়িয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুভূতির থেকে বেশি কিছু তো আমাদের হওয়া উচিত নয়। আর তাদের পিছন পিছন আসা টানাগাড়িতে সওয়ার করানো হয়েছে অন্ধ মহিলা পেলাগেয়া-কে, অসমর্থ পায়ের জন্য দশ বছর কুটিরের বাইরে বেরতে না পারা বৃদ্ধ দিমিত্রি ইভানোভিচকে, আর শৈশবে কপালে ঘোড়ার লাথি লাগার পর থেকে হতবুদ্ধি জীবন কাটানো নির্বোধ মারুসিয়াকে।

জেলা সদরের কারাগারে আর স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সেটাকে অবশ্য কারাগার বললে অতিরঞ্জন করা হয়, তা ছিল নেহাতই একটা 'লক-আপ'। আর তাতেই ঠেসে পোরা হয়েছিল কুলাকদের দঙ্গলকে— জেলার প্রতিটা গ্রাম থেকে অন্তত এক পল্টনকে ধরে আনা হয়েছিল। আসছিল আরও আরও। তাই সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, স্কুলঘর সবকিছুকে তখন কারাগারে পরিণত করা হচ্ছিল। কিন্তু বেশিদিন এখানে বন্দি করে রাখা হয়নি। কয়েক দিন পরেই তাদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রেলস্টেশনে, যেখানে তাদের জন্য খালি মালগাড়ি অপেক্ষা করছিল। কড়া পাহারায় সেখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল— গ্রামের পরিবারের দাদু-দিদা, মহিলা ও শিশু— পুলিশ ও ওজিপিইউ-র লোকরা তাদের এমনভাবে বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যেনবা ভয়ঙ্কর খুনীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে দলে কোনও পিতা ছিল না, কারণ, মনে আছে নিশ্চয়ই, পিতাদের তো কয়েক মাস আগেই গ্রেপ্তার করে চালান করা হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেখে অন্য মানুষজন নিচু স্বরে বলাবলি করত 'কুলাকদের দল যাচ্ছে', যেনবা তারা কোনও নেকড়ের দলের কথা বলছে। কেউ কেউ আবার চিৎকার করে তাদের গাল পাড়ত। কিন্তু বন্দিদের মধ্যে থেকে কান্না, এমনকি ফোঁপানিরও কোনও আওয়াজ শোনা যেত না, তাদের মুখগুলো যেন পাথর হয়ে গেছে...

ট্রেনযাত্রায় তাদের কী অবস্থা হত তা আমি নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু অন্যরা আমায় বলেছে কী ঘটত তারপর। উরাল পর্বতমালা পেরিয়ে যেখানে এই নির্বাসিত 'কুলাক'-দের শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল, পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষ-অনাহার থেকে পালিয়ে বাঁচতে কিছু গ্রামবাসী নিজেরাই সেখানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তেমনই একজন ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আমায় সেখান থেকে একটা চিঠি লিখেছিল। আর তাছাড়া এমনও কিছু মানুষ ছিলেন তারা তাদের জন্য বরাদ্দ এই বিশেষ শিবির থেকে নজরদারি এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। তেমন দুইজন মানুষের সঙ্গেও আমি নিজে কথা বলেছিলাম।

চারদিক বন্ধ মালগাড়ির বগিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের মালপত্র সব আলাদা বগিতে পোরা হয়েছিল। তাদের নিজেদের সঙ্গে রাখতে দেওয়া হয়েছিল কেবল হাতে করে যা খাবার তারা নিতে পারে। আর মাঝের একটা স্টেশনে আগে গ্রেপ্তার করা পরিবারের পিতাদেরও বগিতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই মালগাড়ির বন্ধ বগির মধ্যেই সেই দিনটা ছিল যুগপৎ বিপুল আনন্দ ও বিপুল অশ্রুর সাক্ষী। এই ট্রেনযাত্রা চলেছিল এক মাসেরও বেশি সময় ধরে— রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই এমন কৃষক-ঠাসা মালগাড়ি পাড়ি দিচ্ছিল আর তার ফলে রেললাইনে যানজট লেগে গিয়েছিল। গরু বহন করতে তৈরি বগিগুলোয় শোওয়ার জন্য কোনও পাটাতন ছিলনা। মেঝের উপরেই ঠাসাঠাসি করে দলা পাকিয়ে সবাইকে ঘুমাতে হত। যাত্রা শেষ হওয়ার আগেই অসুস্থজনেরা মারা গিয়েছিল। কিন্তু তবুও, কমপক্ষে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটুকু করা হয়েছিল। প্রধান স্টেশনগুলোয় থাকত বালতিভর্তি সিদ্ধ মাড়, আর মাথাপিছু ২০০ গ্রাম রুটি।

ওজিপিইউ-র লোক নয়, সাধারণ সেনারাই ছিল পাহারার দায়িত্বে। তারা অতিরিক্ত বিদ্বেষপরায়ন ছিল না, তারা কেবল বন্দি সওয়ারদের গরু-গাধার দঙ্গলের মতো বলেই মনে করত। আমার বান্ধবী তার চিঠিতে এমনটাই লিখেছিল।

আর যাত্রা শেষ হওয়ার পর গন্তব্যে পৌঁছে তাদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাও আমি শুনেছি সেখান থেকে পালানো মানুষদের মুখে। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ সরলবর্গীয় অরণ্যে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যারা বৃদ্ধ বা অসুস্থ, খাটতে অক্ষম, তাদের জঙ্গলের মধ্যে গ্রামে জড়ো করা হয়েছিল, ফলে সে গ্রামের ঘরগুলোও মালগাড়ির বগির মতো ঠাসাঠাসি হয়ে উঠেছিল। বাকি সকলকে নিয়ে গিয়ে মনুষ্যবসতির চিহ্নহীন ঘন তুষার আর জঙ্গলের মধ্যে স্রেফ ফেলে দিয়ে চলে আসা হয়েছিল। তুলনায় দুর্বলরা শীতে জমে মারা গিয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতেও যারা কাজ করতে সক্ষম ছিল তারা গাছ কাটতে শুরু করে। গাছের গোড়া না উপড়িয়ে তারা কাটা কাণ্ডগুলোকে টেনে এনে অস্থায়ী ছাউনি বানাতে শুরু করে। বিরতিহীন, ঘুমহীন তারা এ কাজ চালাতে থাকে যাতে তাদের পরিবারের শীতে জমে মৃত্যু আটকানো যায়। প্রাথমিক ছাউনিগুলো খাড়া করার পরই তারা রয়েসয়ে যথাযথ কাঠের বাড়ি তৈরিতে হাত দেয়। দুটো ঘর নিয়ে এক-একটা কাঠের বাড়ি হত, এক-একটা ঘর এক-একটা পরিবারের জন্য বরাদ্দ হত। বাড়ির ভিত তৈরি করার জন্য শৈবাল ছাড়া আর কোনও

উপকরণ তারা পায়নি, বাড়ির দেওয়ালের কাঠের গুঁড়িগুলোর মধ্যের ফাঁক বোজানোর জন্যও তারা ওই শৈবালই ব্যবহার করত।

এরপর যারা কাজ করার মতো দৈহিক অবস্থায় ছিল, রাষ্ট্রীয় কাঠচেরাই সংস্থা তাদেরকে ওজিপিইউ-র কাছ থেকে 'কিনে' নেয়। রাষ্ট্রীয় কাঠচেরাই সংস্থা তাদের কাজের সব সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল এবং পরিবারসহ তাদের জন্য রেশন সরবরাহ করত। তাদের গড়ে তোলা ঘরগুলোরই নাম হয়েছিল 'শ্রমশিবির', আর একজন 'কম্যান্ডান্ট' ও তার অধীন 'ফোরম্যান'-দের দল নিযুক্ত হয়েছিল তাদের উপর তত্ত্বাবধান ও নজরদারি করার কাজে। আপাতভাবে, এই তত্ত্বাবধায়কদের মাইনে শ্রমিকদের মাইনের সমান ছিল, যদিও তত্ত্বাবধায়কদের মাইনের হিসাবনিকাশ বিশেষ আলাদা খাতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের লোকেরা শারীরিকভাবে সবল, অচিরেই তারা স্থানীয়দের চেয়ে বেশি উপার্জন করতে শুরু করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের একটা গণ্ডির মধ্যে থাকতে হত— শ্রমশিবির এবং গাছকাটা-কাঠচেরাইয়ের এলাকার বাইরে তাদের যেতে দেওয়া হত না। পরবর্তীকালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে তাদের যাতায়াতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এরপর যখন 'যুদ্ধকালীন শ্রমনায়ক'-দের এলাকার বাইরে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, তখন তাদের কেউ কেউ দেশের মধ্যে যাতায়াতের পাসপোর্টও পেয়েছিল।

আমার বন্ধু বলেছিল যে দৈহিক কঠিন পরিশ্রম করতে অক্ষম বলে নির্ধারিত করা মানুষদের নিয়ে একটা 'শ্রম কলোনি' গড়ে তোলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে তারা স্বনির্ভর। তাদের হাতে কিছু বীজ তুলে দেওয়া হয়েছিল ধার হিসেবে এবং তা বুনে প্রথম ফসল ওঠার সময় অবধি খোরাকি হিসাবে কিছু রেশন তুলে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া শ্রমশিবিরগুলোর সঙ্গে তাদের আর কোনও পার্থক্য ছিল না— কম্যান্ডান্ট ও প্রহরীরা তারও তত্ত্বাবধান ও নজরদারিতে নিযুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এগুলোকে 'সমবায়' নাম দেওয়া হয়— কম্যান্ডান্ট তখনও ছিল, কেবল তার অধীনে কৃষকদের নিজেদের প্রতিনিধি বেছে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামগুলোয় নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। কুলাক যখন আর কেউ নেই, সকলকে রাষ্ট্রীয় খামারে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সভাগুলো অন্তহীন অভিশাপবর্ষণ আর চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলত রাতভোর। কিছু মানুষ খামারে যোগ দিতে অস্বীকার করছিল, আবার কেউ কেউ বলছিল যে খামারে তারা যোগ দিতে পারে কিন্তু তাদের গরুগুলোকে তারা খামারের হাতে তুলে দেবে না। এর পর এল 'প্রাভদা'-য় ছাপা স্তালিনের প্রবন্ধ 'সাফল্যে মাথা

ঘুরে যাওয়া'। আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মানুষ প্রতিবাদ করতে লাগল, 'তোমরা আমাদের জোর করে খামারে ঢোকাতে পার না, স্তালিন স্বয়ং তাই বলেছে'। খবরের কাগজের টুকরোয় লিখে মানুষ ঘোষণা করতে লাগল, 'আমি খামার ছেড়ে বেরিয়ে স্বাধীন কৃষক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করছি'। কিন্তু দিনকয়েক যেতে না যেতেই পার্টিকর্তারা আবার সবাইকে খামারে ঢোকানোর জন্য জোর প্রয়োগ করতে শুরু করল। উৎখাত করা কুলাকদের পড়ে থাকা সম্পত্তি স্রেফ চুরি হয়ে গেল।

আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে কুলাকদের থেকে খারাপ পরিণতি আর কারও হতে পারে না। কত না ভুল ছিল সেই ভাবনা! গ্রামের সবার উপরই কোপ পড়তে শুরু করল— যত বড়ই হোক বা যত ছোটই হোক, কেউ রেহাই পেল না।

এখন শুরু হল খিদেয় পুড়িয়ে মারা।

তখন আমি হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করছি, সাফাইকারীর পদ থেকে আমার উন্নতি হয়েছে। একজন অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে আমাকে ইউক্রেনের গ্রামে পাঠানো হল যৌথ খামার 'শক্তিশালী' করার জন্য। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে রাশিয়ার থেকে ইউক্রেনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি টান অনেক বেশি। হয়ত হবেও বা। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে ইউক্রেনিয়রা রুশদের থেকে অনেক বেশি কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। খুব দূরে আমায় পাঠানো হয়নি। আমার নিজের গ্রাম ছিল ইউক্রেনের সীমান্তের উপর, আর সেখান থেকে ঘন্টা তিনেকের পথ পেরোলেই এই রাষ্ট্রীয় যৌথ খামার। জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অসাধারণ, আর মানুষরা অন্য সব জায়গার সাধারণ মানুষদেরই মতো। আমি তাদের খামারের হিসাবরক্ষক নিযুক্ত হলাম।

ওখানে যা যা ঘটেছিল তার সবই আমি জানতে পেরেছিলাম বলে মনে হয়। সেই বৃদ্ধ হিসাবরক্ষক যে আমার সরকারি মন্ত্রী হওয়া উচিত বলেছিল তা অকারণে নয়। একথা আমি বলছি কেবল এই কারণে যে তোমার কাছে আমি সবকিছু খুলেমেলে বলছি— নিজের ঢাক নিজে পেটানো আমার স্বভাব নয়। সমস্ত হিসাবপত্র রাখার জন্য আমার এমনকি কাগজে লেখালেখিরও খুব দরকার হত না— সবকিছুই আমার মাথার মধ্যে সাজানো থাকত। আর যখন আমাদের প্রশিক্ষণ অধিবেশন চলত, আমাদের ওখানকার 'ত্রয়কা' বৈঠকে বসত বা আমাদের ঊর্ধতনেরা অতিরিক্ত সুরাপানে প্রগলভ হয়ে উঠত, তাদের প্রতিটা কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে যেত।

কীভাবে ঘটল সবকিছু? কুলাকদের সম্পত্তিহরণ করে উচ্ছেদ করার পর, চাষের অধীন জমির পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গেল, তেমনই কমে গেল ফসল উৎপাদনের হারও। কিন্তু বারবার সবার প্রতিবেদনে এই কথাটাই আওড়ানো হতে থাকল যে কুলাকদের অবর্তমানে আমাদের জীবন অবিলম্বেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গ্রামের সোভিয়েত মিথ্যা বলত জেলা সোভিয়েতের কাছে, জেলা সোভিয়েত মিথ্যা বলত প্রদেশ সোভিয়েতের কাছে, আর প্রদেশ সোভিয়েত মিথ্যা বলত মস্কোর কাছে। সবাই চাইত যাতে স্তালিনকে এই ধারণার মধ্যে তুষ্ট রাখা যায় যে তাঁর রাজত্বের প্রতি কোণায় সুখী জীবনের উন্মেষ ঘটেছে আর কিছু দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় খামারের উৎপাদিত শস্যের ঢল প্লাবন ঘটিয়ে দেবে। এরপর এল রাষ্ট্রীয় খামারের প্রথম ফসল কাটার মরসুম। উপর থেকে দেখলে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে সর্বত্র। প্রতিটা প্রদেশ থেকে কত শস্য মস্কোর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে সেই 'কোটা' মস্কো নির্ধারণ করে দিল। আর তার ভাগে আমাদের গ্রামের খাতে যে 'কোটা' বরাদ্দ করা হল তা কেবল ওই বছর কেন, দশ বছরেও পূরণ করা সম্ভব নয়। গ্রাম সোভিয়েতের প্রতিটা সদস্য উদ্বিগ্ন আতঙ্কিত হয়ে উঠল, যারা মদ ছুঁত না তারাও মদ্যপানের আশ্রয় নিল। সন্দেহ ছিল না যে মস্কো তার প্রত্যাশার সিংহভাগটাই চাপিয়েছে ইউক্রেনের ঘাড়ে। আর তাই প্রত্যাশাভঙ্গের রোষটাও সবার চেয়ে ইউক্রেনের উপরই বর্ষিত হবে বেশি। সবাই খুব ভালোই বুঝে গিয়েছিল: মস্কোর পরিকল্পনা পূরণ করতে যদি তুমি ব্যর্থ হও, তাহলে স্বয়ং তুমিই কুলাক এবং অনেকদিন আগেই তোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

অবশ্য মস্কোর পরিকল্পনা পূরণ করা ছিল অসম্ভব। চাষের এলাকা কমেছে, উৎপাদনও কমেছে। তাহলে কোথায় গেল রাষ্ট্রীয় খামারে উৎপাদিত শস্যের সেই বহু-প্রতিশ্রুত সাগরঢল? নির্ঘাত তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে! এখনও নিশ্চিহ্ন না হওয়া কুঁড়ে পরজীবী কুলাক শয়তানদের কর্ম নিশ্চয়! কুলাকদের উৎখাত করে বিতাড়ন করা হলেও তাদের মন-মানসিকতা নিশ্চয়ই এখনও গেঁড়ে বসে আছে! ইউক্রেনিয় কৃষকরা নিশ্চয়ই এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহে বাঁধা পড়ে আছে!

শস্যসংগ্রহের ডিক্রি কে সই করেছিল? কে নির্দেশ দিয়েছিল এই গণহত্যার? সত্যিই স্তালিন? আমি নিজেকে প্রায়ই প্রশ্ন করি। আমার মনে হয় রাশিয়ার গোটা ইতিহাসে এমন ডিক্রির আর উদাহরণ পাওয়া যাবে না। না কোনও জার, না কোনও তাতার বা ফ্যাসিবাদী জার্মান কখনও এমন ডিক্রি জারি করেছে। এই ডিক্রির অর্থ ছিল ইউক্রেন, ডন ও কুবান প্রদেশের কৃষকদের অনাহারে দগ্ধে

মারা। কৃষকদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের গণহত্যা। এমনকি তাদের বীজ করার জন্য রাখা শস্যটুকুও বাজেয়াপ্ত করে কেড়ে নিতে বলা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের দল এমনভাবে এই শস্যের তল্লাশি চালিয়েছিল যেন তারা লুকানো বোমা ও মেশিনগানের খোঁজ করছে। বেয়নেট ও লোহার রড মাটিতে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তারা দেখত, ঘরের মেঝে চটিয়ে ফেলে তার নিচে খুঁড়ে দেখত, ঘরের লাগোয়া সবজি-বাগানের মাটি খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেখত। কখনও কখনও তারা কৃষকের কুটিরের মধ্যে পাত্রাদিতে রাখা খোরাকির কয়েকমুঠো শস্যও বাজেয়াপ্ত করত। একজন মহিলা কিছু রুটি ঘরে বানিয়ে রেখেছিলেন, তাও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। সেই রুটিগুলোও বাজেয়াপ্তকরণের ঠেলাগাড়িতে তুলে জেলাদপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

দিন নেই, রাত্রি নেই, বাজেয়াপ্তকরণের ঠেলাগাড়ি ককিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে, ধুলোর মেঘ ঝুলে আছে বাতাসে— শস্যাগার সব ভরে গেছে, আর জায়গা নেই। ফাঁকা মাটির উপর শস্য ডাঁই করে তার চারদিকে বন্দুকধারী প্রহরী মোতায়েন করা হত। শীতকালের আগমনীতে সেই ডাঁই করা শস্য স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে, পচন ধরেছে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া শস্য ঢাকা দিয়ে রাখার মতো যথেষ্ট ত্রিপলও জোগাড় করতে পারেনি।

শস্য চালানের কাজ যখন চলছে, গোটা গ্রামের যেখানেই যাও না কেন, কেবল ধুলো আর ধুলো। ধুলোর মেঘ যেন জমে রয়েছে, ছড়িয়ে পড়ছে গোটা গ্রামে, মাঠেঘাটে, ছেয়ে দিচ্ছে রাতের চাঁদের মুখকেও। মনে আছে গ্রামের একজন মনের ভারসাম্য হারিয়ে বসেছিল, সে খালি আর্তনাদ করত, 'আগুন লেগে গেছে! আকাশ পুড়ছে! মাটি পুড়ছে!' না, আকাশ বা মাটি নয়, মানুষের জীবনটাই পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে আমার বোধোদয় হয়েছিল: সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেবল তাদের পরিকল্পনা। পরিকল্পনা পূরণ কর! তোমার জন্য নির্ধারিত শস্যের কোটা জমা কর! রাষ্ট্রই সব, মানুষ কিছু নয়।

মা আর বাবারা তাদের সন্তানদের জীবনরক্ষা করতে চাইত, তাই অল্প কয়েকমুঠো শস্য তাদের মুখে তুলে দেওয়ার জন্য সরিয়ে রাখতে চাইত। তাদের ভর্ৎসনা করা হত, 'সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমিকে তোমরা ঘৃণা কর! অত্যন্ত হিংস্র তোমাদের ঘৃণা! রাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তোমরা অন্তর্ঘাত চালাতে চাও! ঘৃণ্য কীট ছাড়া আর কিছু নও তোমরা! কুলাকেতর পরজীবীর বিষঝাড় সব!' কিন্তু কোনও পরিকল্পনায় অন্তর্ঘাত ঘটানো তাদের ভাবনায় ছিল না, তারা কেবল

তাদের সন্তানদের বাঁচাতে চেয়েছিল, নিজেরা বাঁচতে চেয়েছিল। যে যাই হোক না কেন, বাঁচতে হলে তো খেতে হয়।

আমি তোমায় কেবল সেই কাহিনি বলতে পারি, কিন্তু কাহিনি তো কেবল কিছু শব্দ বৈ আর কিছু নয়— আর তা ছিল জীবন-মরণের বিষয়, নির্যাতনের বিষয়, না খেতে পেয়ে মরার বিষয়। যখন শস্য অধিগ্রহণ চলছিল, ঘটনাক্রমে পার্টির অ্যাকটিভিস্টদের বলা হয়েছিল যে কৃষকদের খাদ্য রাষ্ট্রই সরবরাহ করবে। মিথ্যা বলা হয়েছিল। একটি শস্যকণাও ক্ষুধার্তদের দেওয়া হয়নি।

কারা শস্য অধিগ্রহণের কাজ করেছিল? মূলত স্থানীয় লোকজনরাই করেছিল: জেলাপ্রশাসনের কার্যনির্বাহী কমিটি ও জেলা পার্টি কমিটির লোকজন, কোমসোমলের তরুণরা, সবাই-ই এলাকার লোক; পুলিশ আর, অবশ্যই, ওজিপিইউ। কিছু কিছু জায়গায় সেনাকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। আমি কেবল একজনকে দেখেছিলাম যে মস্কো থেকে এসেছিল। পার্টি তাকে মস্কো থেকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে ইউক্রেনে পাঠিয়েছিল। সে যে খুব উৎসাহী ছিল এমন মনে হয়নি, সে বরং ঘরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেত।... আবারও একবার সেই রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠার সময়ের মতো লোকগুলো হতবুদ্ধি, অপ্রকৃতিস্থ, হিংস্র জন্তুর মতো হয়ে উঠেছিল।

গ্রিশা সায়েঙ্কো পুলিশে কাজ করত। স্থানীয় একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল আর কাজের ছুটিতে সে গ্রামে আসত, গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিত। সে ছিল উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। ট্যাঙ্গো আর ওয়ালটজ নাচে সে ছিল পারদর্শী, আর ইউক্রেনের গ্রামের সমস্ত গানও ছিল তার জানা। একদিন পক্কেশ এক বৃদ্ধ তাকে গিয়ে বলেছিল, 'গ্রিশা, তোমরা আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিচ্ছ। তোমরা যা করছ তা খুন করার চেয়েও খারাপ। শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্র কেন তার কৃষকদের সঙ্গে জারদের থেকেও খারাপ আচরণ করবে?' গ্রিশা অবজ্ঞায় ধাক্কা মেরে বৃদ্ধ মানুষটিকে সরিয়ে দিয়ে হাত-পা ধোয়ার উদ্দেশ্যে কুয়োর দিকে এগোতে এগোতে বলেছিল, 'গা-ঘিনঘিনে পরজীবী পোকাকে যে হাতে ছুঁয়েছি সে হাতে এখন খাওয়ার চামচ ধরব কী করে?'

ধুলো আর ধুলো। শস্য অধিগ্রহণ চলছে আর দিন-রাত এক করে কেবল ধুলো উড়ছে। আধখানা আকাশ জুড়ে নিরেট পাথরের মতো চাঁদ আকাশে ঝুলে থাকে। সেই চাঁদের নিচে সমস্তকিছুকেই অদ্ভুত আর বুনো বলে মনে হয়। রাতগুলোয় গরমে হাঁফ ধরে, যেনবা ভেড়ার চামড়ার কম্বলের নিচে চেপে রেখেছে কেউ। আর চাষের মাঠগুলো— পদদলিত, পদদলিত এবং আবারও

পদদলিত হয়েছে যারা— তাদের উপর চোখ পড়লেই মৃত্যুদণ্ডের রায় পড়ার মতো অনুভূতি জাগে।

মানুষ মনের ভারসাম্য হারাতে লাগল। গরুগুলো ডাকে, বিষণ্ণ প্রলম্বিত ডাক, তারা মানুষকে ভয় পেতে শুরু করেছে, নিস্তেজ হয়ে উঠছে ক্রমশ। সারা রাত ধরে কুকুরগুলো আর্তনাদ করে। আর তাপে মাটিতে ফাটল ধরতে শুরু করে। তারপর এল শরৎ। এল শরতের বৃষ্টি। তারও পর এল বরফঢাকা শীত। আর তখনও কোনও রুটি এল না।

জেলাসদরের বিপণিতে বিক্রির জন্য কোনও রুটি ছিল না— যাদের রেশন কার্ড আছে রুটি কেবল তাদের জন্য। রেলস্টেশনের দোকানেও তা তুমি কিনতে পারবে না— বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া সশস্ত্র প্রহরীরা তোমায় স্টেশনের ধারেকাছেই ঘেঁষতে দেবে না। কোনও খানে কোনও মূল্যের বিনিময়েই তুমি রুটি কিনতে পারবে না।

শরতে মানুষরা শুধু আলু খেয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করল— রুটি ছাড়া শুধুই আলু। বেশি সময় লাগল না আলু ফুরিয়ে যেতে। খ্রিস্টমাস নাগাদ তারা তাদের গরুগুলোকে জবাই করতে শুরু করল— কিন্তু গরুগুলোও তো তখন চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। মুরগিগুলোকেও তারা জবাই করল অবশ্য। কিছুদিনের মধ্যেই মাংসের এমন সমস্ত উৎস শেষ হয়ে গেল। আর গ্রাম ঢুঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা দুধ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না একটা ডিমও। আর সবচেয়ে খারাপ হল, না আছে কোনও শস্য, না আছে রুটি। শস্যের শেষ কণাটি অবধি অধিগ্রহণ করে নিয়ে গেছে। বসন্ত এলে মাঠে গম বোনার জন্যও কোনও বীজ থাকবে না, বীজভাণ্ডার পুরোটাই অধিগ্রহণের গ্রাসে গেছে। শীতের গম ফসলটাই মানুষের ভরসা ছিল, কিন্তু তা এখনও বরফের চাদরের নিচে চাপা পড়ে আছে। বসন্তের আগমনীর কোনও চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে না, ইতিমধ্যেই গ্রামে অনাহার জাঁকিয়ে বসেছে। যা মাংস ছিল মানুষ খেয়ে ফেলেছে। যা জোয়ারদানা ছিল খেয়ে ফেলেছে তাও। আলুও প্রায় শেষ হতে বসেছে— বড় পরিবারগুলোয় শেষই হয়ে গেছে।

শস্য ধার চেয়ে মানুষ ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগল। গ্রাম সোভিয়েতের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করল, জেলা কমিটির কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করল। কেউ জবাবে একটা শব্দও খরচ করল না। তবে কি জেলা সদরে যেতে হবে, কিন্তু তা তো ১৯ কিলোমিটার দূরে, আর গ্রামে একটা ঘোড়াও অবশিষ্ট নেই।

সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা। মায়েরা তাদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠত। যেনবা ঘরে বিষধর সাপ সেঁধিয়েছে! হ্যাঁ, তার সাপকেই

দেখেছিল, তারা দেখেছিল দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু। কী করতে পারত তারা? গ্রামের কারও পক্ষেই খাবার ছাড়া অন্যকিছুর কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। মানুষ খালি মুখে জিভটাকেই শুষত আর চোয়াল নাড়াচাড়া করত। থুতু উঠে আসত আর সেই থুতুই তারা গিলত— কিন্তু থুতু গিলে তো আর পেট ভরে না। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কোথাও কোনও শব্দ কানে আসত না। কোথাও কেউ কথা বলছে না, কোথাও কোনও অ্যাকর্ডিয়নে কেউ সুর তুলছে না। কবরের নিস্তব্ধতা। কোনও পদশব্দ নেই কেবল দুর্ভিক্ষের পদশব্দ ছাড়া— দুর্ভিক্ষ কখনও ঘুমায় না। ভোরের আলো ফুটলেই প্রতিটা ঘরে শিশুরা রুটি চেয়ে কাঁদতে শুরু করত। কিন্তু মায়েরা তাদের মুখে কী তুলে দেবে? বরফের তাল? কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনও আশা ছিল না। পার্টির কর্তাব্যক্তিরা কেবল একই কথা আউড়ে যেত: 'আগে খেয়াল হওয়া উচিত ছিল— তখন অত আলসেমি না করলেই পারতে, তখন আরও গতর খাটালে পারতে!' কখনও কখনও এর সঙ্গে জুড়ে দিত: 'চারদিকে টুঁড়ে দেখ না কেন! আসছে তিন বছর চলে যাওয়ার মতো শস্য তো মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছ!'

তবুও সেই শীতকালে দুর্ভিক্ষ তখনও তার প্রকৃত চেহারা ধারণ করে নি। অবশ্য মানুষজন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কেবলমাত্র উচ্ছিষ্ট ও খোসাপত্র খেয়ে তাদের পেট ফুলে উঠছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে উদরী-রোগের প্রকোপ তখনও শুরু হয়নি। জমাট বরফ খুঁড়ে ওক ফল বা বীজ সংগ্রহ করছিল তারা। প্রথমে সেগুলোকে শুকোতে দিত। তারপর পেষকযন্ত্রের পাথরগুলোর মধ্যে ফাঁক বাড়িয়ে তাতে সেগুলোকে গুঁড়ো করে আটা তৈরি করত। সেই আটা দিয়ে চ্যাপ্টা রুটি তৈরি করত। কেউ কেউ তাতে ভুষি বা থেঁতলানো আলুর খোসাও মিশিয়ে নিত। কিন্তু ওকগাছের জঙ্গলটা ছিল নেহাতই ছোট আর তিনটে গ্রামের মানুষ তার উপর হামলে পড়েছিল, ফলে ওক ফল কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে শহর থেকে আসা এক পার্টিকর্তা গ্রাম-সোভিয়েতে আমাদের বলেছিল, 'দেখ এই পরজীবীগুলো কেমন হয়! ওক ফলের জন্য খুঁড়ে বেড়াচ্ছে! খালি হাত দিয়েই বরফের নিচে খুঁড়ছে! পরিশ্রম এড়ানোর জন্য কী না এরা করতে পারে!'

উঁচু ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা প্রায় শরৎকাল অবধি স্কুলে যাওয়া বজায় রেখেছিল, যদিও নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তা বন্ধ করেছিল শীতের সময়েই। আর শরৎকালে স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল, শিক্ষক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেল। চিকিৎসা-সহযোগীও চলে গেল, তারও আর খাবার জুটছিল না। কোনও ওষুধ দিয়ে তো আর খিদের চিকিৎসা করা যায়না! সবার দ্বারা পরিত্যক্ত গ্রাম পড়ে

রইল— ঘরে ঘরে প্রতিটা মানুষ অনাহারে, আর চারদিক মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। শহর থেকে কর্তাব্যক্তিদের যাতায়াতও বন্ধ হল। ভুখা মানুষগুলোর কাছ থেকে তো ছিনিয়ে নেওয়ার মতো আর কিছু নেই, সুতরাং গ্রামে আসার আর দরকার কী? সেখানে কোনও শিক্ষকেরও আর কিছু শিক্ষা দেওয়ার নেই, চিকিৎসা-সহায়কেরও আর কোনও কাজ নেই। তোমাকে নিঙড়ে যা কিছু বের করা সম্ভব তা যখন রাষ্ট্র নিঙড়ে নিয়ে নিয়েছে, তখন রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজনে আর তুমি লাগবে না। সুতরাং তখন তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার বা তোমার রোগ উপশম করার কোনও দায় রাষ্ট্রের নেই।

রাষ্ট্র গ্রামবাসীদের পরিত্যাগ করে চলে গেল। গ্রামের মধ্যে মানুষ এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে একে অপরের কাছে ভিক্ষা চেয়ে ঘুরত। দরিদ্রজন হাত পাতত দরিদ্রজনের কাছেই, অনাহারী হাত পাতত অনাহারীর কাছেই। বড় পরিবারের মানুষ হাত পাতত ছোট পরিবারের মানুষের কাছে, সন্তানহীন পরিবারের মানুষের কাছে। শরতের গোড়ায় তখনও কিছু মানুষের কাছে অল্প কিছু পড়ে ছিল, একমুঠো ভুষি বা দুয়েকটা আলু তারা অন্যকে দিতও। কিন্তু পার্টি সদস্যরা কখনওই কাউকে কিছু দিত না— তা এ কারণে নয় যে তারা অতীব লোভী বা অতীব খারাপ, তা নেহাত এই কারণে যে তারা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। আর রাষ্ট্র এই অনাহারী মানুষদের কাউকে একটা গমের কণাও দেয়নি— যদিও এই মানুষদের ফলানো গমের উপরই তার ভিত দাঁড়িয়েছিল। স্তালিন কি এই সমস্তকিছু সম্পর্কে জানতেন? বয়স্কজনেরা জারের সময়ে হওয়া দুর্ভিক্ষের কথা স্মৃতিচারণ করত। তখনও তারা সাহায্য পেয়েছিল। তাদের ধার দেওয়া হয়েছিল। কৃষকরা শহরে গিয়ে শহরবাসীদের কাছ থেকে খ্রিস্টের দোহাই পেড়ে ভিক্ষা করেছিল। তাদের জন্য সুপ-বিতরণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল আর ছাত্রছাত্রীরা চাঁদা তুলে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজ শ্রমিক-কৃষকের সরকারের শাসনকালে কেউ তাদের একদানা গম নিয়ে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসেনি। তার উপর গ্রাম থেকে বেরোনো প্রতিটা রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে— সেনা, পুলিশ এবং ওজিপিইউ-র লোকেরা পাহারা বসিয়েছে। অনাহারীদের গ্রামেই থাকতে হবে, পায়ে হেঁটে শহরে যাওয়াও চলবে না। প্রতিটা রেলস্টেশনকে ঘিরেও এমন পাহারা বসেছে, এমনকি সবচেয়ে ছোট গঞ্জ স্টেশনটিও বাদ যায়নি। জাতিকে যারা খাদ্য সরবরাহ করেছে তাদের জন্যই আজ কোনও রুটি নেই। আর শহরে শ্রমিকরা তাদের রেশন কার্ড পিছু দৈনিক ৮০০ গ্রাম রুটি পাচ্ছে। আ-টু-শো-গ্রা-ম! অনাহারীদের কল্পনাতেও আঁটে না! গ্রামের কৃষক শিশুদের জন্য এক গ্রামও বরাদ্দ হয়নি। নাজিরা যখন ইহুদি শিশুদের 'ঈদের দল, তোদের বাঁচার

অধিকার নেই' বলে গ্যাস চেম্বারে পোরে, এ তার থেকে আর আলাদা কী? তবু বোঝা ভার! এ তো সোভিয়েত মানুষের বিরুদ্ধে সোভিয়েত মানুষ, রুশের বিরুদ্ধে রুশ, আর এসব এক শ্রমিক-কৃষকের সরকারের অধীনে! কেন এই গণহত্যা?

বরফ যখন গলতে শুরু করল, তখন শুরু হল খিদের আসল প্রকোপ।

শিশুরা কেঁদেই চলেছে। তারা আর ঘুমায় না, রাতেও তারা রুটি চাইতে থাকে। মানুষের মুখ ছাইরঙে ছেয়েছে, চোখ হয়ে উঠেছে ঘোলাটে, ঘোর ধরে থাকে মাতালের মতো। আধা ঘুমন্ত– আধা জাগ্রত অবস্থায় তারা চলা ফেরা করে একহাত দিয়ে দেওয়ালে ভর করে, এক পা এক পা করে সাবধানে ফেলে, পায়ের নিচের মাটি ভালোভাবে ঠাহর করে। খিদে তাদের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। ক্রমশ মানুষরা চলাচল কমিয়ে আরও বেশি বেশি সময় শুয়ে কাটাতে লাগল। মাঝেমধ্যেই তারা কল্পনায় রাস্তায় টানাগাড়ির চাকার শব্দ শুনে ধরফরিয়ে ওঠে— স্তালিন বোধহয় জেলাসদর থেকে আটা পাঠিয়েছে তাদের শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য— ভুল ভাঙলে আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দেখা গেল যে পুরুষদের থেকে মহিলারা শক্ত বেশি, একরোখাও বেশি; শক্ত মুঠিতে তারা জীবনকে আঁকড়ে থাকল। কিন্তু তাদের সইতেও হয় বেশি— খিদের যন্ত্রণায় শিশুরা তো তাদের মায়ের কাছেই বায়না ধরে। কিছু মহিলা তাদের শিশুদের যুক্তিতে ভোলাতে চাইত। শিশুদের গালে চুমো খেয়ে তারা বলত, 'কাঁদে না। সবুর কর। কিচ্ছুটি এখন নেই।' আবার কেউ নিজেরাই ধৈর্য হারিয়ে ফেটে পড়ত: 'ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ কর। নইলে মেরে ফেলব।' আর তারপর হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই বায়না করা শিশুর উপর ঘা বসাত— বায়না স্তব্ধ করার জন্য কোনওকিছুতেই বাঁধত না। কেউ কেউ আবার শিশুদের কান্না যাতে না শুনতে হয় তার জন্য ঘর থেকে পালিয়ে পড়শিদের ঘরে গিয়ে বসে থাকত।

এই সময় নাগাদ একটা কুকুর বা বিড়ালও বেঁচে ছিল না। তাদের সবাইকে জবাই করা হয়ে গেছে। এমন নয় যে তাদের ধরা খুব সহজ ছিল। তখন তারা মানুষদের ভয় করতে শুরু করেছে, বন্য দৃষ্টিতে তারা মানুষদের দিকে তাকাত। জন্তুগুলোকে জবাই করে জলে ফুটিয়ে নেওয়া হত, কিন্তু শুষ্ক পেশীবন্ধ ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকত না। জবাই করা পশুর মাথাটা এক ধরনের মাংসের কাই তৈরি করত।

সুতরাং বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহ ফুলে উঠতে লাগল। এ হল অনাহারের ফলে উদরী-রোগের শুরু। মুখগুলো ফুলে উঠল, পাগুলো

পাশবালিশের মতো হয়ে গেল। পেটে জল জমে উঠল, মুহুর্মুহু পেচ্ছাপ করতে বাইরে ছুটতে হচ্ছিল। আর শিশুদের অবস্থা? তুমি কি সংবাদপত্রে জার্মান বন্দিশিবিরের শিশুদের আলোকচিত্র দেখেছ? ঠিক তেমন দেখতে হয়ে গিয়েছিল: মাথাগুলো কামানের গোলার মতো ভারী; সারসের মতো সরু ছোট গলা; হাত-পায়ের প্রতিটি ছোট হাড়ও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কঙ্কালের উপর হলদেটে গজকাপড়ের মতো চামড়া টানটান করা, তার নিচে প্রতিটা হাড়,প্রতিটা গ্রন্থি নড়াচড়া করছে। শিশুদের মুখগুলোয় নির্যাতনের ছাপ পড়ে বুড়োটে হয়ে উঠেছে— যেনবা পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই তারা সত্তরটা বছর কাটিয়ে ফেলেছে। শরৎ যখন এল, তাদের আর কোনও মুখ ছিল না। কারো ঘাড়ের উপর ছোট চঞ্চু ওলা পাখির মাথা; কারও ঘাড়ের উপর পাতলা ছড়ানো ঠোঁট ওলা ব্যাঙের মাথা; কারও বা আবার থ্যাবড়ামুখো হাঁ-করা মাছের মাথা। কোনওটা মানুষের মুখ নয়। আর, হা ঈশ্বর, তাদের সেই চোখগুলো! ভগবানের দোহাই, কমরেড স্তালিন, আপনি কি সেই চোখগুলো দেখেছিলেন? হয়তো বা সত্যিই স্তালিন জানতেন না, যতই হোক না কেন, তিনিই তো সাফল্যে মাথা ঘুরে যাওয়ার নিবন্ধটা লিখেছিলেন!

কোনও কিছু খেতেই মানুষ বাদ রাখে নি। ইঁদুর, ছুঁচো, পাতিকাক, চড়ুই, পিঁপড়ে ধরত, মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করত। পুরানো হাড় পেলে তা গুঁড়িয়ে আটা তৈরি করত। চামড়া, জুতোর তলা, পুরানো দুর্গন্ধযুক্ত পশুছাল সরু সরু করে কেটে নুডলস-জাতীয় কিছু বানাত, তারপর সেগুলোকে জলে ফুটিয়ে একধরনের আঠালো মণ্ড তৈরি করত। বরফ গলে যাওয়ার পর ঘাস ও গাছ-গাছালি মাথা তুলতে শুরু করলে তারা শিকড় খুঁড়ে তুলে বা পাতা ও কুঁড়ি জলে ফুটিয়ে খেত। কোনও কিছুকেই তারা বাদ দেয়নি: ড্যান্ডেলিয়ন, বুর্ডক, ব্লুবেল, উইলোহার্ব, গাউটউইড, হগউইড, নেটেল, স্টোনক্রপ,...। লিন্ডেন পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে আটা তৈরি করত, কিন্তু আমাদের ওখানে খুব কমই লিন্ডেন গাছ ছিল। লিন্ডেনের আটা থেকে তৈরি চ্যাপ্টা রুটি হত সবজেটে, ওক ফলের আটা থেকে তৈরি রুটির চেয়েও খারাপ।

তবু কোনও সাহায্য এল না। অবশ্য মানুষজন সাহায্য প্রার্থনা করাও বন্ধ করে দিয়েছিল। এখনও সেসব কথা ভাবতে শুরু করলে আমার মাথা ঠিক থাকেনা। সত্যিই কী স্তালিন এতোগুলো মানুষের থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল? সত্যিই কি স্তালিন এই গণহত্যা পরিচালনা করেছিল? স্তালিনের জন্য খাবার ছিল, স্তালিনের জন্য রুটি ছিল। মনে হয় যে স্তালিন এই মানুষদের হত্যা করার পথ বেছে নিয়েছিল, ঠাণ্ডা মাথায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের অনাহারে রেখেছিল।

শিশুদেরও রেওয়াত করা হয়নি। স্তালিন কি তাহলে হেরডের চেয়েও খারাপ? মানুষের কাছ থেকে শেষ শস্যবিন্দুটুকুও কেড়ে নিয়ে স্তালিনই কি মানুষকে খিদেয় দগ্ধে মেরেছিল? 'না, কীকরে তা হয়?': আমি বলে উঠি। আবার নিজেই নিজেকে বলি: 'ঘটেছিল, তাই-ই ঘটেছিল'। পরমুহূর্তেই আবার অস্থির হয়ে উঠি: 'না, এ ঘটতে পারে না!'

শরীরে যখন কিছুটা হলেও বল অবশিষ্ট ছিল, মানুষজন মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে রেললাইনের ধারে যেত। রেল স্টেশনে নয়— সেখানকার প্রহরীরা তো তাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না— কেবল রেললাইনের ধারে তারা গিয়ে দাঁড়াত। কিয়েভ-ওডেসা এক্সপ্রেস যখন সেই পথ পার হত, তখন এই মানুষেরা ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করত 'রুটি! রুটি!' বলে। কখনও তারা অনাহারে ভীষণমূর্তি ধারণ করা তাদের শিশুদের উপরে তুলে ধরত। চলমান ট্রেন থেকে কেউ হয়ত এক টুকরো রুটি বা উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে দিত। ট্রেনের গর্জন ক্রমশ মিলিয়ে যেত, তার তোলা ধুলোর ঝড় স্তিমিত হত, আর জড়ো হওয়া গ্রামের সবাই লাইনের উপর উঠে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজত কোথাও কোনও ছুঁড়ে দেওয়া খাবারের টুকরো পড়ে আছে কিনা। কিন্তু তারপর আবার নতুন সরকারি নির্দেশ জারি হল— দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকার মধ্য দিয়ে যখন ট্রেন যাবে তখন ট্রেনে নিযুক্ত ওজিপিইউ-র প্রহরীরা সমস্ত জানালার পাল্লা নামিয়ে বন্ধ করে দেবে, সেসময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো যাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। আর কৃষকদের ট্রেনলাইনের ধারে যাওয়ার শক্তিও ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে এসেছিল।

আমার মনে পড়ে, রেললাইনের ধার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে এসে এক বৃদ্ধ আমাদের রাষ্ট্রীয় খামারের চেয়ারম্যানকে দেখিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনে আসা এক বিখ্যাত ফরাসি মন্ত্রীর সফর-সংবাদ সেখানে ছাপা হয়েছিল। সেই মন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিপরোপেত্রভস্ক প্রদেশে, যেখানে অনাহার-দুর্ভিক্ষ আমাদের প্রদেশের থেকেও আরও ভয়ানক চেহারা নিয়েছিল। মানুষ সেখানে অন্য মানুষকে খাচ্ছিল। সেই বিখ্যাত ফরাসি মন্ত্রীকে রাষ্ট্রকর্তারা একটা গ্রামের রাষ্ট্রীয় খামার পরিচালিত নার্সারি স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে সমবেত শিশুদের প্রশ্ন করেছিলেন যে সেইদিন দুপুরে তারা কী খেয়েছে। শিশুরা উত্তর দিয়েছিল, 'কড়াইশুঁটি দেওয়া মুরগির মাংসের সুপ আর চর্বিতে ভাজা ভাত'। আমি নিজের চোখে এই কথাগুলো মুদ্রিত দেখেছিলাম বৃদ্ধের কুড়িয়ে আনা সেই সংবাদপত্রের টুকরোয়— তা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। এমন ধাক্কা আমি আর কোনওদিন খাইনি। নিশ্চুপে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা আর তারপর গোটা পৃথিবীর

থেকে তা ঢেকে রাখতে নির্লজ্জ মিথ্যাচারণ! মুরগির মাংসের সুপ! চর্বিতে ভাজা ভাত! আমাদের এখানে তো শেষ কীট শেষ পোকাটাকেও কবেই খাওয়া হয়ে গেছে। বৃদ্ধ মানুষটি বলছিলেন, 'জার নিকোলাসের শাসনকালে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আমাদের খবরের কাগজগুলো তখন গোটা বিশ্বকে দুর্ভিক্ষের কথা জানিয়ে বরবার আবেদন করেছিল, "সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! আমাদের কৃষকরা আজ মৃত্যুর মুখে।" কিন্তু আজকের শাসনকর্তা তোমরা হলে দানব, হেরডের জাত তোমরা— কেবল এক বিশাল সাজানো প্রদর্শনী চালিয়ে যাচ্ছ তোমরা!'

আর্তচিৎকারের রোল পাক খেত গ্রামে। গ্রাম তার নিজের মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল। মন অবশ, হৃদয় অবশ, গোটা গ্রামই আর্তচিৎকার করছিল। বাতাসে পাতা ঝরার শব্দ যেমন ভাসে, খড় নিড়ানির শব্দ যেমন ভাসে, তেমনই এই আর্তচিৎকার ভাসছিল। তা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলছিল। এমন করুণ আর্তচিৎকার করার কী প্রয়োজন? তারা তো আর মানুষের পদবাচ্য নেই— তাহলে এমন আর্ত সেজে কান্নাকাটি কেন? ওই আর্তচিৎকারের রোলের মাঝে নিজের নিশ্চিত রুটির রেশনটি নিয়ে তা গলাধঃকরণ করা পাথরে তৈরি মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমি আমার রুটির রেশনটি নিয়ে গ্রামবসতি ছেড়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে চলে যেতাম; বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে থেমে শুনতাম আর্তচিৎকারের রোল তখনও কানে আসছে। আমি আরও দূরে সরতাম, মনে হত যেনবা সেই রোল আর শোনা যাচ্ছে না। আরও একটু দূরে সরতাম— কিন্তু সেই রোল আবার কানে ফিরে আসত, কেবলমাত্র তা এখন পরের গ্রামটা থেকে ভেসে আসছে। মনে হত যেনবা মানুষজনের সঙ্গে গোটা মাটির পৃথিবীটাও আর্তচিৎকার শুরু করেছে। 'কিন্তু কার কানে তা পৌঁছবে?' আমি ভাবতাম, 'ঈশ্বর তো কেউ নেই।'

ওজিপিএউ-র একজন আধিকারিক একবার আমাকে বলেছিল, 'প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টারের লোকেরা তোমাদের গ্রাম সম্পর্কে কী বলে জান? বলে যে ও হল এক কড়া ধাঁচের কবরখানা!' প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি সে কী বোঝাতে চাইছে। আর আবহাওয়াও তখন মনোরম হয়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মের শুরুর সেই সময়ে হালকা চপল বৃষ্টি আর তপ্ত উজ্জ্বল রোদ পিঠোপিঠি করছিল। মাঠে গমগাছ বেড়ে উঠেছিল যেন দেওয়ালের মতো পুরু আর মানুষের মাথা ছাড়িয়ে লম্বা— যেনবা তাদের কাটতে কুড়ুল দরকার হবে! সেই গ্রীষ্মে কত যে রামধনু উঠেছিল আকাশে, বাজ চিরিক কেটেছিল আর তপ্ত বৃষ্টিধারা— যাকে তারা 'জিপসি বৃষ্টি' বলে।

গোটা শীতকাল জুড়েই সবাই ফলন কেমন হবে তা ভাবছিল, পূর্বলক্ষণ খুঁজছিল, বয়স্ক মানুষদের মত জানতে চাইছিল। শীতের গমের ফলনের উপরেই সবাই আশা-ভরসা করছিল— কিন্তু যখন ফসল কাটার সময় এল, ফসল কাটতে মাঠে যাওয়ার শক্তি আর তাদের নেই। এক কৃষক-কুটিরে আমি ঢুকেছিলাম। সবেই শুয়ে আছে, শ্বাস পড়ছে নাকি আর পড়ছে না বলা মুশকিল। কেউ কেউ বিছানার উপর, কেউ কেউ উনুনের উপর পাটাতনে। এই পরিবারের মেয়েটি ছিল আমার পূর্বপরিচিত। সে মেঝের উপর পড়ে আছে, পাগলের মতো এক ঘোরের মধ্যে সে একটা চৌকির কাঠের পায়ে কামড় বসিয়ে চিবোচ্ছে। আর তার চেয়েও নিদারুণ হল যে আমি যখন ঢুকলাম তার গলা দিয়ে কেবল একটা চাপা ঘরঘরে গর্জন বেরিয়ে এল। আমার গলা শুনেও সে আমার দিকে ফিরে তাকাল না। কেবল আবার তার গলা থেকে ঘরঘরে চাপা গর্জন বেরিয়ে এল, ঠিক যেমন হাড় চিবোতে থাকা কোনও কুকুরের কাছাকাছি কেউ চলে এলে সেই কুকুরের গলা থেকে বের হয়।

গোটা গ্রাম মারা গেল। প্রথমে মরল শিশুরা, তারপর মরল বৃদ্ধরা, তারপর মরল মাঝবয়সীরা। প্রথম প্রথম মানুষ কবর খুঁড়ত মৃতদের কবর দেওয়ার জন্য, কিন্তু তারপর তাও বন্ধ হল। আর তাই মরদেহ ছড়িয়ে থাকত রাস্তাঘাটে, উঠোনে। শেষ যারা মরেছিল, তারা তাদের কুটিরের মধ্যেই পড়ে থেকে মরেছিল। নিঃঝুম হয়ে গেল চারপাশ। গোটা গ্রাম মরে গেছে। জানিনা কোন ব্যক্তি সবার শেষে মরেছিল। আমরা যারা প্রশাসনের হয়ে কাজ করতাম, আমাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে সদর শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শেষ অবধি আমাকে কিয়েভ শহরে নিযুক্ত করা হল। এটা সেই সময় যখন আবার সাধারণ বিক্রির জন্য রুটি ছাড়া হয়েছিল। রেশন কার্ড ছাড়াও রুটি কেনা যাবে বলা হয়েছিল। না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না! রুটি কেনার জন্য আগের দিন সন্ধ্যা থেকে মানুষ লাইন দিত। আধ মাইল ছাড়িয়ে যেত লাইন। এই লাইনেরও নানা প্রকারভেদ আছে জানো হয়ত। এমন লাইন হয় যেখানে মানুষরা সূর্যমুখীর বীজ চিবোতে চিবোতে একে অপরের সঙ্গে রসিকতা করে আর লাইনে তাদের ক্রমঅবস্থান একটুকরো কাগজে লেখা থাকে। আবার এমন লাইনও হয় যেখানে রসিকতার মেজাজ কারও থাকে না, লাইনে ক্রমঅবস্থানও হাতের তালুতে অথবা জামার পিঠে চক দিয়ে দেগে দেওয়া হয়। কিন্তু তখন যে লাইনগুলো পড়ত, তা এর কোনোটার মতোই নয়। আগে কখনও আমি এমন দেখিনি। লাইনে দাঁড়ানো মানুষ তার আগেরজনের কোমরে দুহাতের বেড়ি দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকত। কেউ হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেলে গোটা লাইনটাই তার

সঙ্গে দুলে উঠত, একটা ঢেউ যেন লাইনের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত। অদ্ভুত এক নৃত্য শুরু হত, এদিক থেকে ওদিক দুলত মানুষদের দেহগুলো। ক্রমশ এই দুলুনি আরও প্রবল হয়ে উঠত। প্রত্যেকে ভয় পেত যে সামনের জনের দেহ আঁকড়ে থাকার শক্তি নিঃশেষ হয়ে হয়তো তারা লাইনের বাইরে ছিটকে যাবে— এই আশঙ্কায় মহিলারা চিৎকার করতে শুরু করত, ক্রমশ গোটা লাইনটাই অদ্ভুত চিৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকত যেন সবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, যেন এক অদ্ভুত সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যে তাদের কেউ জুতে দিয়েছে। কখনও কখনও কমবয়সী পাজিরা লাইন ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করত, দুর্বলতম গ্রন্থিটা খুঁজে বের করার জন্য তাদের ঘুরঘুর করতে দেখা যেত। এইসব পাজিদের কাছে ঘেঁষতে দেখলেই সবাই বারবার ভয়ে আর্তচিৎকার করত, অদ্ভুত এক গান গাইছে যেন। এরা সবাই রেশন কার্ড বিহীন শহরের মানুষ, এ কেবল রুটি কেনার লাইন। এদের পাসপোর্ট নেই, এদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এরা শহরতলীতে মাথা গুঁজে থাকা সাধারণ কারিগর বা সাধারণ লোক। আর তারপর ছিল কৃষকরা— গ্রাম ছেড়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে শহরের দিকে আসছে তারা। রেলস্টেশনগুলোয় তো তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়না, ট্রেনগুলোয় অনবরত তল্লাশি চালানো হয়। সেনা ও ওজিপিইউ-র বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তুলে পাহারা দিচ্ছে তাদের আটকানোর জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ কিয়েভে এসে পৌঁচচ্ছে। মাঠ ও জলার মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে তারা। জঙ্গল ও খোলাজমির মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে তারা। তাদের সামনে খাড়া করা সব অবরোধ পাশ কাটানোর মরীয়া চেষ্টা করে আসছে তারা। যাই হোক না কেন, প্রতিটা ইঞ্চিতে অবরোধ খাড়া করা তো অসম্ভব। কৃষকদের এখন আর খাড়া হয়ে হাঁটারও শক্তি নেই, কেবল হামাগুড়ি দেওয়ার ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে। আর কিয়েভের মানুষজন তার দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে— কাজে যাওয়ার পথে বা সিনেমায় যাওয়ার পথে... চলমান ট্রামগাড়ির পাশে... নগরবাসীদের পায়ের ফাঁকে দেখত এই অভুক্ত-অনাহারীরা হামাগুড়ি দিচ্ছে। শিশু, পুরুষ, তরুণী— চার হাত-পায়ে হামা কাটছে। মানুষের মতো নয়, নোংরা বিড়াল বা কুকুরের মতো দেখাত তাদের। কিন্তু এই হামা দেওয়া জন্তুবৎ প্রাণীগুলোও মানুষের মতো আচরণ করতে চাইত। তাদের বিনয় ছিল, নম্রতা ছিল, লজ্জা ছিল। একটি তরুণী হয়তো হামা টেনে যাচ্ছে, সারা গা ফোলা, ঘ্যানঘ্যানে একটা আওয়াজ তার গলা থেকে বেরচ্ছে, অদ্ভুত এক বাঁদরের মতো দেখতে লাগছে— আর তারপরই সে হঠাৎ তার স্কার্টটা ঠিকঠাক করে নেবে, মাথায় বাঁধা রুমালের নিচে তার লম্বা চুল একটু গুছিয়ে নেবে, যতই হোক না

কেন, এই সেই গ্রামের দুহিতার প্রথম শহরে আসা! কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে কিয়েভ অবধি পৌঁছতে পারত এমন ভাগ্যবানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম— প্রতি দশ হাজার জনে হয়ত একজন। এমন নয় যে এতে তাদের কোনও উপকার হত, কারণ কিয়েভেও তাদের কোনও সুরাহা হত না। মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনাহারী মানুষগুলো ভিক্ষা করত, হিসহিসিয়ে কোনওমতে শব্দ-বাক্য উচ্চারণ করার চেষ্টা করত। কিন্তু খাবার পেলেও তা হজম করার ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পড়ে থাকা কারও পাশে হয়ত কেউ একটুকরো পোড়া রুটি ছুঁড়ে দিয়েছে, কিন্তু তা খেয়াল করার মতো অবস্থাতেও সে আর নেই, সে তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

প্রতিদিন ভোরে চ্যাপ্টা-মাথা ঘোড়ায় টানা গাড়ি শহর টহল দিত। রাতেই যারা রাস্তার ধারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তাদের শবগুলো সরিয়ে নিয়ে যেত। আমার চোখে এমনই এক গাড়ি পড়েছিল, তা কেবল শিশুদের লাশে ঠাসা ছিল। আগে যেমন বলেছি, এই লাশগুলোও তেমনই। সরু লম্বাটে দেখতে, মুখগুলো তীক্ষ্ণচঞ্চু পাখির মরা মুখের মতো। এই খুদে পাখিরা উড়ে এসেছিল কিয়েভে— কিয়েভ তাদের কী ভালোটা করল? কারও কণ্ঠ দিয়ে তখনও অদ্ভুত কিচকিচে একটা আওয়াজ বেরচ্ছিল, তাদের মাথাগুলো ধানের ভারে ঝোঁকা শিষের মতো নুয়ে পড়েছিল, সরু গলাগুলো বেঁকে গেছিল। সেই গাড়ির চালককে প্রশ্ন করায় সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'খানিক্ষণের মধ্যে ওগুলোও চুপ মেরে যাবে।'

আমি দেখেছিলাম, একজন তরুণী রাস্তার ধারের পায়ে চলার পথ দিয়ে হামা টেনে যাচ্ছে। একজন রাস্তা-সাফাইকারী তাকে এক লাথি কষাল, মেয়েটা গড়িয়ে রাস্তায় পড়ল। মেয়েটা পিছন ফিরে তাকালও না, তড়িঘড়ি যত দ্রুত সম্ভব আবার হামা টেনে চলল— ওই শক্তিটুকুও সে তার দেহ নিঙড়ে কীভাবে বের করল ঈশ্বরই জানেন। এমনকি হামা টানতে টানতে সে তার পোষাক থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলারও চেষ্টা করল। ওই দিনেই আমি মস্কো থেকে প্রকাশিত একটা সংবাদপত্র কিনেছিলাম। তাতে ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। গোর্কি লিখেছিলেন শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক খেলনার প্রয়োজনীয়তার কথা। গোর্কি কী টানাগাড়িতে ঠাসা মৃত ও অর্ধমৃত শিশুদের কথা জানতেন না? সত্যিই কী ওই শিশুদের শিক্ষামূলক খেলনা প্রয়োজন? হয়তো গোর্কি জানতেন— কিন্তু সে বিষয়ে নীরবতা বজায় রেখেছিলেন, ঠিক যেমন অন্য সবাই নীরবতা বজায় রেখেছিল। আর হয়তো তিনিও এইসব মৃত শিশুদের মুরগির মাংসের সুপ উপভোগ করার কথা লিখেছিলেন। শিশুশব-

বোঝাই টানাগাড়ির সেই চালক আমায় বলেছিল যে সবচেয়ে বেশি শব তুলতে হয় সেইসব দোকানের আশপাশ থেকে যেখানে রেশন কার্ড ছাড়াই রুটি কেনার ছাড় দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা অনাহারী, উদরী রোগে যাদের দেহ ফুলে গেছে, এক টুকরো রুটি গলাধঃকরণ চেষ্টাই তাদের মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। হ্যাঁ, কিয়েভের এসব স্মৃতি আমি ভুলতে পারব না, যদিও ওই শহরে আমি মাত্র তিনদিন কাটিয়েছিলাম।

ক্রমে আমি ক্ষুধার হানাদারির প্রতিটা পর্ব উপলব্ধি করেছিলাম। একদম প্রথমে, ক্ষুধা তোমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। শুরুর পর্যায়ে ক্ষুধা দগ্ধ করে, নির্যাতন করে— নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে দেয়, তোমার সত্তার উপর হামলা করে। আর তাই তুমি ঘর থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাও। মানুষ কেঁচোর জন্য মাটি খোঁড়ে, মুঠি মুঠি ঘাস ছিঁড়ে আনে— আর হ্যাঁ কোনও না কোনওভাবে কিয়েভের মতো বড় শহরে পৌঁছবার সংগ্রাম চালায়। যাই করুক না কেন, তাকে বাইরে বেরতে হবে, ক্ষুধার নাগাল পেরিয়ে যেতে হবে। আর তারপর সেই দিন আসে যখন অনাহারী মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে আবার তার ঘরেই ফিরে আসে। এর মানে ক্ষুধা জিতে গেছে। এই মানুষটি লড়াই ছেড়ে দিয়েছে, সে তার ঘরে বিছানার উপর দেহ এলিয়ে দেয় এবং সেখানেই পড়ে থাকে। আর একবার ক্ষুধা জিতে গেলে, যতই চেষ্টা কর না কেন, গা এলিয়ে দেওয়া মানুষটিকে আর তুমি খাড়া করে দাঁড় করাতে পারবে না। তা কেবল এই জন্য নয় যে শরীরে তার শক্তি নেই, তা এই জন্যও যে তার আর কোনও কিছুতেই কিছু যায়-আসে না, বেঁচে থাকার ইচ্ছা সে হারিয়ে ফেলেছে। সে কেবল নীরবে নিশ্চুপে এলিয়ে পড়ে থাকে। একমাত্র এটাই সে চায় যে তাকে যেন সবাই অব্যাহতি দেয়। সে আর খেতে চায় না, যদিও পেচ্ছাপ-পায়খানা আর থামতে চায় না। সে কেবল ঘুমাতে চায়, সেখানেই তার একমাত্র শান্তি। এভাবে যদি কেউ নিঃসাড়ে পড়ে থাকে, তাহলে সে মৃত্যুর দোরে পৌঁছে গেছে। যুদ্ধবন্দি হওয়া মানুষদের কাছ থেকেও আমি এমনটা শুনেছি— যদি কোনও বন্দি তার জন্য বরাদ্দ কাঠের পাটাতনে সর্বক্ষণ শুয়ে কাটায়, তার রেশন নিয়েও যদি তার কোনও হেলদোল না থাকে, বুঝে নিতে হয় যে তার মৃত্যু খুব কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। একদম মৃত্যুর মুহূর্তে গিয়েই তারা নিশ্চল হত। তাদের চকচকে আলো-ঠিকরানো চোখ দেখলেই তাদের চেনা যায়। এরাই অন্য মানুষের শব কেটে টুকরো টুকরো করে জলে ফুটিয়ে খেত, এমনকি নিজেদের সন্তানদেরও হত্যা করে কেটে খেয়েছিল। তাদের মধ্যের মানুষটা মরে গিয়ে এক হিংস্র জন্তু উপরে উঠে এসেছিল। জেলা সদরে প্রহরীদের পাহারায় বন্দি করে

নিয়ে আসা এক মহিলাকে আমি দেখেছিলাম। তার মুখটা মানুষের, কিন্তু চোখদুটো নেকড়ে বাঘের। এই মানুষখেকো সব্বাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বলে আমি শুনেছিলাম। কিন্তু এই মানুষখেকোরাই কি দোষী? দোষ তো তাদের যারা একজন মা-কে এতদূর অবধি ঠেলে নিয়ে যেতে পারে যাতে সে তার নিজের সন্তানকে অবধি কেটে খেতে পারে। কিন্তু সেই কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও কাউকে দোষ স্বীকার করতে তুমি দেখবে না। সেই কর্তাব্যক্তিরা যা করেছিলেন তা সর্বজনের সাধারণ মঙ্গলের জন্য করেছিলেন! তাই তাঁরা মায়েদের ঠেলে দিয়েছিলেন নিজ সন্তানকে কেটে খাওয়ার পর্যায় অবধি!

তারপর আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রতিটা অনাহারী মানুষই এক প্রকারের মানুষখেকো। সে তার নিজের দেহের মাংস খেতে থাকে। কেবল হাড়গুলো ছাড় পায়। চর্বির শেষ ফোঁটাটুকু অবধি সে চুষে নেয়। তারপর তার মন জুড়ে নামে অন্ধকার— সে নিজ মগজটাকেও খেয়ে ফেলেছে। অনাহারী মানুষ নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলেছে।

আমি এটাও উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রতিটা অনাহারী মানুষের মৃত্যুর ধরন তার নিজের মতো করে আলাদা। কোনও কুটিরে প্রত্যেকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুযুধান, একে অপরের উপর নজরদারি চালাচ্ছে, ক্ষুদ্রতম খাবারের টুকরোটুকুও একে অন্যের থেকে চুরি করে নিচ্ছে। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী। মা তার সন্তানদের ঘৃণা করছে। কিন্তু আবার অন্য কোনও কুটিরে অবিনশ্বর ভালোবাসার শ্বাস-প্রশ্বাসে সবাই বাঁচছে। এমন এক মহিলাকে আমি জানতাম যার চার সন্তান ছিল। জিভ তার আর নড়তে চাইছে না, তখনও সে তার সন্তানদের মন খিদের দহনজ্বালা থেকে দূরে সরানোর চেষ্টায় রূপকথার গল্প বলে যাওয়ার চেষ্টা করত। তার হাতটি তোলার শক্তিটুকুও তখন নেই, তখনও সে তার সন্তানদের বুকের কাছে ধরে রাখত। ভালোবাসা তার মধ্যে ছিল অজেয়। যেখানে ঘৃণা তার সংসার পাততে পেরেছিল, মানুষ আরও দ্রুত মরেছিল। কিন্তু তা বলে ভালোবাসা কারও জীবন বাঁচাতে পারেনি। প্রতিটি মানুষের দেহ কখনও না কখনও এলিয়ে পড়েছিল আর মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছিল। সময় অবশিষ্ট ছিল না।

পরে জেনেছিলাম, গ্রামটি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শিশুদের স্বর আর শোনা যায়না কোথাও। শিক্ষামূলক খেলনা বা মুরগির মাংসের সুপ— কোনওটারই আর প্রয়োজন নেই। কান্নার রোল নেই— কাঁদার জন্য কেউ পড়ে নেই। আমি জানতে পেরেছিলাম যে সেনাবাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল মাঠ থেকে শীতের গমের ফসল কেটে তোলার জন্য— কিন্তু তাদেরও মৃত গ্রামের মধ্যে প্রবেশের

অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারা তাদের তাঁবুতে ছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে রোগের মহামারী লেগেছে গ্রামে। গ্রাম থেকে ভেসে আসা পচা শবের দুর্গন্ধ নিয়ে অবশ্য সেনারা বারবার অভিযোগ করত। পরের বছরের শীতের গমের জন্য ফসল বোনার কাজও করানো হয়েছিল সেনাদের দিয়ে। তারপর শরৎ যখন আবার ঘুরে এল, রাশিয়ার ওরিয়ল প্রদেশ থেকে লোকজন নিয়ে এসে গ্রামে তাদের বসত করে দেওয়া হল। হাজার হোক, এ তো ইউক্রেন, এ ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকা— আর ওরিয়ল চিরকালই অনুর্বর, ফসল ভালো হয়না। বসত গাড়তে নিয়ে আসা পরিবারগুলোর মহিলা ও শিশুদের রেলস্টেশনের কাছেই অস্থায়ী আস্তানায় রেখে পুরুষদের গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লম্বা হাতলযুক্ত কাঁটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তা দিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে জমে থাকা মৃতদেহগুলোকে ওই কাঁটায় বিঁধে টেনে এনে জড়ো করতে বলা হয়েছিল। পুরুষ বা মহিলা, মানুষের শব কুটিরগুলোয় স্রেফ পড়েছিল, কোনওটা বিছানায়, কোনওটা মেঝেতে। কুটিরগুলোর ভিতর ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। কাঁটা হাতে জ্যান্ত পুরুষগুলো মুখে কাপড় বেঁধে নাক ঢাকা দিয়ে কাঁটা বিঁধিয়ে শবগুলোকে হিঁচড়ে টেনে বের করতে শুরু করল— কিন্তু শবদেহগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। শেষ অবধি শবদেহের সমস্ত টুকরোগুলোকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হল। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে গ্রামটি সত্যিই এক 'কড়া ধাঁচার কবরখানা'। সব শব যখন সরানো হয়ে গেছে, বসত গাড়তে নিয়ে আসা পরিবারগুলোর মহিলাদের তখন নিয়ে আসা হল কুটিরগুলো ঝাড়পোঁছ করে দেওয়ালগুলোয় চুনকাম করার জন্য। সবকিছু যথাযথ ভাবে করার পরও দুর্গন্ধ যাচ্ছিল না। তাই দেওয়ালগুলোর আবার করে চুনকাম করা হল আর মেঝেতে নতুন মাটি ফেলা হল। দুর্গন্ধ তবুও কাটে না। সেই ঘরে বসে কিছু খাওয়া ছিল অসম্ভব, ঘুমানোও অসম্ভব। মানুষগুলো তাই সব আবার ওরিয়ল-য়েই ফিরে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন উর্বরমৃত্তিকা অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে শূন্য ও জনমানবহীন হয়ে পড়ে থাকতে পারেনা। পারে কি?

আর এখন সবার মন থেকে মনে হয় যেন সেই খাদ্য কেড়ে নিয়ে মারা মানুষদের কথা মুছেই গেছে, যেনবা তাদের অস্তিত্বই ছিল না কোনওদিন। কিন্তু এই গ্রাম সবকিছু দেখেছে। প্রেম ছিল। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর চলে যাওয়া ছিল। বিবাহের পর কন্যার পতিঘর-যাত্রা ছিল। মদের নেশায় চুর হয়ে মানুষরা হাতাহাতি করেছে। বন্ধু ও পরিবারের আশ্রয়ে বেঁচেছে। রুটি তৈরি করেছে। আর কী পরিশ্রমই না তারা করেছে! তারা গান গেয়েছে। তাদের সন্তানেরা স্কুলে গেছে।

কখনও কখনও সিনেমা প্রদর্শনের ভ্রাম্যমান গাড়ি এসেছে আর বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই চলচ্চিত্র দেখতে ভিড় করেছে।

আর এখন তার কিছুই পড়ে নেই। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই জীবন? আর যন্ত্রণাভোগ— সেই ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ? তার কোনও রেশও কি থাকবে না? সত্যিই কি তার জন্য কাউকে কোনওদিন জবাবদিহি করতে হবেনা? সতিই কি সবকিছু বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাবে?

নতুন ঘাস গজিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

কী করে তা হতে পারে?— আমার এ প্রশ্ন তোমার কাছে।...

————————

ভাসিলি তিমোফেয়েভিচের গলার স্বর ছিল শান্ত, তার চলাফেরাও ছিল দ্বিধা-জড়ানো। আর গান্না নামের মেয়েটির সঙ্গে কেউ কথা বললে সে তার চোখ নামিয়ে ফেলত মাটির দিকে আর এত মৃদুগলায় জবাব দিত যে তা কান অবধি পৌঁছানো ছিল দুষ্কর।

ভাসিলি আর গান্নার যখন বিয়ে হল তারা যেন আরও শান্ত ও ভীরু হয়ে উঠল। ভাসিলির বয়স তখন পঞ্চাশ বছর, পড়শির বাচ্চারা তাকে 'দাদু' বলে ডাকে, তার মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, টাক উঁকি মারছে, কোঁচকানো রেখা ছড়াচ্ছে চামড়ায়। তাই সে তার চেয়ে অত কম বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করার লজ্জায় কুঁকড়ে থাকত। তার প্রেমের অনুভবের সুখ, তার বউয়ের দিকে তাকালেই তার মুখ থেকে নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে আসা 'প্রিয়া আমার! প্রেয়সী আমার!' উচ্ছাস— এসব নিয়েই তার লজ্জার শেষ ছিল না। আর গান্না বিয়ের আগে তার কিশোরী মনে বহুবার তার ভবিষ্যৎ স্বামীর ছবি এঁকেছিল। তার আকাঙ্খার পুরুষটি হবে স্কোর-য়ের মতো গৃহযুদ্ধের নায়ক, গ্রামে সে হবে সেরা অ্যাকর্ডিয়ন-বাদক, আর তারাস শেভচেঙ্কোর মতো হৃদয়জ কবিতা লিখবে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাসিলি তিমোফেয়েভিচের হৃদয়ে তার জন্য যে প্রেমের আসন পাতা হয়েছে, তা গান্নার শান্ত হৃদয় অনুভব করতে পারে। ভাসিলির বিগতযৌবন, ভাসিলির দারিদ্র্য, ভাসিলির গোবেচারা অভাগা হাবভাব, জীবনকে নিজের শক্ত মুঠোয় ধরতে পারার অপারগতা— এর কোনওকিছুই গান্নার সেই অনুভবকে ঝাপসা করে দেয় না। আর ভাসিলিও বোঝে কীভাবে এই অল্পবয়সী মেয়েটি আশার মিনার রচনা করেছিল মনে মনে, কল্পনা করেছিল বীরত্বে-সম্মানে উজ্জ্বল গ্রামের এক তরুণ যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে এসে সৎবাবার ঘিঞ্জি বাড়ি থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাবে আর তার পরিবর্তে ভাসিলি গিয়ে হাজির হয়েছে তার পুরানো জুতোজোড়া ঘষটাতে ঘষটাতে, বড় বাদামি চাষাড়ে হাতদুটোকে

কচলাতে কচলাতে, দুঃখপ্রকাশের কাশি কেশে গলা ঝাড়তে ঝাড়তে। আর এখন সে তার গান্নার দিকে তাকিয়ে সুখ অনুভব করে, প্রেম অনুভব করে, আবার অপরাধবোধ আর বেদনাও তাতে মিশে থাকে। আর ভাসিলির সামনে গান্নাও যেন কোন অপরাধবোধে গুটিসুটি নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

তাদের একটা ছেলে হয়েছিল— গ্রিশা, ছোটখাটো চেহারার, কখনও তার কান্না শোনা যায়না। মায়ের চেহারা ভেঙে আবার যেন একটা হাড়-জিরজিরে ছোট মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। রাতে সে শিশুর দোলনার পাশে গিয়ে দাঁড়াত। দেখত দু চোখ খুলে শিশুটি নিশ্চুপে শুয়ে আছে। সে নিচু হয়ে ঝুঁকে শিশুটিকে বলত, 'ছোট্ট গ্রিশেঙ্কা আমার, একটু কাঁদার চেষ্টা কর। সবসময় এত নিশ্চুপ কেন তুই?'

যখন তারা নিজেদের কুটিরের মধ্যে কেবল নিজেরাই থাকত, তখনও স্বামী আর স্ত্রী নিজেদের মধ্যে চাপা মৃদু গলায় কথা বলত। পড়শিরা অবাক হত, জিজ্ঞাসা করত, 'সবসময় অমন ফিসফিসিয়ে কথা বল কেন তোমরা?'

পরিশ্রম করা নিয়ে তাদের মুখ থেকে কখনও কোনও অভিযোগ বের হয়নি। যখন তাদের পালা নয়, তখনও যখন ব্রিগেড-নেতা তাদের মাঠে কাজ করতে পাঠাত, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার সাহসও কখনও তাদের হয়নি।

একবার ভাসিলি তিমোফেয়েভিচকে জেলাসদরে পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রীয় খামারের আস্তাবলের একটা কাজের জন্য, খামারের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান যখন ভূমি ও অর্থ দপ্তরে তাঁর কাজ সারছিলেন, ভাসিলি ঘোড়াগুলোকে একটা খুঁটিতে বেঁধে তার বউয়ের জন্য উপহার কিনতে একটা দোকানে ঢুকেছিল। পপি বীজের তৈরি কেক গোটাকয়েক, কিছু মিষ্টান্ন, কিছু আংটি-আকারের রুটি, আর কিছু বাদাম কিনেছিল— বেশি নয়, প্রতিটি ১৫০ গ্রাম করে। তার সাদা রঙের বড় রুমালটায় বেঁধে নিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সে যখন তার বউয়ের সামনে রুমালটার বাঁধন খুলল, তার বউ শিশুর মতো আনন্দে দুহাত উপরে ছুঁড়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল 'ওহ মা!' অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ভাসিলি তিমোফেয়েভিচ তার চোখ ছাপিয়ে আসা আনন্দের অশ্রু কোনওমতে সামলাতে সামলাতে ভাঁড়ারঘরের আড়ালে সরে গিয়েছিল।

বড়দিনের উপহার হিসেবে গান্না তার স্বামীর জন্য একটা জামায় চিকন-বুটি নকশা সেলাই করে দিয়েছিল। গান্না জানতে পারেনি যে জামাটা পাওয়ার পর তার স্বামী ভাসিলি তিমোফেয়েভিচ কারপেঙ্কো রাতভোর ঘুমোতে পারেনি। রাতে বারবার বিছানা থেকে উঠে খালি পায়েই হেঁটে সে তাদের ছোটখাটো আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, যার উপরের দেরাজে জামাটা রাখা ছিল।

বারবার সে জামাটার উপর হাত বোলাচ্ছিল, সাদাসিধে চিকন-বুটি নকশার সেলাইয়ের ফোঁড় হাতের তালুতে অনুভব করছিল...। আর সেই দিনটা, যেদিন জেলা হাসপাতালের প্রসূতিসদন থেকে তার বউকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল, তার বউয়ের কোলে ধরা তাদের নবজাতক সন্তানের দিকে যখন বারবার তার চোখ চলে যাচ্ছিল— এক হাজার বছর বেঁচে থাকলেও সেই দিনটাকে সে ভুলতে পারবে না।

কখনও কখনও তার ভয় হয়। তার জীবনে এমন সুখ আসা সম্ভব হল কী করে? কী করে এমন সম্ভব হল যে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে তার নিজের স্ত্রী আর নিজের সন্তানের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়?

যে কারও সঙ্গেই ভাসিলি লজ্জায় সংকোচে জড়সড় হয়ে থাকত। এমন সুখের অধিকার কি সত্যিই তার আছে?

দিনগুলো ছিল এমন। কাজশেষে খামার থেকে ফিরতে ফিরতে তার চোখে পড়ত তার বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে, তার বাড়ির বেড়ায় শিশুর কাঁথাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ঘরে তার বউকে শিশুর দোলনার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত, অথবা বাঁধাকপির সুপ-ভর্তি বাটি টেবিলের উপর রাখতে আসা বউয়ের মুখে অন্যমনস্ক হাসির ভেসে বেড়ান দেখত। বউয়ের হাতদুটোকে দেখত, মাথায় বাঁধা রুমালের নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসা চুলের গাছাটাকে দেখত। তাদের সন্তানকে নিয়ে বা পড়শিদের ভেড়ীটাকে নিয়ে বউয়ের নানা কথা সে একমনে শুনত। কখনও বউ ঘরের বাইরে ভাঁড়ারে গিয়ে ঢুকলে সে নিঃসঙ্গ বোধ করে তার বউয়ের সঙ্গের জন্য ছটফট করে উঠত। আবার বউ ঘরে ঢুকলে সুখ উপছে আসত। তার চোখে চোখ পড়ে গেলে বউ তার দিকে একটা নম্র বিষণ্ণ হাসি ছুঁড়ে দিত।

ভাসিলি তিমোফেয়েভিচ মরল প্রথমে, ছোট্ট গ্রিশা মরার দুদিন আগে। খাবারের শেষ টুকরোটুকু অবধি ভাসিলি তার বউ ও সন্তানের মুখে তুলে দিচ্ছিল, তাই তাদের আগে তারই মৃত্যু হল। সম্ভবত বিশ্বে এর চেয়ে বড় আত্মত্যাগ আর কিছু হতে পারেনা— আর সেই বেদনার চেয়েও বেশি কিছু হতে পারেনা, যে বেদনা মুমূর্ষু ভাসিলির বুকে মোচড় দিত যখন সে উদরী-রোগের মরণছোঁয়ায় ফুলে বেঢপ হয়ে যাওয়া তার বউয়ের দিকে বা মরতে বসা ছেলের দিকে তাকাত।

এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তটিতেও ভাসিলি তিমোফেয়েভিচের মনে ঘৃণা ও ক্রোধের বোধ জাগেনি, রাষ্ট্র ও স্তালিনের ঘটানো বোধহীন মূঢ় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনও রাগ হয়নি। 'কেন?'— এই প্রশ্নটুকুও সে করেনি। নম্র, বাধ্য ও কঠিন পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও তার ও তার বউয়ের জন্য, এবং তাদের শান্ত খুদে এক

বছরের বাচ্চাটার জন্য কেন অনাহারে দগ্ধে মারার নির্যাতন বরাদ্দ করা হল সে প্রশ্ন সে একবারও করেনি।

পচে খসে পড়তে থাকা জামাকাপড় পরা তিনটে কঙ্কাল শীতকালটাও একসঙ্গে কাটাল। স্বামী, তরুণী স্ত্রী আর তাদের খুদে পুত্র সাদা হাসি নিয়ে পরে রইল, মৃত্যুতেও অবিচ্ছেদ্য।

পরবর্তী শরতে, পরিযায়ী হরবোলা পাখিগুলো যখন আবার ফিরে এসেছে, জেলা ভূমি দপ্তরের প্রতিনিধি মুখ ও নাক কাপড়ে ঢেকে সেই কুটিরে প্রবেশ করল। সে চোখ ঘুরিয়ে দেখল কাঁচহীন প্যারাফিন বাতিটার দিকে, এক কোণায় দাঁড়ানো ঈশ্বরমূর্তির দিকে, দেরাজওলা ছোট আলমারিটার দিকে, শীতল ঝালাই-লোহার পাত্রাদির দিকে আর বিছানার দিকে।

'দুজন, সঙ্গে একটা বাচ্চা', সে হেঁকে বলল।

প্রেম ও নম্রতার এই পবিত্রতম পীঠের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ব্রিগেড নেতাটি সেই হাঁকে মাথা নেড়ে হাতের টুকরো কাগজে হিসেবের দাগ কাটল।

খোলা তাজা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে প্রতিনিধি মশাই সাদাটে কুটীরগুলো আর সবুজ সবজিবাগানগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে হুকুম দিল, 'শবগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাও— বাকি ধ্বংসস্তূপ নিয়ে মাথা ঘামিও না। এসব আর সারাই করার চেষ্টা করে লাভ হবে না।'

আরও একবার ব্রিগেড নেতা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

(ভাসিলি গ্রসমান, এভরিথিঙ ফ্লোজ, মূল রুশ থেকে রবার্ট চ্যান্ডলার, এলিজাবেথ চ্যান্ডলার ও আন্না আসলানিয়ান দ্বারা ইংরেজিতে অনুদিত, ভিনটেজ বুকস, ২০১১, পৃষ্টা– ১২৪-১৫৩। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

১৭

সোভিয়েত সর্বাত্মকতাবাদী শাসন

প্রায় ৬০ বছর পরে, ১৯৯০-য়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর, পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেন পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার পর ইউক্রেনের সংসদে ঘোষণা করে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে ১৯৩৩ সালের 'দুর্ভক্ষ-মহামারী' ছিল আসলে রাষ্ট্র-পরিচালিত গণহত্যা। পৃথিবীর অন্য ২৫টি রাষ্ট্র তাতে স্বীকৃতি দেয়, যদিও রাশিয়া এখনও তা দেয়নি।

কিন্তু একটা রাষ্ট্র কীভাবে এমন অকল্পনীয় গণহত্যা সংগঠিত করতে পেরেছিল? রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা স্তালিনের অমানুষিকতার জোরে? লালফৌজ ও গুপ্তপুলিশ ওজিপিইউ-র পাশবিক সন্ত্রাসের জোরে? কিন্তু তা-ই তো সব নয়। কম্যুনিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট যুব সংগঠন কোমসোমলের সদস্যরা অনাহারীদের হাতের নাগাল থেকে শেষ খাদ্যবিন্দুটুকুও কেড়ে নিতে যে বিপুল উৎসাহ দেখাল, গ্রাম থেকে খাদ্য ভিক্ষা করতে আসা শিশু-বৃদ্ধের লাশ শহরের রাস্তায় নিত্য জমে উঠলেও শহরবাসী ও শ্রমিকরা যেভাবে তাকে যেন স্বাভাবিকতার অঙ্গ বলেই ধরে নিল, এসব কী ভাবে হয়? রাষ্ট্রীয় পীড়নের উদ্যত মুষ্টিই কি এমন অন্ধ আনুগত্য ও সংবেদনহীনতা তৈরি করতে পারে?

না, কেবল ভয় পেয়ে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেনি। সদর্থক ভাবে, আদর্শনৈতিকতার যুক্তিতেও মানুষ অনুগত থেকেছে, মতবাদের বাঁধনে বাঁধা থেকেছে রাষ্ট্রের সঙ্গে। সোভিয়েত দেশকে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল 'বিশ্বসমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি', স্তালিন তার পিতৃসম 'মহান নেতা'। বলা হয়েছিল সেখানে কায়েম হয়েছে 'শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব', বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তির জন্য শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অবিচল এমন এক শাসন বিশ্ব যা আগে কখনও দেখেনি। গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী জনতার আশা-ভরসার স্থল ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে সে নিজেকে হাজির করেছিল। আর বিশ্বসমাজতন্ত্রের

এই পিতৃভূমি ভিতরে-বাইরে শত্রুদের দ্বারা ঘেরা। শত্রু সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। শত্রু বুর্জোয়ারা, পেটিবুর্জোয়ারা, জাতীয়-পরিচয়-সন্ধানীরা, বিপ্লববিরোধীরা...। মানব ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কুশীলবদের দাঁতে দাঁত চেপে বহু শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। ভাসিলি গ্রসমানের কথায়:

> বুর্জোয়া, অভিজাতবর্গ, পেটিবুর্জোয়া, মেনশেভিক, সোশালিস্ট রিভলুশনারি— এরা সবাই শ্রমিকশ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতক, এদের সবাইকে তারা ঘৃণা করত। আরও বহুজন ছিল ঘৃণার পাত্র: সম্পন্ন কৃষক, লালফৌজে 'সামরিক বিশেষজ্ঞ' হিসেবে নিযুক্ত জার আমলের সেনা-আধিকারিক, আত্মবিক্রিত বুর্জোয়া শিল্প, বুর্জোয়াদের কাছে বিকিয়ে যাওয়া অর্থগৃধ্নু অধ্যাপক, টাই হাঁকানো ফুলবাবু, ব্যক্তিগত চর্চা করা ডাক্তার, নাকে পাউডার লাগিয়ে পশমের লম্বা পা-ঢাকা পড়ে ঠ্যাঙঠেঙিয়ে বেড়ানো মহিলা, ফুলবাবু-ফুলবিবি সাজা প্রতিবিপ্লবী ছাত্রছাত্রী যারা বিপ্লবের পক্ষে থাকার ভানমাত্র করে, খ্রিস্টিয় ও ইহুদি সাধু, শিরোপাভূষিত ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিয়ে অবক্ষয়ী খুদে পদ্য লেখা কবি। কার্ল কাউটস্কি ও র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে তারা ঘৃণা করত। বার্নস্টাইনের লেখা তারা পড়েনি, তবু বার্নস্টাইনকে তারা সহ্য করতে পারত না...। এই মানুষগুলো, যারা পৃথিবীতে রক্তবন্যা বইয়েছিল, যারা অমন তীব্র হৃদয়াবেগ দিয়ে এত বিবিধ বস্তুকে ঘৃণা করত, তাদের হৃদয়টা ছিল শিশুদের মতো সরল। তাদের ছিল ধর্মোন্মাদের হৃদয়, হয়ত বা, উন্মাদের হৃদয়। প্রেমের দোহাই দিয়ে তারা ঘৃণা করত।
>
> (ভাসিলি গ্রসমান, এভরিথিঙ ফ্লোজ, পৃষ্ঠা- ১৬২, ১৬৩)

অপর সমস্তকিছুকে ঘৃণা করার এই তীব্র হলাহলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চরম সত্যটি নিজ করতলে ধারণ করার অপরিসীম ঔদ্ধত্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজবিবর্তনের সার সত্যটি আবিষ্কার করে ইতিহাসের গতিকে পূর্বনির্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, সেই সত্য ও সেই বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের আচার্য হল কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত রাষ্ট্র হল ঐতিহাসিক প্রগতির সচেতন ক্রিয়াকর্তা। এই মতবাদিক বিশ্বাস রাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপকে ইতিহাসের অনিবার্য পদক্ষেপ হিসেবে হাজির করেছিল। বিশ্বের মেহনতী মানুষের স্বার্থ অসংখ্য বিচিত্র মেহনতী মানুষদের খণ্ডিত ব্যক্তিচৈতন্যে ধারিত হতে পারে না, কম্যুনিস্ট-পরিচালিত রাষ্ট্র তার অখণ্ড চৈতন্যেই কেবল মেহনতী মানুষদের সাধারণ স্বার্থকে ধারণ করে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুগামী হওয়া তাই প্রগতির পথে অনুঘটকের কাজ করা,

আর বিপরীতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের যে কোনওরকম বিরোধিতা করা হল প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের অংশ হওয়া। এইভাবে রাষ্ট্রকে কেন্দ্রে রেখে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থই সর্বোচ্চ, বিবিধ বিচিত্র মানুষের গোষ্ঠীস্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থকে হয় সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে আর নয়তো প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে গণ্য হতে হবে। এই ছিল কম্যুনিস্ট ভাবনাকাঠামো— কম্যুনিস্ট পার্টি-সদস্যদের ভাবনাকাঠামো, কোমসোমলের সদস্যদের ভাবনাকাঠামো।

রাষ্ট্র এখানে সর্বাত্মকতাবাদী, সত্যকে এখানে রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে হবে, জ্ঞানকে এখানে রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে হবে, জীবনাচার রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে হবে। কোনও এক ভবিষ্যতে রাষ্ট্রকে শুকিয়ে মারার জন্য সমাজজীবনের সবচেয়ে গহন প্রদেশ অবধি নিশ্ছিদ্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে। উৎপাদকদের উপর পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার শোষণ-নিপীড়ন নির্মূল করার লক্ষ্য ঘোষণা করে কৃষক ও শ্রমিকদের রাষ্ট্রের দাসে পরিণত করতে হবে।

ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক গতির ঘনীভূত মূর্ত রূপ হিসেবে যেখানে রাষ্ট্র অধিষ্ঠিত, সেখানে ইতিহাসের প্রগতির মহান লক্ষ্যে কিছু ব্যক্তিমানুষের বলি হয়ে যাওয়া নিয়ে আবেগাক্রান্ত হওয়াও তো একটি পেটিবুর্জোয়া দোষ বৈ আর কিছু নয়। রথের চাকা যখন গড়ায়, পথের ধুলোয় কত কীটপতঙ্গ পিষ্ট হয়, তা নিয়ে কি কেউ ভাবতে বসে? ন্যায়যুদ্ধে কিছু নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যেতে পারে বলে কি ন্যায়যুদ্ধ স্থগিত রাখা যায়? ফলে, ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত চাষ থেকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত চাষের যে পথ 'মহান শিক্ষক'-দের নির্দেশাবলী মেনে অনিবার্য প্রগতির পথ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে, তার রূপায়ন কি ব্যক্তিকৃষকদের প্রাণহানির আশঙ্কায় থমকে থাকবে? এমন ভাবনা কারও মনে দোদুল্যমানতা তৈরি করলেও তা নিঃসন্দেহে মানসিকতায় পেটিবুর্জোয়া আবর্জনা রয়ে যাওয়ার ফল। তাছাড়া মরছে কারা? ইউক্রেনের গাঁইয়া 'খোখলি'গুলো, যারা এখনও বুনো রয়ে গেছে, সভ্য হতে পারেনি। আধুনিক শিল্প-কারখানা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি আবাহনের এই রাষ্ট্র-পরিকল্পিত যজ্ঞে তাদের তো নিশ্চিহ্ন হতে হবেই— এক পথে না হোক অন্য পথে।

কম্যুনিস্ট পার্টি-সদস্য ও কোমসোমল-সদস্যরা তাই ইউক্রেনের কৃষকদের থেকে শেষতম খাদ্যকণাটুকুও ছিনিয়ে নিতে পারে চরম হিংসাত্মক ভাবে, উদরী-রোগে ফুলে ওঠা অনাহারীদের ভয়ানক মৃত্যুকে শ্রেণিশত্রু খতমের ঘৃণার চোখে

দেখতে পারে, আর শত্রু বহিঃরাষ্ট্র যাতে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার না চালাতে পারে তার জন্য গণহত্যার বাস্তব ঘটনাকে অনায়াসে অস্বীকার করে যেতে পারে।

কিন্তু, ইউক্রেনের কৃষকদের শ্রেণিশত্রু বলে খতম করা শেষ হলে তো এই ঘৃণা ও দম্ভের রাজনীতির পথ চলতে গেলে নিত্যনতুন আরও শত্রুকে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রপ্রগতির পথ পরিষ্কার করা চাই। তাই সর্বময় নেতা স্তালিনের পৌরাহিত্যে শত্রু খোঁজা ও শত্রুনিধন বজায় থাকল। গোটা সমাজ জুড়ে, এমনকি ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন যারা, তারা হলেন নয়া আক্রমণের লক্ষ্য।

ইউক্রেনের গ্রামগুলোকে কৃষকদের মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত করেও রাষ্ট্রীয় খামার যখন মস্কোর বেঁধে-দেওয়া পরিমাণ মতো শস্য সরবরাহ করতে পারল না, তখন নতুন করে আবার অপরাধী খোঁজার প্রয়োজন পড়ল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনেতারা তো শস্য-সরবরাহের পরিমাণ বাঁধায় ভুল করতে পারেন না, সেই অনুযায়ী শস্য উৎপাদন না হওয়ার কারণ তাহলে ইউক্রেনেই প্রতিবিপ্লবী শক্তির টিকে থাকার মধ্যে আছে। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে মস্কোর রাষ্ট্রকেন্দ্র থেকে পরপর দুটি ডিক্রি জারি করা হল। প্রথম ডিক্রিতে বলা হল যে ইউক্রেনে কম্যুনিস্ট পার্টির নিচের তলায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিরা (যাদের মধ্যে আছে কুলাক, পূর্বতন আধিকারিক, পেটলিউরার সমর্থক, ইউক্রেনিয় স্বশাসনের সমার্থক, ইত্যাদি) ভেক ধরে আত্মগোপন করে আছে, তারা

> ... রাষ্ট্রীয় খামারের ভিতরে নির্দেশক, প্রভাবশালী প্রশাসনিক কর্তা, হিসাবরক্ষক, ভাণ্ডারী, শস্য ঝাড়াইয়ের সর্দার ইত্যাদি পদে ঢুকে বসে আছে। গ্রামীণ সোভিয়েত, ভূমি ব্যবস্থাপনা দপ্তর, সমবায়গুলোর মধ্যেও তারা অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকে এখন তারা ভিতর থেকে প্রলেতারিয় রাষ্ট্র ও পার্টির স্বার্থের বিপরীতে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে তারা প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, শস্যরোপণ ও ফসলকাটার কাজে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে।... পার্টি-সদস্যপদের কার্ড পকেটে পুরে ফেলা এই অন্তর্ঘাতকারীদের দলই হল এখন পার্টি, শ্রমিকশ্রেণি এবং যৌথ খামারের কৃষকদের নিকৃষ্টতম শত্রু। কুলাক ও অন্য সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিকে খুশি করার জন্য এরা রাষ্ট্রকে ধোঁকা দিচ্ছে, জালিয়াতি করছে, পার্টি ও রাষ্ট্রের নির্ধারণ করে দেওয়া কর্তব্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে। ('রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ অফ সোশিও-পলিটিকাল হিস্ট্রি'-তে রক্ষিত ডিক্রির নথি থেকে অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃঃ-২১–য়ে উদ্ধৃত।)

দ্বিতীয় ডিক্রিতে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদকে প্রথম ডিক্রিতে চিহ্নিত প্রতিবিপ্লবী অনুপ্রবেশের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হল। বলা হল যে দূর-প্রাচ্য, কেন্দ্রীয় কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান সহ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদের প্রতিবিপ্লবী আদর্শ প্রভাব বিস্তার করছে, এমনকি ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির বেশ কিছু কমরেডও এর প্রভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ইউক্রেনিয়করণ করার পক্ষে সওয়াল করছে। দ্বিতীয় ডিক্রিতে আশু ভিত্তিতে ইউক্রেনিয়করণ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এবং ইউক্রেনিয়করণের পক্ষে সওয়ালকারীদের দমন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হল এবং সেই মোতাবেক উল্লিখিত অঞ্চলগুলোর জন্য অবিলম্বে পালনীয় নির্দেশ জারি করা হল। সেই নির্দেশের মধ্যে ছিল: ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা, ইউক্রেনিয় ভাষায় বই প্রকাশনা বন্ধ করা, সমস্ত স্কুলে ইউক্রেনিয় ভাষাশিক্ষা বন্ধ করে, রুশ ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসেবে পড়ানো, রুশ ভাষামাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। বলা বাহুল্য যে এই নির্দেশ অতি তৎপরতার সঙ্গে পালিত হয়েছিল।

প্রকাশনা মাধ্যম যেহেতু সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, তাই রাষ্ট্র-পোষিত 'রাইটার্স ইউনিয়ন' অর্থাৎ লেখকসঙ্ঘের সদস্য না হলে কোনও লেখা মুদ্রিত করা ছিল অসম্ভব। ১৯৩৪ সালে যে ইউক্রেনিয় তরুণ লেখকরা লেখকসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, রুশ ভাষায় লিখতে চাইলেও তাদের সবার আবেদন নাকচ করা হয়। এই নাকচ করার যুক্তি ব্যাখ্যা করে লেখকসঙ্ঘের অন্যতম কর্তা ইভান মিকিতেঙ্কো বিবৃতি দিয়েছিলেন:

> ওরা ওদের সক্ষমতা ও প্রতিভাকে কুলাক ও ইউক্রেনিয় প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সেবায় নিয়োজিত করেছিল। ওদের কাজে এখনও তেমন কোনও লক্ষণ ফুটে ওঠেনি, যা প্রমাণ করতে পারে যে ওরা পার্টি, সোভিয়েত সরকার এবং আমাদের এই মহান সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমির শ্রমিকদের সেবায় নিজেদের শিল্পকর্মকে নিযুক্ত করতে সমর্থ।
>
> (অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃঃ-২০–য়ে উদ্ধৃত।)

ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয় ইতিহাস নিয়ে চর্চারত সমস্ত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, গবেষক, লেখক, ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রের শত্রু, বিপ্লবের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হল। বরিষ্ঠ গবেষক হ্রুসেভস্কিকে ১৯৩১ সালেই গ্রেফতার করেছিল ওজিপিইউ, তারপর ওজিপিইউ-র তত্ত্বাবধানে আয়োজিত তিনটে 'আলোচনাসভায়' হ্রুসেভস্কির 'মুখোশ খুলে দিয়ে' তাঁকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী এবং পশ্চিমের

চর হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, তাঁর সারা জীবনের কাজকে ভুল ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং ইউক্রেন থেকে নির্বাসিত করা হয়। ককেশিয়ার কিসলোভোদস্ক-য়ে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল, ইউক্রেনে জনসমক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণও ছিল নিষিদ্ধ। ১৯৩৪ সালে রহস্যময়ভাবে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, এই 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'-র আড়ালে আসলে গোপনে খুন হন তিনি।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে ইউক্রেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউক্রেনিয় ভাষা ও ইতিহাসের পাঠক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। মার্চ মাসে ইউক্রেনিয় ভাষায় তৈরি সমস্ত স্কুলপাঠ্য পুস্তক বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইউক্রেনিয় ভাষাচর্চায় উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মিকোলা স্ক্রিপনিককে পার্টির মধ্যে 'ভেক-ধরা শত্রু' হিসেবে আক্রমণের কেন্দ্র করা হয়, ১৯৩৩-য়ের ৭-ই জুলাই তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৯৩২ ও ১৯৩৩– এই দুই বছরে সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ ওজিপিইউ ইউক্রেন থেকে গ্রেফতার করেছিল ২,০০,০০০ শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র ও লেখককে। ইউক্রেনিয় ভাষা ও ইতিহাস নিয়ে 'প্রতিক্রিয়াশীল' চর্চা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আক্রমণের লক্ষ্যমুখ করা হয়েছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে, এমনকি প্রকাশনা ও মুদ্রণশালাকেও। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু একটা গোটা প্রজন্মকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে জেলে পোরা হয়েছিল। সাইবেরিয়া,কাজাখস্তানের প্রত্যন্ত মনুষ্যবসতিহীন এলাকায় ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে পড়া বন্দিশিবির 'গুলাগ'-গুলিতে এই বন্দিদের ঠাঁই হয়েছিল। জীবিত অবস্থায় এঁরা আর ইউক্রেনে ফিরতে পারেননি।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৬-য়ের মধ্যে ইউক্রেনের চার্চ ও সিনাগগগুলোর তিন-চতুর্থাংশকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সংখ্যায় তা বেশ কয়েক হাজার। তাদের মধ্যে অনেকগুলোকে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ধ্বংস হয়েছিল পুরাতাত্ত্বিক বহু নথি ও নিদর্শন। কেবলমাত্র কিয়েভেই ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ৬৯-টি চার্চ পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল। বহুপ্রাচীন গির্জা ও মঠের শহর কিয়েভকে 'প্রতিক্রিয়াশীল স্থাপত্যশিল্প' থেকে মুক্ত করে 'আধুনিক প্রলেতারিয় স্থাপত্যশিল্পে' নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ওজিপিইউ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে বিশেষ সরকারি আয়োগ গড়ে তোলা হয়েছিল। কম্যুনিস্ট নেতা পোস্তিসেভ এ সম্পর্কে বলেছিলেন:

ইতিহাসের জমে থাকা আবর্জনাগুলোই হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের উৎস, এগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলে পার্টির পক্ষে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

(অ্যান অ্যাপেলবম, রেড ফেমিন, পৃঃ-২২৪–য়ে উদ্ধৃত।)

স্বভাবতই ঐতিহাসিক নিদর্শনের উপর এই কালাপাহাড়ি আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল যারা, রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে গ্রেফতার হতে হয়েছিল তাদেরও। 'কিয়েভ পেইন্টিং গ্যালারি'-র পরিচালক মিখাইলো পাভলেঙ্কোকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৩৪ সালে এবং তিন বছর নির্বাসনের পর ১৯৩৭ সালে গুলি করে মারা হয়। কিয়েভের 'ইনস্টিটিউট অফ দি হিস্ট্রি অফ মেটেরিয়াল কালচার'-য়ের অধ্যক্ষ ফেদির কোজুবোভস্কি-কে ১৯৩৮ সালে গ্রেফতার করে দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক জিজ্ঞাসাবাদের পর সটান গুলি করে মারা হয়। ৮১ বছর বয়সী শিল্প-সংগ্রাহক পাভলো পোতোতস্কিকে গ্রেফতার করে মস্কোর কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা কারাগারে বন্দি রাখা হয়, যেখানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

এরপর ১৯৩৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ লেখক ও তাদের বইয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করে, তার সঙ্গে ডিক্রি জারি হয় যে এই সমস্ত লেখকদের ইউক্রেনিয় সহ সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত লেখাপত্র পাঠাগার, দোকান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গুদামঘর থেকে সরিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এমন আরো তিনটে তালিকা এর পরপর বের হয়। তার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী বলে চিহ্নিত সমস্ত লেখক, কবি, শিল্প-সমালোচক, ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিকদের কাজ 'চিরদিনের জন্য' নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৩২ সালে রাষ্ট্র গড়ে দেয় 'সোভিয়েত সঙ্গীতরচয়িতাদের সঙ্ঘ'। তারই সঙ্গে গড়ে দেওয়া হয় সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর জন্য একাধিক 'সেনসর কমিটি'। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-অনুমোদিত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নন্দনতত্ত্ব'-য়ের বিচারে উত্তীর্ণ গীত বা গীতিনাট্য ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। গ্রামীণ ভ্রাম্যমান গায়ক কোবজারদের জড়ো করে হত্যা করার পূর্বোল্লিখিত ঘটনা এইসময়েই ঘটে। ইউক্রেনের গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও লোকগান নথিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার কাজে নিযুক্ত গবেষকরাও রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হন। গ্রামের অন্ধ ভ্রাম্যমান গায়ক কোবজারদের গানের সংকলন ও সঙ্গীত-পরম্পরা নিয়ে আলোচনার গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তিনজন ইউক্রেনিয় গবেষক— ক্লিমেন্ট খ্বিতকা, হ্নাট খোতকেভিচ ও কাতেরিনা হ্রুসেভস্কা। কাতেরিনা হ্রুসেভস্কাকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৩৪

সালে, কারাবন্দি করা হয় ১৯৩৭ সালে এবং গুলাগের বন্দিশিবিরে ১৯৪৩ সালে তিনি মারা যান। হ্যাত খোতকেভিচকে গুলি করে হত্যা করা হয় ১৯৩৮ সালে। ক্লিমেন্ট খ্বিতকাকে একাধিকবার গ্রেফতার করে গুলাগের বন্দিশিবিরে আটক রাখার পর ইউক্রেন থেকে নির্বাসিত করে মস্কোয় নজরবন্দি রাখা হয়, ১৯৫৩ সালে মস্কোতেই তিনি মারা যান।

অতঃপর আক্রমণ নামে খোদ ইউক্রেনিয় ভাষার উপর। স্ক্রিপনিকের তত্ত্বাবধানে বহু ভাষাতাত্ত্বিকের আদানপ্রদান ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বহু বছরের চর্চার ফসল হিসেবে যে ইউক্রেনিয় ভাষা-অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল, তাও নিষিদ্ধ করা হল। বলা হল যে সে অভিধানে 'নয়া বিপ্লবী সোভিয়েত শব্দসমূহকে' উপেক্ষা করে 'শ্রেণিশত্রুর চরিত্রসম্পন্ন শব্দদের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হল সেই অভিধান তৈরির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ভাষাবিদকে। এরপর ইউক্রেনিয় ভাষাকে শ্রেণিশুদ্ধ করে রুশ ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য সোভিয়েত সরকার নানা রীতি চালু করল। ইউক্রেনিয় বর্ণমালা থেকে 'ґ' বর্ণটিকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হল রুশ ভাষায় তা নেই বলে। বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দগুলোর ইউক্রেনিয় রূপের বদলে রুশ রূপ চালু করার নির্দেশ দেওয়া হল, ইউক্রেনিয় লোকসংস্কৃতিজাত প্রচুর শব্দকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিচরিত্রসম্পন্ন বলে বাদ দেওয়া হল। ইউক্রেনিয় ভাষায় যে গুটিকয় পত্রিকাকে প্রকাশনা চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তাদের দপ্তরে নিয়মিত সরকার থেকে দুটো তালিকা পৌঁছে যেত: 'কী কী শব্দ ব্যবহার করতে হবে' এবং 'কী কী শব্দ ব্যবহার করা যাবে না'। কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তারা এই তালিকা তৈরি করতেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে কোনও কর্তার পতন হয়ে নতুন কর্তার উত্থান হলে এই তালিকাও আবার বদলে যেত, এমনকি ওলটপালটও হয়ে যেত, ফলে অনুমোদিত ভাষা একটি সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। আর রুশ ভাষাকে সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারের ভাষা হিসেবে চালু করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত হল।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরেই লেনিনগ্রাদ (পূর্বতন সেন্ট পিটার্সবার্গ)-য়ে কম্যুনিস্ট পার্টি নেতা সের্গেই কিরভ খুন হন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে স্তালিনই কিরভকে খুন করার নির্দেশ দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তখন স্তালিন এই খুনের পিছনে পার্টির মধ্যে থাকা 'মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতকদের' দায়ী করে শোক-আশঙ্কা-ক্রোধের চরম প্রতিক্রিয়া জানান। ঘোষণা করেন যে এই বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করে

নিশ্চিহ্ন করে পার্টির শুদ্ধিকরণ করতে হবে। গুপ্ত পুলিশ ওজিপিইউ সেই কাজ করতে নামে। হাজার হাজার পার্টি সদস্যদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। স্তালিন ছাড়া বাকি সর্বোচ্চ নেতাদেরও সাজানো বিচার-প্রদর্শনীতে সাজানো অপরাধে অপরাধী চিহ্নিত করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। মানুষকে বলা হয় বিশ্বাসঘাতকদের চিহ্নিত করার জন্য সজাগ নজরদারি বজায় রাখতে, কারও আচরণ সন্দেহজনক মনে হলেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে। এমনকি স্কুলে শিশুদের শেখানো হল তারা কীভাবে মা-বাবা সহ পরিবারের অন্যদের উপর নজর রাখতে পারে। পড়শি বা পরিবারের কারও সম্পর্কে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহ নথিভুক্ত করা মানুষদের 'সমাজতন্ত্রের জন্য আদর্শ যোদ্ধা' হিসেবে তুলে ধরা হতে লাগল প্রচারমাধ্যমে। সময়টা হয়ে উঠল অদ্ভূত। সকলেই একে অপরকে আড়চোখে দেখে। সকলেই একে অপরকে সন্দেহ করে। আর সকলেই একে অপরকে ভয়ও পায়। কে কখন কার নামে সন্দেহ নথিভুক্ত করবে, কে কখন বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়ে যাবে, তা কিছু বলা যায় না। লাখে লাখে মানুষকে গ্রেফতার করে সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানের 'গুলাগ'-গুলোয় পাঠানো হল। ওজিপিইউ-র নাম পাল্টে তখন হয়েছে এনকেভিডি। এই এনকেভিডি-ই গ্রেফতার করা থেকে শুরু করে গুলাগ-পরিচালনা অবধি সমস্তকিছু করত। রুশ মহাফেজখানায় রক্ষিত এনকেভিডি-র নথিতে লিখিত হিসাব বলছে যে ১৯৩০ সালে গুলাগের বন্দিসংখ্যা ছিল ১লাখ ৭৯ হাজার, ১৯৩৪ সালে ৫ লাখ ১০ হাজার ৩০৭, আর ৮ বছর পর ১৯৩৮-য়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮লাখ ৮১ হাজার ৫৭০। (সূত্র: অ্যান অ্যাপেলবম, গুলাগ: এ হিস্ট্রি, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫১৫-৫১৬) অর্থাৎ ১৯৩০–১৯৩৪ চার বছরে ৪ লাখের কিছু কম মানুষকে গুলাগে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে পরের চার বছরে পাঠানো হয়েছিল তার তিন গুণেরও বেশি ১৩ লাখের বেশি মানুষকে। এদের বেশিরভাগই আর স্বাধীন জীবনে ফিরে আসতে পারেনি।

গোটা সোভিয়েত দেশ জুড়েই এই বেলাগাম সন্ত্রাস জারি হলেও, তা সবচেয়ে মারাত্মক চেহারা ধারণ করে ইউক্রেনে। সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি এবার আক্রমণ তীব্র হল কমুনিস্ট পার্টির সদস্যদের উপরও। পার্টিকে শুদ্ধ করার নামে, মুখোশ-পরা কুলাক ও ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী খুঁজে বের করার নামে একের পর এক ইউক্রেনিয় পার্টিকর্মীদের গ্রেফতার করে, সাজানো বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল, নয়তো গুলাগে পাঠানো হল। পার্টির তলা থেকে নিচ উজাড় করে ফেলা হল। আঞ্চলিক প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কম্যুনিস্ট আধিকারিক,

রাষ্ট্রীয় খামারের কম্যুনিস্ট পরিচালক-ব্যবস্থাপক, ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনের পদাধিকারী, আঞ্চলিক নেতা– কেউ রেহাই পেল না। স্তালিনের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে নিকিতা ক্রুশ্চেভ (রুশ জাতীয়তার, কিন্তু ইউক্রেনেই জন্ম) এই সন্ত্রাস পরিচালনা করলেন। ১৯৩৮ সালে ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে যখন নয়া সেন্ট্রাল কমিটি তৈরি হল, তখন তাতে ঠাঁই পাওয়া ৮৬ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন আগের বছরেও ছিলেন, আগের বছরের বাকিরা হয় নির্বাসিত নয়ত মৃত্যুদণ্ডে মৃত।

সংবাদমাধ্যম ও অন্য সমস্ত প্রচারমাধ্যমে গ্রেফতার হওয়া, নির্বাসিত হওয়া, রাষ্ট্রের হাতে খুন হওয়া বা অকালে মারা যাওয়া এই লাখ লাখ মানুষদের দেখানো হল বিদেশের চর, অন্তর্ঘাতকারী, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আর এই শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে প্রায় একা সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে যাওয়া বীর স্তালিনকে মহান পিতা হিসাবে প্রায় ভগবানের আসনে বসানো হল।

রাষ্ট্রের দমনশক্তির চূড়ান্ত বিস্তারের সামনে আত্মসমর্পণ করে প্রতিটা মানুষ বিচ্ছিন্ন, প্রতিটা মানুষ সন্দেহের পাত্র। প্রতিটা মানুষই যেমন নজরবন্দি, তেমন প্রতিটা মানুষই যেন আবার রাষ্ট্রের নজরদার চোখ। সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এখন সম্পূর্ণ।

১৮

শিল্পায়ন-নগরায়ন

কুলাক-নিশ্চিহ্নকরণ ও খাদ্য কেড়ে নিয়ে গণহত্যা— এই দুইয়ের জোড়া আঘাতে সোভিয়েত ইউক্রেনের গ্রামজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল। গ্রামের মানুষ বাঁচার অবলম্বন খোঁজার জন্য শহরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার দ্রুতগতি শিল্পায়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউক্রেনে বেশকিছু কারখানা ও খনি পত্তন করেছিল শহর ও শহরতলীতে। ডনবাস, কিয়েভ, খারকিভ এবং নিপরোপেত্রভস্ক অঞ্চলে ৩০টি বড় খনি ও ৩৮৬টি শিল্প-কারখানার পত্তন করা হয়েছিল ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে। বাঁচার জন্য ইউক্রেনের গ্রামের কৃষক সেখানে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে উঠল।

১৯২০-র দশকের শেষদিকেই এই টান জোরালো হয়ে উঠেছিল। গ্রামের কৃষিকাজ ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন বেছে নেওয়া এক ইউক্রেনিয় শ্রমিক এর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে:

> শ্রমিকরা মজুরি পায়, যা যদি বা কম হয়, তবু স্থায়ী এবং নিশ্চিত। কিন্তু গ্রামের রাষ্ট্রীয় খামারের মজুরেরা সমান সময় বা আরও বেশি সময় শ্রম করলেও, তাদের পাওনার কোনও নিশ্চিতি নেই। শিল্পায়নের প্রথম বছরগুলোয় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনেক ভালো। তারা আলু পেত, রুটি পেত, অন্যান্য খাবার পেত তুলনায় বেশি পরিমাণে। শিল্পে কাজ করার জন্য লোক আকর্ষণ করতে এমনটা করা হয়েছিল।
>
> (জর্জ ও লিবের, সোভিয়েত ন্যাশনালিটি পলিসি আর্বান গ্রোথ অ্যান্ড আইডেন্টিটি চেঞ্জ ইন দি ইউক্রেনিয়ান এস এস আর, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২– বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

জনৈক সোভিয়েত আধিকারিকও ইউক্রেনিয়ায় কৃষিমজুর ও শহরের শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য সম্পর্কে বলেছিলেন:

একজন দায়িত্ববান শ্রমিক মাসে ২৪ রুবল মজুরি পায়।... রাষ্ট্রীয় খামারের মজুররা মাসে গড়ে ৫ রুবল থেকে ৭ রুবল মতো পায়।... রাষ্ট্রীয় খামারের মজুররা তাই গ্রাম ছেড়ে শহরের শ্রমদপ্তরে এসে নাম লেখায়, কারণ নথিভুক্ত বেকার হলেও সে মাসে ১৩ রুবল বেকারভাতা পাবে।

(জর্জ ও লিবের, সোভিয়েত ন্যাশনালিটি পলিসি আর্বান গ্রোথ অ্যান্ড আইডেন্টিটি চেঞ্জ ইন দি ইউক্রেনিয়ান এস এস আর, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২– বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

গ্রামের রাষ্ট্রীয় খামারগুলো তার মজুরদের শহরের বিভিন্ন কারখানায় বা খনিতে অদক্ষ শ্রমের কাজে চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া দিত। বলা চলে যে এক-একটা রাষ্ট্রীয় খামার হয়ে উঠেছিল এক একজন লেবার-কন্ট্রাক্টর। চুক্তি হত শহরের কারখানা বা খনির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় খামারের, সেই চুক্তি অনুযায়ী পাঠানো মজুর ন্যূনতম এক বছর ওই কারখানায় বা খনিতে খাটতে বাধ্য ছিল। ১৯৩১ সাল নাগাদ এই কারখানা-খামার চুক্তিতে মজুর নিয়োগ হয়ে উঠেছিল কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের প্রধান উপায়। অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় এইভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাইনে ছিল কম, সুযোগ-সুবিধা-অধিকারও ছিল কম। প্রচুর গ্রামীণ মহিলাও এভাবে শিল্পশ্রমিকদের দলে প্রবেশ করেছিল। ১৯৩১ সালে প্রায় ১০ লাখ মহিলা শহরে কাজ করছিল, মোট শ্রমিকসংখ্যার তা ২৭.৫ শতাংশ। ১৯৩২ সালের হিসাব বলছে যে গ্রামের কৃষকঘর থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা ইউক্রেনের নতুন খনিগুলোর শ্রমিকের ৮০ শতাংশ, ধাতুশিল্পের কারখানার নবনিযুক্ত শ্রমিকের ৬৩ থেকে ৭৫ শতাংশ।

গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন এই মানুষদের জীবন একধাক্কায় পাল্টে গেল। মাঠ-বিল-নদীপারের খোলা আকাশের নীচে কৃষিকাজের বদলে ধোঁয়া-ধুলো-কালি-যন্ত্রে ঠাসা অপরিসর কারখানা-কক্ষে বা খনিগর্ভে প্রতি মুহূর্তে নজরবন্দি থেকে শ্রম-অধিকর্তাদের নির্দেশপালন, সবজি বাগান ঘেরা নিজস্ব কুটির হারিয়ে ঘিঞ্জি অপ্রশস্ত অস্বাস্থ্যকর কাঠের খোপের সারিতে ঠাসাঠাসি করে থাকা, দীর্ঘদিনের চেনা মানুষ চেনা পরিবেশ ছেড়ে তিক্ত হতভাগ্য মানুষদের জটলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা। গ্রামের উৎসব, মেলা, কোবজারদের গান-নাটক সবই কেবল স্মৃতি, বাস্তব কেবল সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্দেশিত কার্যক্রমে কাঠের পুতুলের মতো অংশ নেওয়া।

আর বদলে গেল শহরের চালচিত্রও। এতদিন ধরে শহর ছিল পোল বা রুশ অভিজাতদের আস্তানা, ইহুদি কারিগর, ব্যবসায়ী, পেশাজীবীদের আস্তানা,

রুশীভূত হয়ে যাওয়া ইউক্রেনিয় অভিজাতদের আস্তানা। শহরের শ্রমিকদের মধ্যেও রুশভাষী তো বটেই, এমনকি রুশ জাতীয়দেরই ছিল প্রবল সংখ্যাধিক্য। গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে আসা এই মানুষের ঢল তা পাল্টে দিল। ইউক্রেনিয় ভাষা ও ইউক্রেনিয় জাতীয়তা এই উচ্ছিন্ন মানুষদের হাত ধরেই শহরে জানান দিতে শুরু করল।

১৯২৬ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী ইউক্রেনের অধিবাসীর ৮০ শতাংশ ছিল ইউক্রেনিয়, ৯ শতাংশ রুশ ও ৫ শতাংশ ইহুদি। কিন্তু মাত্র ১১ শতাংশ শহরবাসী। ইহুদিদের ৭৭.৪ শতাংশ আর রুশদের ৫০ শতাংশ শহরবাসী। ইউক্রেনিয়রা অধিকতই গ্রামবাসী। তবু শহরের জনসংখ্যার ৪৭.২ শতাংশ ইউক্রেনিয়, শতাংশের বিচারে যা রুশদের থেকে বেশি, রুশরা শহরের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। কিন্তু রুশদের আধিপত্য সংখ্যার জোরে নয়, তার ভিত্তি অন্য জায়গায়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর, কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন শাখাসংগঠন, শহুরে বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তি, এমনকি শহুরে শ্রমিকদের মধ্যেও রুশদের দখলেই রয়েছে সমস্ত উচ্চপদস্থ বা কর্তৃত্বব্যঞ্জক পদগুলি। রাষ্ট্রের হয়ে নির্দেশ দেওয়া, নির্দেশ পালন করানো ও নজরদারি করার অধিকার রুশদের হাতে। তাই শহরবাসী ইউক্রেনিয় ও ইহুদিদের মধ্যে রুশ আধিপত্যের চাপে বা উচ্চতর সামাজিক সম্মানের প্রলোভনে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি ছেড়ে রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করার প্রবণতা প্রবল ছিল। শহরের ২১ শতাংশ মানুষ এভাবে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি ছেড়ে রুশ ভাষা-সংস্কৃতিতে সরণ ঘটিয়েছিল— এর মধ্যে ছিল ইহুদিদের ২৮.৩ শতাংশ এবং ইউক্রেনিয়দের ২৪.৭ শতাংশ। আলাদাভাবে শ্রমিকদের বিচার করলেও এই একই প্রবণতা দেখা যায়।

১৯২৬-য়ের পর গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন ইউক্রেনিয়দের শহরমুখী স্রোত ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ১৯৩১-১৯৩৪ নাগাদ প্লাবনের আকার নেয়। শহরের ভাষা-মানচিত্রে এর প্রভাব পড়তে থাকে। ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বন্টনসংখ্যা এর একটা আন্দাজ দিতে পারে। ১৯২৫ সাল থেকে ইউক্রেনিয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং তাদের মোট বন্টনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ১৯৩২ সালে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। ১৯২৫ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালের মোট বন্টনসংখ্যা ছিল ১০ গুণেরও বেশি। ১৯২৯ সাল নাগাদই ইউক্রেনিয় ভাষার সংবাদপত্রের মোট বন্টনসংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছিল রুশ ভাষার সংবাদপত্রের (ইউক্রেনে প্রকাশিত ও রাশিয়া থেকে আমদানি হওয়া উভয়কে

ধরেই) মোট বন্টনসংখ্যাকে। সংবাদপত্রের বন্টন যেহেতু মূলত শহরগুলোতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, তাই এর থেকে বোঝা যায় যে ১৯২৬ সালের পর থেকে শহরগুলোয় ইউক্রেনিয় ভাষাব্যবহারকারীর সংখ্যা চড়াহারে বাড়ছিল। শ্রমিকসঙ্ঘের করা নিজেদের সদস্যদের মধ্যে করা শুমারিতেও এর ছাপ দেখা যায়। ১৯২৬ সালে যেখানে শ্রমিকসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে ৪৯.৯ শতাংশ নিজেকে ইউক্রেনিয় জাতীয় ও ইউক্রেনিয়ভাষী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল, সেখানে ১৯৩১ সালের অক্টোবরে ৫৮.১ শতাংশ সেই পরিচয় দিয়েছিল। শ্রমিকসঙ্ঘের সংগঠকদের ব্যবহৃত ভাষা হিসেবেও ইউক্রেনিয় ভাষা ১৯২৬ সালে ৩৩.২ শতাংশ থেকে ১৯২৯ সালে ৪৩.৯ শতাংশে উঠে এসেছিল, যদিও তখনও রুশ ভাষার ব্যবহার তার থেকে বেশি ছিল। ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টির শহুরে শাখাগুলোতেও ইউক্রেনিয় সদস্যের সংখ্যা বেড়েছিল, যদিও সেই ইউক্রেনিয়রা মূলত রুশীভূত রুশভাষী ছিলেন।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হওয়া গ্রাম থেকে জীবনরক্ষার দায়ে শহরে ভেসে আসা মানুষগুলো তাদের ভাষা ও জাতীয় স্ব-চিহ্নিতকরণ বয়ে নিয়ে এসে এতদিনের শহুরে চালচিত্রটাকে বদলে দিচ্ছিল। অবশ্য ১৯৩১ সালের পরের বছরগুলোর কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। ১৯২৬ আদমশুমারির বিশদ ফল প্রকাশের পর সোভিয়েত ইউক্রেনের রাষ্ট্র এহেন পরিসংখ্যান প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। ১৯২২ সাল থেকে ১০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছিল পরিসংখ্যানের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রাদিয়ানস্কি স্ট্যাটিস্টিক'। এছাড়াও এই ১০ বছরে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০ খণ্ড 'স্ট্যাটিস্টিকা ইউক্রেনি'। এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানগুলি ওই সূত্রেই পাওয়া। কিন্তু ১৯৩২ সালে এই দুটি প্রকাশনাই রাষ্ট্রীয় নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ অবধি 'রাদিয়ানস্কি স্ট্যাটিস্টিক'-য়ের 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' হিসেবে কাজ করা ভাসিল সোকিল লিখেছেন:

> ১৯২৯-য়ের পরের বছরগুলোর পরিসংখ্যানে এমন তথ্য ছিল ভুরিভুরি যা অতি বিব্রতকর বললেও কম বলা হয়, যা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক... যা প্রকাশিত হলে ইউক্রেন জুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর আলো পড়ে যেত। ১৯৩০ সালের মার্চ মাস থেকেই ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান প্রশাসনের সমস্ত নথিকে রাষ্ট্রের গোপন নথি বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল, আর

কখনও সখনও যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হতে লাগল তাকে প্রকাশের আগে রাষ্ট্রের ইচ্ছামতো সাজিয়ে গুজিয়ে বদলে নিয়ে হাজির করা হতে লাগল। (জর্জ ও লিবের, সোভিয়েত ন্যাশনালিটি পলিসি আর্বান গ্রোথ অ্যান্ড আইডেন্টিটি চেঞ্জ ইন দি ইউক্রেনিয়ান এস এস আর, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২– বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

'অতি বিব্রতকর... সরকারের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক... ইউক্রেন জুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার' মধ্যে গ্রামে কুলাক নিশ্চিহ্নকরণ ও খাদ্য কেড়ে নিয়ে গণহত্যা অন্যতম। শহরের শ্রমিকরাও এই প্রক্রিয়ার থেকে কীভাবে রেহাই পেলেন না তা দেখা যাক।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তি-সাল ছিল ১৯৩২। সর্বময় নেতা স্তালিন সহ অন্যান্য রাষ্ট্র-পরিচালকরা এই ৫ বছরে শিল্পোৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা ছিল ইউক্রেনের শস্যসংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার মতোই অবাস্তব রকমের আকাশচুম্বী। মেহনতী মানুষদের স্বর্গ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতেই হবে, এমনটাই ছিল রাষ্ট্রীয় নির্দেশ। সর্বময় নেতার নেকনজরে থাকতে পার্টি-প্রশাসনের মেজোকর্তা-ছোটকর্তারা অতি-উৎসাহ দেখিয়ে ৫ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কি ৪ বছরে পূর্ণ করার শপথ ঘোষণা করেছিলেন, খনিতে ও কারখানায় শ্রমিকদের উপর প্রবল অমানুষিক চাপ তৈরি করেছিলেন। 'পুঁজিবাদী' দেশের কারখানাতেও শ্রমিকদের এমন চাপ সহ্য করতে হয়না। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক-অসন্তোষ, এমনকি শ্রমিক-বিদ্রোহ দেখা দিলে পার্টি-প্রশাসন-গুপ্তপুলিশের কড়াহাতে তা দমন করা হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের করায়ত্ত সমস্ত প্রচারমাধ্যমে দেখানো হয়েছিল সোভিয়েত শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে উৎপাদনের হারকে অলৌকিক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব তা ছিল না। বাস্তবের আঁচ পাওয়া যায় পার্টি-প্রশাসন ও ওজিপিইউ-র আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নথিতে শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে হওয়া নানা আদানপ্রদানের মধ্যে। যেমন ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে সরাসরি স্তালিনকে পাঠানো কেন্দ্রীয় পার্টি কমিটির প্রতিবেদনে সোভিয়েত শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-ধর্মঘটের ঢেউ ওঠার বিবরণ দিয়ে উপসংহারে লেখা হয়েছিল:

এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে ...ভিচুগা এবং তেইকোভোতে... এপ্রিল মাসের ৭ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে— শ্রমিকরা ধর্মঘটে নেমেছে, নাগরিক পুলিশবাহিনীকে নির্দয়ভাবে মারধোর করেছে, ওজিপিইউ-র উপর দলবেঁধে

চড়াও হয়েছে,... জেলা পার্টি কমিটির উপর হামলা চালিয়েছে, ইভানোভো অবধি একটি 'ক্ষুধার্তদের মিছিলের' আয়োজন করেছে, (রাষ্ট্রীয় খামার থেকে কৃষকদের বেরিয়ে আসতে ইন্ধন দিয়ে) গ্রামীণ অঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে, কারখানার মধ্যে তাঁতযন্ত্রগুলো ভাঙচুর করেছে, তাঁতের টানা সুতো কেটে দিয়েছে, ধর্মঘট অগ্রাহ্য করে কাজ করতে আসা লোকেদের তাঁতের মাকু দিয়ে নির্দয়ভাবে মারধোর করেছে। এর মধ্য দিয়ে মূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে মেহনতী জনতার থেকে পার্টি-সংগঠনের বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রমিকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে গুরুতর খামতি, যার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তি গণবিক্ষোভ সংগঠিত করেছে।

(জেফ্রি জে রসম্যান, ওয়ার্কার রেজিসটেন্স আন্ডার স্তালিন: ক্লাস অ্যান্ড রিভলুশন অন দি শপ ফ্লোর, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫– গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

এখানে উল্লিখিত ঘটনাগুলি মস্কোর উত্তরপূর্বে ইভানোভো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চলের বস্ত্রবয়নশিল্পে ঘটেছিল। শ্রমিকদের ক্ষোভের কারণ ছিল বহু। 'উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা'-র নামে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ অমানুষিকভাবে বাড়ানো এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া, নানা ছুতোয় মজুরি কাটা, খাবারের বরাদ্দ ক্রমশ কমতে থাকা ছিল সবচেয়ে সামনের কারণ। এছাড়াও ছিল আরেকটি ভিতরের কারণ। শ্রমিকদের মধ্যে যারা শোষণহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্খা পোষণ করত, তারা ক্রমশ সোভিয়েত সরকার-প্রশাসনকে সেই আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের এই মনোভাব ও আচরণ থেকে নিজেদের 'সমাজতন্ত্র গঠনের পথ' শুধরানোর জন্য কোনও সতর্কবার্তা খুঁজে পায়নি, তাদের বিশ্লেষণে এ সবই শ্রমিকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 'পশ্চাদপদতা' বা 'অসচেতনতা'র ফল, তাদের আরও পরিচর্যা করে কম্যুনিস্ট পার্টির 'সঠিক' অবস্থানের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে আর সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিকে দমন করতে তৎপর হতে হবে যাতে তারা শ্রমিকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে না পারে। ফলে ওজিপিইউ-র দ্বারা আরও নজরদারি, আরও দমন।

শিল্পাঞ্চলের এই চেহারা ও মেজাজ মাত্রার হেরফের নিয়ে গোটা সোভিয়েত দেশেই বিস্তৃত হয়েছিল। ইউক্রেনের নতুন বা পুরানো কারখানা ও খনিগুলোতেও শ্রমিকদের মজুরি ছাঁটা, মজুরিপ্রদান অনিয়মিত হয়ে যাওয়া ও

খাদ্য রেশনে কাটছাঁট বাড়ছিল, যদিও গ্রামের কৃষকদের মতো অনাহারে তাদের থাকতে হয়নি। এখানেও শ্রমিক-অসন্তোষ ধূমায়িত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই বাড়ছিল ওজিপিইউ-র নজরদারি। ক্রমশ আরও সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের কারণ গ্রাম থেকে 'কুলাকোচিত' ভাবনাচিন্তা বহন করে এনে তারা অন্যদের তা দিয়ে সংক্রামিত করছে বলে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা বারবার সতর্ক করছিলেন।

অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির অটল প্রকল্পের বজ্রআঁটুনির মধ্যেই ফস্কা গেরো হিসেবে ছিল পরিকল্পনার অবাস্তবতা, বিভিন্ন শিল্পশাখার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আর দেখনদারির ফাঁকি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে এসে দেখা গেল যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন হয়েছে গোটা সোভিয়েত দেশেই। ২ কোটি ২০ লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৩৫ লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ৭ কোটি ৫০ লাখ টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় উৎপাদন হয়েছে ৬ কোটি ৪৪ লাখ টন, ১ কোটি টন ঢালাই লোহার বদলে ৬২ লাখ টন ঢালাই লোহা, ১ লাখ ৭০ হাজার ট্রাক্টরের বদলে ৪৯ হাজার ট্রাক্টর আর ১ লাখ গাড়ির বদলে মাত্র ২৪ হাজার গাড়ি। সোভিয়েত রাষ্ট্রকর্তারা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করতে পারার সব দায়, সব দোষ নিক্ষেপ করলেন শ্রমিকদের ঘাড়েই। সর্বোচ্চ সোভিয়েত নেতারা ঘোষণা করলেন যে শ্রমিকদের মধ্যেই আছে ভেক-ধরা 'অন্তর্ঘাতক', 'ধ্বংসকারী ও লুঠেরা', 'শ্রেণিশত্রুরা'— তারা বিদেশি ষড়যন্ত্রী, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ও অ-রুশ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে চক্রান্ত করে 'সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য'-কে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিদান ঘোষণা হল যে এই শত্রুদের খুঁজে বের করে, ভেক খুলে দিয়ে 'ধ্বংস' করতে হবে সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমিতে সমাজতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য। শিল্পাঞ্চল জুড়ে তীব্র হল ওজিপিইউ-পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। কারখানা ও খনির শ্রমিকদের গ্রেফতার করে সাজানো অভিযোগে 'অন্তর্ঘাতক' বলে চিহ্নিত করে গুলাগ-য়ের বন্দিশিবিরে চালান করা চলল জোরকদমে। আর ইউক্রেনে 'ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের' বিরুদ্ধে দমন-অভিযানও তুঙ্গে তোলা হল, যার বিবরণ আমরা আগেই দেখেছি। ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল শহরাঞ্চলে। ১৯২৬-য়ের পর থেকে ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার যে ছাপ শহরে পড়তে শুরু করেছিল, তা মুছে রুশ ভাষা ব্যবহার এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে নিরঙ্কুশ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তীব্রতর হল।

এই ১৯৩০-য়ের দশকে ইউক্রেনের কিয়েভ শহরের বাসিন্দা সোভিয়েত-ইউক্রেনিয় লেখক ও শিল্প-সমালোচক বোরিস আন্তোনেঙ্কো-দাভিদোভিচ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন এইভাবে:

> এটা কারও কাছে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হতে পারে যে ইউক্রেনিয় ভাষা শেখার সবচেয়ে 'স্বাভাবিক' ও সবচেয়ে ভালো পন্থা হল ইউক্রেনের কোনও শহরে বাস করার মাধ্যমে শেখা। তিনি হয়ত অনুমান করেন যে কিয়েভের রাস্তায় বেশির ভাগ কথাবার্তা ইউক্রেনিয় ভাষাতেই শোনা যায়, আর শহরের পাঠাগার থেকে গ্রাহকরা ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় ভাষার বই সংগ্রহ করে। '২+২=৪'-য়ের মতোই কি এ সত্য নয়? না, ইউক্রেনে আমরা যে অবস্থায় আছি, সেখানে এখনও তা ফলেনি। আমাদের কাছে এখনও এ এক বিমূর্ত উপপাদ্য মাত্র। ইউক্রেনিয়ার কোনও শহরে কেউ সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে ইউক্রেনিয় ভাষা বিন্দুমাত্র না জেনে। কিয়েভের রাস্তায় কোনও গণপরিবহনে উঠে গাড়ির পরিচালককে ইউক্রেনিয় ভাষায় যদি কোনও প্রশ্ন করা হয়, তবে সে তা বুঝবে না অথবা না বোঝার ভান করে থাকবে। একজন ইউক্রেনিয় ভাষার লেখক অঞ্চলের পাঠকগোষ্ঠীদের কোনও সভায় হাজির হলে দেখবে যে অন্তত ৯০ শতাংশই তার কোনও লেখা পড়েনি, এমনকি তার সম্পর্কে কোনওকিছু শোনেওনি কোথাও।
>
> (জর্জ ও লিবের, সোভিয়েত ন্যাশনালিটি পলিসি আর্বান গ্রোথ অ্যান্ড আইডেন্টিটি চেঞ্জ ইন দি ইউক্রেনিয়ান এস এস আর, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২– বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

আর এই কিয়েভের তুলনায় খারকিভ বা পুবের অন্য শহরগুলো ছিল আরও বেশি রুশীভূত! কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা চিন্তিত ছিলেন যে গ্রামীণ কৃষি-অঞ্চলে ঘেরা কিয়েভ শহরের রুশীকরণ ও সোভিয়েতকরণে খামতি থেকে যাচ্ছে। তাই এই খামতি পূরণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতভাবে সরকারি প্রশাসন ও পার্টির সদর কেন্দ্র খারকিভ থেকে সরিয়ে কিয়েভে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। আরও ধরেকষে কিয়েভ থেকে ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার সংক্রমণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ পুনর্বহাল করা হয়।

১৯

জনৈক রুশ শ্রমিকের দুটি কবিতা

কাপিটন ভাসিলিয়েভিচ ক্লেপিকভ ইভানোভো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চলের রডনিকি মিলের একজন শ্রমিক। ফ্যাক্টরি কমিটির সদস্য এবং কম্যুনিস্ট। ১৮৮০ সালে কৃষক-পরিবারে জন্ম। ২০ বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন আর ১৯১৭-পরবর্তী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে শ্রমিক ভলান্টিয়ার হিসাবে লালফৌজের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ১৯২৮ সালে রোডনিকি মিলের সংলগ্ন এলাকার বস্ত্রবয়ন কারখানাগুলোয় পরিস্থিতি নির্ণয়ের জন্য তৈরি একটি পর্যবেক্ষক দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুলাই মাসে চলে সেই পর্যবেক্ষণ সফর। আগস্ট মাসের ৭ তারিখে রডনিকি মিলে আয়োজিত এক শ্রমিকসভায় ৬৮ জন সহকর্মীর সামনে ক্লেপিকভ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

> ফ্যাক্টরি কমিটিগুলো এখন আর শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করেনা, তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে জার আমলের কুখ্যাত পুলিশের মতো। ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের বিকিয়ে দিয়েছে শ্রমিকদের উপর নির্মম শোষণ চালানোর কাজে আপ্তসহায়ক হয়ে উঠেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের ঠকিয়েছে, ১১ বছর ধরে কেবল মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে। শ্রমিকশ্রেণির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের স্তালিন সোলোভকির শ্রমশিবিরের তপ্ত চাটুতে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

এরপর তিনি দেশের স্বৈরাচারী সরকারকে কাঠগড়ায় তুলতে সম্প্রতি রচিত তাঁর তিনটি কবিতা পাঠ করেন। তার মধ্যে একটি কবিতা হল :

প্রতর্ক

রাশিয়ায় সত্যকে ধুলোয় ফেলে পায়ে দলা হয়েছে
আর মিথ্যাই আধিপত্য করছে।

এখানে চাটুকারদের পিঠ চাপড়ানো হয়
সত্যবাদীরা হয় উপহাসের পাত্র।

বদমাশরা বসে আরামদায়ক উচ্চ পদে,
আর সৎজনেদের পাঠানো হয় নির্বাসনে
আজ সোলোভকিতে তো কাল তুর্কিস্তানে
ঠান্ডা করার জন্য।

সাত-সাতখানা তালা ঝুলিয়ে
মুক্ত প্রচারমাধ্যমের মুখে কুলুপ আঁটা হয়েছে।
সরকারি প্রচারমাধ্যম কেবলই
বলশেভিকদের প্রশস্তি গেয়ে যায়।
বাকস্বাধীনতা নেই,
সংগঠনের স্বাধীনতা নেই, আর নেই কোনও স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন।

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে
বলশেভিকদের সম্পর্কে এখন মুখ না খুললেই নয়—
ওই 'সম্ভ্রান্ত' কম্যুনিস্টদের মতো
বদমাশ আর কেউ নেই,
ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গেই ওদের তুলনা চলে।

গমের আটা নেই একটুও,
যবও এখন বাড়ন্ত।
ভাতের বদলে ওরা আমাদের
ভদকা খেতে দেয়।
মদের নেশায় চুর করে রাখতে চায় আমাদের,
আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে তারা ভীত।

শ্রমচুক্তি হয়ে উঠেছে মূল্যহীন এক টুকরো কাগজ,
নিয়োগকর্তারা তার কোনও মূল্য দেয়না,
বলে যে তাদের ওতে কিছু যায় আসে না।

প্রতি বছরই সোভিয়েত কম্যুনিস্টরা
গাদায় গাদায় বাৎসরিক ছুটি কাটাতে ছোটে

ক্রিমিয়া, ককেশাস আর উরালের
হেল্‌থ-রিসর্টে।
গুটিকয় শ্রমিকদেরও পাঠানো হয় বটে,
তবে তা কেবল মুখরক্ষার তাগিদে।
বলা হয় যে 'সকলেই সমান—
কেবল শ্রমিকরা কম আবেদন করে, এই যা!'

তপ্ত আবহাওয়ায় গজানো ছত্রাকের মতো
প্রতিষ্ঠান মাথা তোলে এদিকে ওদিকে,
কেবল শ্রমিকদের তা কোনই কাজে লাগে না
দুর্ভাগ্য আরও বাড়ানো ছাড়া।

সভায় যোগ দেওয়ার উৎসাহ এখন আর কারও নেই,
যথেষ্ট হয়েছে ওসব।
বলশেভিকরা লম্বা সময় টানা বকবক করে যায়,
কিন্তু কোনও আসল কথায় আসে না।
কম্যুনিস্টরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে
বাস্তববোধের কোনও ছোঁয়া নেই তাতে।

সোভিয়েত বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর নির্বিচারে বাণিজ্য করে যায়
যুক্তি ছাড়া, যথাযথ হিসাবরক্ষণ ছাড়া,
চিন্তাহীনভাবে সবকিছু রপ্তানি করে যায়
পূর্বাপর বিচার না করেই।

(জেফ্রি জে রসম্যান, ওয়ার্কার রেজিসটেন্স আন্ডার স্তালিন: ক্লাস অ্যান্ড রিভলুশন অন দি শপ ফ্লোর, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫– গ্রন্থের ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদে উদ্ধৃত। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

এই কবিতাটি পাঠের পরই শ্রমিকরা হই হই করে তাদের সমর্থন ও প্রশংসা জানায়। পরের কয়েক দিন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এর কিছু কিছু পঙক্তি। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষেরও প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র ও ত্বরিৎ। ক্লেপিকভকে ফ্যাক্টরি কমিটি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁর ইউনিয়নের সদস্যপদ বাতিল করার নির্দেশ এলেও, ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের তাঁর প্রতি সমর্থনের বহর বিচার করে ইউনিয়ন নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রিত হয়ে পড়ে। এতে আশঙ্কিত হয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটি স্বয়ং মাঠে নামে— ক্লেপিকভকে 'শ্রমিকশ্রেণির শত্রু' বলে চিহ্নিত করে শিল্পাঞ্চল জুড়ে পার্টি-প্রচার লাগু করা হয়। এই প্রচার যখন চলছে, তখনই অক্টোবর-বিপ্লব-বার্ষিকী উপলক্ষে ক্লেপিকভ আর একটি কবিতা রচনা করে শ্রমিকদের মধ্যে পাঠ করেন। কবিতাটি হল :

ভুলে যাওয়া স্লোগান

একটি উজ্জ্বল আদর্শকে আমরা ধ্বংস করছি।
ভ্রাতৃত্ব ও সমতার আদর্শ
আমাদের ত্যাগ করে আকাশে মিলিয়ে গেছে।

আমরা ভুলে গেছি
অক্টোবর ১৯১৭-র সেই স্লোগান ও শপথগুলো
যখন আমাদের কমরেডদের বাহিনী
আদিম শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণিকে চূর্ণ করার চিন্তায় মশগুল শত্রুদের
আমরা সর্বত্র পরাজিত করেছিলাম,
তাদের সমস্ত প্রত্যাশা
বাসি মদের মতো পচে টক হয়ে গিয়েছিল।
কিন্তু তবু তারা নিজেদের মধ্যে
ফিসফিসিয়ে বলাবলি করেছিল,
'এ বেশিদূর এগোবে না—
ওদের সমাজতন্ত্র অচিরেই মারা যাবে।
প্রাসাদে আর আরামকেদারায় বসে
ওদের নতুন নেতারা শিখবে শাসন করার কায়দা,
আর হয়ে উঠবে বুর্জোয়া,
জারি রাখবে শোষণ।
জনগণের আর্তি তাদের কানে পৌঁছবে না,
অক্টোবরের স্লোগানগুলো ধ্বংস হবে।'

(জেফ্রি জে রসম্যান, ওয়ার্কার রেজিসটেন্স আন্ডার স্তালিন: ক্লাস অ্যান্ড রিভলুশন অন দি শপ ফ্লোর, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫– গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদে উদ্ধৃত। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

এরপর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে চালানো প্রক্রিয়ায় ক্লেপিকভের ট্রেড-ইউনিয়ন সদস্যপদও বাতিল করা হয় এবং তাঁর 'সমব্যথী শ্রমিকদের' সতর্ক করে দেওয়া হয়। দেড় বছরের মাথায় ১৯৩০ সালের ১৫ই জুন তাঁকে গ্রেফতার করা হয় 'সোভিয়েত-বিরোধী' হওয়ার অভিযোগে। তাঁর ঘর তল্লাশি করে সমস্ত লেখাপত্র ও কবিতা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওজিপিইউ-র হেফাজতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। ওজিপিইউ-র সোভিয়েত মহাফেজখানায় রক্ষিত নথি থেকে জানা যায় যে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিরুদ্ধে ক্লেপিকভ বলেছিলেন:

> সরকারের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপানো বা প্রতিবিপ্লব— এমন কোনও কাজে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি না। আমার কবিতায় যা বলা হয়েছে তা সঠিক কারণ আমি নিজের চোখে নিজের জীবনে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্যদের জীবনে যা ঘটতে দেখেছি কেবল তাই-ই লিখেছি। সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে শ্রমিক জমায়েতে এবং কম্যুনিস্ট কমরেডদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমি ম্যানেজার ব্যক্তিবিশেষদের সমালোচনা করেছি এবং টানা বারো বছর ধরে একের পর এক সারি দিয়ে ঘটা কম্যুনিস্ট পার্টির ভুলগুলোকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।... একজন শ্রমিক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত প্রত্যয়গুলোকে খোলাখুলি প্রকাশ করার অধিকার অক্টোবর বিপ্লবই আমায় দিয়েছিল।
>
> (জেফ্রি জে রসম্যান, ওয়ার্কার রেজিসটেন্স আন্ডার স্তালিন: ক্লাস অ্যান্ড রিভলুশন অন দি শপ ফ্লোর, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫– গ্রন্থের ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

১৯৩০ সালের ২১শে জুন ওজিপিইউ ক্লেপিকভকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জন্য গুলাগের বন্দিশিবিরে চালান করে।

২০

হিটলার-স্তালিন সন্ধি, সোভিয়েত সাম্রাজ্য বিস্তার

১৯৩৯ সাল। স্তালিনিয় সন্ত্রাসে দগ্ধ সোভিয়েত ইউক্রেন। জার্মানিতে তখন ক্ষমতার মধ্যগগনে হিটলার। বিশুদ্ধ আর্য রক্তবাহী খাঁটি জার্মান জাতি মানবকূলে শ্রেষ্ঠ, অন্য সমস্ত দুর্বল নিকৃষ্ট জাতির উপর জার্মান জাতির আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই মানবপ্রগতির ইতিহাস-নির্ধারিত পথ— এই আত্মম্ভরী ও অপরবিদ্বেষী মতবাদ আশ্রয় করে হিটলারের নাজি বাহিনী জার্মানিতে গড়ে তুলেছে এক সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্র। ইউরোপে দীর্ঘ শতকের পর শতক জুড়ে প্রবহমান ইহুদি-বিদ্বেষের ধারার উপর ভিত্তি করে তা ফেনিয়ে তুলেছে এক ইহুদি-বিরোধী হিস্টিরিয়া। জার্মান জাতির আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের নামে বিপুল সমরশক্তি পুঞ্জীভূত করে এলাকা দখলের আগ্রাসী অভিযানের সূচনাবিন্দুতে সে মহড়ারত। ইতিমধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়াকে সে গ্রাস করেছে। পোল্যান্ডকে সঙ্গী করে সোভিয়েত দেশের জমি, বিশেষ করে ইউক্রেন দখল করারও পরিকল্পনা তার। কিন্তু পোল্যান্ড বারবার সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেছে। মস্কো ও বার্লিন উভয়ের সঙ্গেই সমদূরত্ব রেখে নিজ স্বাধীনতা বজায় রেখে চলতে চাইছে পোল্যান্ড।

এমতাবস্থায় পরিস্থিতি এক চমক-লাগানো মোড় ঘুরল। কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদ পরস্পর-শত্রুতা সরিয়ে রেখে হাত মেলাতে এগিয়ে এল। সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রাশিয়া আর ফ্যাসিবাদের পীঠস্থান জার্মানি সন্ধিচুক্তিতে বসল।

১৯৩৯-য়ের শরতে স্তালিন প্রথম পদক্ষেপ নিলেন। তিনি সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকের কমিশার পদ থেকে ম্যাক্সিম লিটভিনভকে অপসারিত করলেন। লিটভিনভ ছিলেন ইহুদি, তাঁর ভাই ছিলেন ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিত। সাম্প্রতিক স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬–১৯৩৯) সোভিয়েত রাশিয়ার 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী' অংশগ্রহণেরও অন্যতম প্রবক্তা তিনি। হিটলার এই 'ইহুদি কম্যুনিস্টের' সঙ্গে

কোনও আলোচনায় বসবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্তালিন ১৯৩৯ সালের ৩-রা মে লিটভিনভকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসালেন নিজের ঘনিষ্ঠতম ছায়াসঙ্গী মোলোটভ-কে। মোলোটভ ইহুদি নয়, হিটলারের তাই তাঁকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হিটলারও তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন দ্রুত। ১৯৩৯ সালের ২০-শে আগস্ট তিনি স্তালিনের কাছে বার্তা পাঠালেন যে জার্মান বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপকে তিনি মস্কোয় পাঠাচ্ছেন আলোচনার জন্য, মস্কো যেন প্রস্তুত থাকে। ২৩-শে আগস্ট রিবেনট্রপকে নিয়ে বিমান নামল মস্কোর বিমানবন্দরে। মস্কো প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখেনি। সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমির রাজধানী মস্কোর বিমানবন্দর সেদিন সরকারিভাবে সাজানো হয়েছিল ফ্যাসিবাদী নাজিদের ব্যবহৃত প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্নের বিশাল বড় বড় ব্যানারে। সেদিন সেখানে উপস্থিত কম্যুনিস্ট আর্থার কোয়েসলার পরবর্তীকালে 'গড দ্যাট ফেইলড' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ৭৫-৮০) এর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এই দৃশ্য তাঁর মতবাদিক বিশ্বাসের শেষ আগলটুকুও ভেঙে দেয়, তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সোভিয়েত রাষ্ট্র কোনও সাম্যবাদী মতাদর্শকে ধারণ করছে না।

মলোটভ ও রিবেনট্রপের আলোচনায় হিটলার-স্তালিন সন্ধিচুক্তি পাকা করা হয়। এই চুক্তির একটা অংশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়, বাকিটা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার আড়ালে তখন ঢাকা রাখা হয়। প্রকাশ্য ঘোষণায় ছিল যে নাজি জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া একে অপরের ভূখণ্ড আক্রমণ করবে না। আর অপ্রকাশিত অংশে নাজি জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের একাধিক দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে পরস্পরের প্রভাববলয় নির্ধারিত করে নিয়েছিল। এই দেশগুলোর মধ্যে ছিল পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যান্ড। এই অপ্রকাশিত অংশের আঁচ প্রথম পাওয়া গেল সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের নাজি বাহিনী পোল্যান্ডকে আক্রমণ করল তার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে। তার ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। আর তার ১৬ দিন বাদে, ১৭-ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত লালফৌজ পোল্যান্ডকে আক্রমণ করল পুব দিক থেকে। পোল্যান্ডের অধীনে থাকা পশ্চিম ইউক্রেন ও বেলারুশ দখল করল সোভিয়েত বাহিনী এবং পোল্যান্ডের ভূখণ্ডের মাঝ বরাবর জার্মান ও সোভিয়েত বাহিনীর সমঝোতা অনুযায়ী নতুন সীমানা আঁকা হল— তার পশ্চিমদিকে জার্মান অধিকৃত অঞ্চল, পুবদিকে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল।

হিটলাররা যেমন জার্মান জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকার পালনকর্তা হিসাবে নিজেদের হাজির করছিল, মস্কোতেও তেমনই সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে সরকার-পোষিত প্রচারক-ইতিহাসবিদ-বুদ্ধিজীব-শিল্পীদের দল পশ্চিমবর্তী দেশগুলোর উপর এই আগ্রাসন ও দখলদারিকে রুশ জাতির ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন হিসেবে হাজির করছিলেন।

সোভিয়েত লালফৌজের হানাদার বাহিনী পোল্যান্ডের সীমানা অতিক্রম করে ঢোকার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায়, ১৯৩৯ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রাষ্ট্রের মুখপত্র 'প্রাভদা'-য় ইতিহাসবিদ এম ভি নেচকিনা-র লেখা একটি গ্রন্থ-পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়। সেখানে পর্যালোচনা করা হয়েছিল গ্রেকভ-য়ের লেখা কিয়েভিয় রুস-য়ের উপর একটি বইয়ের সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণের। সেখানে নেচকিনা দাবি করেন যে ইউক্রেনিয় ও বেলা-রুশ মানুষরা প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ-রুশ জাতির অংশ কারণ কিয়েভিয় রুস-য়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গেই পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলারুশিয়ার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খেয়াল করা যেতে পারে যে এখানে আবার কিয়েভিয় রুস-কে রুশ জাতির ইতিহাসের অংশ হিসেবে আত্মসাৎ করা এবং ইউক্রেনিয় ও বেলারুশ মানুষদের জাতিগত আত্মনির্ধারণের দাবিকে নস্যাৎ করে তাদের রুশ জাতিরই একটি উপগোষ্ঠী হিসেবে দেখায় সীলমোহর দেওয়া হল। এর কয়েকদিন পরেই সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ইতিহাস ও দর্শন শাখা একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করল যার আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করা হল এই শিরোনামে: 'পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলারুশিয়ার ঐতিহাসিক নিয়তি'। ভি আই পিচেতা সেখানে মূল সন্দর্ভ পাঠ করলেন। সেই সন্দর্ভে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ এইরকম:

> পশ্চিম ইউক্রেন এবং পশ্চিম বেলারুশিয়া প্রাচীন কাল থেকেই কিয়েভের রাষ্ট্রের অংশ। মোঙ্গল হানার পর তারা উত্তর-পূর্ব রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং লিথুয়ানিয় রাজার দখলে চলে যায়। কিন্তু তাদের ভাষা, সামন্তব্যবস্থা ও সামরিক প্রকৌশল রুশ চরিত্রেরই রয়ে যায়। পোলিয়করণের সবরকম প্রচেষ্টা তারা লাগাতার প্রতিরোধ করে এসেছে এবং পুবে রাশিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করেছে মুক্তির জন্য। সেই কারণেই আমাদের এই রক্তসম্বন্ধীয়রা পোলিয় অভিজাতদের নিপীড়ন থেকে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে লালফৌজকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে।
>
> (মওরিন পেরি, দি কাল্ট অফ আইভান দি টেরিবল ইন স্তালিনস রাশিয়া, প্যালগ্রেভ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৮)

তুমুল হর্ষোচ্ছাসের মধ্যে পিচেতা তাঁর সন্দর্ভপাঠ শেষ করলেন, সরকারি ইতিহাস-ভাষ্য গৃহীত হল। সোভিয়েত ইতিহাসচর্চার তৎকালীন দিকনির্দেশ নতুন করে ঠিক হল। পরের বছর-দুয়েক সমস্ত সোভিয়েত-প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চা একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে এরই পুনরোচ্চারণ করে চলল— সোভিয়েত লালফৌজ আসলে পরদেশ আক্রমণ করেনি, রুশ জাতির দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুর্বলতর সোদর ভাইকে অত্যাচারকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে! আর ইউক্রেনিয় ও বেলারুশিয়দের জাতিগত আত্মনির্ধারণের সমস্ত দাবিকে নাকচ করে তাদের 'ঐতিহাসিক নিয়তি' হিসেবে নির্ধারিত করে দেওয়া হল রুশ জাতির মধ্যে মিশে যাওয়ার ভবিতব্য। এমনকি ইউক্রেনিয় এবং বেলারুশিয় ভাষার স্বাতন্ত্রকে নাকচ করে রুশ ভাষারই উপভাষা হিসেবে দেগে দেওয়া হল আবারও। বর্তমানের সর্বময় নেতা স্তালিনের সঙ্গে অতীতের রুশ জার 'ভয়ঙ্কর আইভান' বা 'মহান পিটার'-য়ের তুলনা টেনে আলোচনা হতে লাগল। ওই দুই 'মহান' জার যেমন রুশ জাতিকে একত্রিত করতে বাল্টিক অঞ্চলকে জয় করার অভিযান চালিয়েছিলেন, মহান স্তালিন রুশ জাতির সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিয়েছেন পশ্চিম ইউক্রেন ও বেলারুশ দখল করে। যে জারশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সোভিয়েতের উত্থান, সেই জারশাসনের সবচয়ে স্বৈরতান্ত্রিক দুই জারকে জাতীয় নায়ক করে বর্তমান শাসনকর্তাকে তার আদলে হাজির করা দেখিয়ে দিল যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে উগ্র ও আগ্রাসী রুশ জাতীয়তাবাদ পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে।

অন্যদিকে নব-অধিকৃত পশ্চিম ইউক্রেনে সোভিয়েত শাসন কায়েম করার প্রক্রিয়া শুরু হল। দখল নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে, ১৯৩৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে লালফৌজের তত্ত্বাবধানে 'নির্বাচিত' এক 'ইউক্রেনিয়ান জাতীয় কংগ্রেস' সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তি প্রার্থনা করে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করল, সোভিয়েত রাশিয়ার আইনসভা-বৈঠকে ১৫-ই নভেম্বর তা গৃহীত হল। বেশ কয়েক হাজার মূলত রুশ জাতীয়তার কম্যুনিস্ট পার্টি কর্মী, গুপ্তপুলিশ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শাখার আমলা-অফিসার-কর্মীদের মস্কো থেকে পাঠানো হল প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য। পশ্চিম ইউক্রেনে যতগুলো অ-কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের প্রত্যেকটার নেতাদের গ্রেফতার করল লালফৌজ ও গুপ্তপুলিশ। প্রায় ১০ লাখ মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রী বলে গ্রেফতার করে সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া ও উত্তরমেরু সংলগ্ন অঞ্চলের গুলাগ বন্দিশিবিরগুলোয় পাঠানো হল— এদের মধ্যে পোল ও ইহুদি বেশি হলেও প্রচুর

ইউক্রেনিয়ও ছিল। এদের প্রায় কেউই আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে জার্মানি ও রোমানিয়ার সঙ্গে স্থাপিত বোঝাবুঝি অনুযায়ী লালফৌজ যখন উত্তর বুকোভিনা দখল করল, তখন আরও একবার এই গ্রেফতার ও গুলাগে নিক্ষেপের ঢেউ তুঙ্গে উঠল। গুপ্তপুলিশের স্থানীয় কারাগারে বন্দি ৪,০০০ রাজনৈতিক বন্দিকে 'বিচারপ্রক্রিয়া' সংক্ষিপ্ত করে গুলি করে মেরে ফেলা হল। দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসা ইউক্রেনিয় ভাষার সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলোকে অধিকাংশই বন্ধ করে দেওয়া হল। রাশিয়ায় প্রকাশিত রুশ পত্রপত্রিকা প্রচারের পাশাপাশি রুশ ভাষায় সোভিয়েত-সমর্থক নতুন আঞ্চলিক সংবাদপত্র চালু করা হল। সোভিয়েত ইউক্রেনের পথেই রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও শুরু হল।

পশ্চিম ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের সংগঠন ও-ইউ-এন (অর্গানাইজেশন অফ ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনালিস্টস)-য়ের নেতা ও সংগঠকরা অনেকেই পূর্ব ইউক্রেনে লালফৌজের ভূমিকা দেখে পশ্চিমে লালফৌজ দখল নেওয়ার আগেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল বা আত্মগোপন করেছিল। যারা করেনি বা করার সুযোগ পায়নি, লালফৌজ তাদের বেছেবেছে গ্রেফতার করেছিল, সোভিয়েত-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সাজানো বিচারে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং তাৎক্ষণিক গুলি করে হত্যা করেছিল। পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নেওয়া ও-ইউ-এন নেতা ও কর্মীরা সংগঠন টিকিয়ে রাখলেও তাদের মধ্যে নানা বিভেদ মাথাচাড়া দেয়। একটা অংশ নাজিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ও-ইউ-এন ভেঙে দুইভাগ হয়ে যায়। তুলনায় বেশি জঙ্গী ও চরমপন্থী অংশটি স্তেপান বান্দেরা-র নেতৃত্বে ও-ইউ-এন-বি নামে পরিচিত হয় ও অন্য, তুলনায় মধ্যপন্থী, অংশটি আন্দ্রি মেলনিক-য়ের নেতৃত্বে ও-ইউ-এন-এম নামে পরিচিত হয়। ১৯৪১ সালের গোড়ায়, জার্মান নাজি বাহিনী ও-ইউ-এন-বি-র বহু সদস্যকে জার্মানি-অধিকৃত পোল্যান্ডে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে কারণ হিটলার তখন গোপনে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের ছক কষতে শুরু করে দিয়েছেন এবং সেই ছকে অতিরিক্ত বোড়ে হিসেবে এই ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের ব্যবহার করার সম্ভাবনাও জার্মানদের মাথায় খেলছে।

২১

হিটলারের দখলে ইউক্রেন: নরক দর্শন পুনর্বার

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। সোভিয়েত সর্বময় নেতা স্তালিনের প্রগাঢ় আস্থা ছিল হিটলারের সঙ্গে করা তাঁর মৈত্রীচুক্তির উপর। তাই তাঁর নিজের গোয়েন্দা-চর-কূটনীতিকরা বারবার জার্মানির সোভিয়েত আক্রমণের তোড়জোড়ের খবর পাঠালেও তিনি তা বিশ্বাস করেননি, এমনকি জার্মান ঝটিকা আক্রমণ যখন ইউক্রেনের সীমা পেরিয়ে ঢুকে এসেছে, তখনও তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছেন। ফলে এই আক্রমণ সামাল দেওয়ার পক্ষে লালফৌজের সেনা-সমাগম ও প্রস্তুতি ছিল নেহাতই অপ্রতুল। ফলে ৩০শে জুনের মধ্যেই জার্মান বাহিনী পশ্চিম ইউক্রেনের প্রধান শহর ল্‌ভিভ অবধি অঞ্চল দখল করে নিল। সোভিয়েত আধিকারিকরা পশ্চাদপসরণ করে পূর্ব ইউক্রেনে আশ্রয় নিল। পশ্চিম ইউক্রেনের বহু ইহুদি নাগরিকও নাজিদের হাতে নিপীড়ন এড়াতে পূর্ব ইউক্রেনে আশ্রয় নিল। আবার একই সঙ্গে পশ্চিম ইউক্রেনের বহু ইউক্রেনিয়, পোল ও বেলারুশিয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিপীড়নে এতটাই অতিষ্ঠ ছিল যে জার্মান শাসন অন্তত তার চেয়ে ভালো হবে এই আশায় জার্মানদের স্বাগত জানিয়েছিল। এই আশা মরীচিকায় পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয়নি।

ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী ও-ইউ-এন-বি বাহিনীও জার্মান বাহিনীর সঙ্গী হিসেবেই পশ্চিম ইউক্রেনে আবার প্রবেশ করেছিল। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন ল্‌ভিভ শহরে তারা 'সার্বভৌম ইউক্রেন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করল। সেই ঘোষণায় তারা সমস্ত ইউক্রেনিয়দের আহ্বান করল 'মস্কোর জবরদখল'-য়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়ে 'স্বাধীন ইউক্রেন'-য়ের সীমা আরও বাড়িয়ে কিয়েভ দখলমুক্ত করতে, যাতে এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহরকে রাজধানী করে মুক্ত ইউক্রেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ও-ইউ-এন-বি-র নেতা বান্দেরাকে

জার্মানরা ইউক্রেনে ঢুকতে দেয়নি, জার্মান-অধিকৃত পোল্যান্ডেই থাকতে বাধ্য করেছিল। তাঁর অবর্তমানে অপর এক নেতা ইয়ারোস্লাভ স্টেটসকো নিজেকে এই সার্বভৌম ইউক্রেন রাষ্ট্রের প্রধান বলে ঘোষণা করলেন। জার্মানরা শুরুতে এই সার্বভৌমত্ব ঘোষণা, স্বাধীন ইউক্রেন গড়ার আহ্বান এবং ও-ইউ-এন-বি কর্মীদের একটি প্রশাসন-কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে কিছুটা নিজের মতো বাড়তে দিয়েছিল। কিন্তু অচিরেই আক্রমণ নামিয়ে আনল। ও-ইউ-এন-বি-র সমস্ত নেতাকে জার্মান বাহিনী গ্রেফতার করল। ল্‌ভিভে গ্রেফতার করা হল স্টেটসকো-কে, জার্মান-অধিকৃত পোল্যান্ডে গ্রেফতার করা হল বান্দেরাকে। ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের অন্যান্য গোষ্ঠীদের উপরও আক্রমণ চলল। আগস্টে মধ্য ইউক্রেনের ঝিটোমিরে ও-ইউ-এন-এম-য়ের নেতারা খুন হলেন পশ্চাদপসরণকারী সোভিয়েত বাহিনীর হাতে। স্পষ্ট হয়ে গেল যে জার্মান-আগমনে ইউক্রেনিয়দের জন্য কোনও মুক্তির পরিসর তৈরি হতে যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে জার্মানদের পুবমুখী দখলদারি অভিযান এগিয়ে চলেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের অধিকাংশ অঞ্চলই জার্মানদের দখলে চলে আসে ১৯৪১ সালের আগস্টের মধ্যে। ১৯শে সেপ্টেম্বর এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জার্মানরা কিয়েভ দখল করে। কেবলমাত্র এই কিয়েভ দখলের যুদ্ধেই ৬লাখ সোভিয়েত সেনা মারা গিয়েছিল এবং আরও ৬ লাখ জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। অক্টোবর মাসে জার্মান-সঙ্গী রোমানিয়ার বাহিনী ওডেসা দখল করে আর জার্মান বাহিনী খারকিভ দখল করে। সোভিয়েত লালফৌজ দীর্ঘতম প্রতিরোধটি জারি রেখেছিল ক্রিমিয়ায়। কিন্তু সেখানেও ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজ শেষ অবধি পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পশ্চিম-মধ্য-পূর্ব গোটা ইউক্রেনই তখন জার্মান দখলে।

সোভিয়েত বাহিনী যখন পিছু হটেছে, তার যুদ্ধকৌশলের অঙ্গ হিসেবে ইউক্রেনকে ধ্বংস করতে করতে পিছু হটেছে— নদীবাঁধ ও সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে, খনির মধ্যে জল ঢুকিয়ে প্লাবিত করে দিয়ে গেছে, কারখানাগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে। কিছু কিছু কারখানার যন্ত্র-সরঞ্জাম খুলে নিয়ে মালগাড়িতে বোঝাই করে পুবে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে সেখানে নতুন করে বসানোর জন্য।

ইউক্রেন নিয়ে জার্মানদের পরিকল্পনা কী ছিল? ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে জার্মান সেনা অধিকর্তার তৈরি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল যে কৃষি ও শিল্পের দিক

থেকে ইউক্রেনই হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পক হারবার্ট ব্যাকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে হিটলারকে বলেছিলেন, 'ইউক্রেন জয় করতে পারলে আমাদের অর্থনাতিক দুশ্চিন্তা আর থাকবে না।' হিটলারও তাই ইউক্রেন দখল করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন যাতে ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকার ফসল জার্মানদের খাদ্য-সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিতি তৈরি করে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো বাণিজ্যিক অবরোধের ফলে খাদ্য সংকটে আর ভুগতে না হয়, এবং এই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে জার্মানি তার সামরিক বলের জোরে পৃথিবীকে পদানত করতে পারে। এই লক্ষ্য নিয়ে সাধারণ পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে জার্মান অর্থনৈতিক পরিকল্পকরা ১৯৪০ সালের জুন থেকে ১৯৪১ সালের জুন একবছর কাজ করছিলেন। হাইনরিচ হিমলার ও রেইনহার্ড হেড্রিচ ছিলেন এই দলের মাথায়। তাদের করা পরিকল্পনা পরিচিত হয়েছিল 'জেনেরালপ্ল্যান ওস্ত' নামে। এর চারটি খসড়া প্রকাশিত হয়— প্রথমটি ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে, দ্বিতীয়টি ১৯৪১ সালের জুলাইয়ে, তৃতীয়টি ১৯৪১ সালের শেষদিকে আর চতুর্থটি ১৯৪২ সালের মে মাসে। আগাছা উপড়ানোর ভঙ্গিতে এখানে মানুষ খুন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। নির্ধারণ করা হয়েছিল যে মেরে ফেলতে হবে ইহুদিরা ছাড়াও ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পোল, ৬৫ শতাংশ পশ্চিম ইউক্রেনিয়, ৭৫ শতাংশ বেলারুশিয় এবং ৫০ শতাংশ চেক নাগরিকদের। ৩.৫ কোটি থেকে ৪.৫ কোটি স্লাভদের নিশ্চিহ্ন করে এই ভূখণ্ড জার্মান জাতির প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে। নাজি জাতিতত্ত্ব অনুযায়ী, স্লাভ ও ইহুদিরা নিকৃষ্ট জাতি, মানবপ্রজাতির জঞ্জালবিশেষ, তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে কমিয়ে নিয়ন্ত্রণে রেখে উন্নত জাতি জার্মানদের হাতে পৃথিবীর সম্পদের দেখভাল ও বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে আসতে পারলে তবেই প্রগতির পথ উন্মুক্ত হবে। সুতরাং হিমলারদের করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউক্রেন সহ সোভিয়েত ইউনিয়নকে দখলে এনে সেখানকার জনসংখ্যাকে বিপুলভাবে কমাতে হবে, বড় কোনও শহর রাখার দরকার নেই, শিল্প-কারখানারও তেমন দরকার নেই, কৃষি-উপনিবেশ হিসাবে তা গড়ে তুলতে হবে মহান জার্মান জাতিকে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য। (সূত্র: টিমোথি স্নাইডার, ব্লাডল্যান্ডস: ইউরোপ বিটুইন হিটলার অ্যান্ড স্তালিন, বেসিক বুকস, ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬৩)

গোটা ইউক্রেনের উপর দখলদারি কায়েম করার পর জার্মান বাহিনী নাজি পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ শুরু করল। জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরত

'এইনস্যাটজগ্রুপেন' নামের এক বিশেষ দল। এই দল ছিল মানুষ মারার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ঘাতকবাহিনী। এরা সবার প্রথম জড়ো করত সমস্ত ইহুদিদের। তারপর জড়ো করত কম্যুনিস্টদের ও রোমা জিপসিদের। ইউক্রেনের বহু জায়গায় কম্যুনিস্ট ও ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষের বশে এই কাজে জার্মান ঘাতকবাহিনীকে সহায়তা করেছিল। অনেক জায়গায় আবার ইউক্রেনিয়রা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ইহুদিদের লুকিয়ে রেখেছিল এই ঘাতকদের তল্লাশি থেকে। নরহত্যার এই নরক তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে কিয়েভ শহরের উপান্তে বাবি ইয়ার নামক খাদে। কিয়েভ শহর থেকে ৩৩,৭১১ জন ইহুদিকে জার্মান পুলিশবাহিনী দঙ্গল করে নিয়ে গিয়েছিল সেই খাদের ধারে, তারপর এইনস্যাটজগ্রুপেন-য়ের সি বিভাগ তাদের হত্যা করেছিল। খাদের ধারে একদলকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে খাদে ফেলা হচ্ছিল। পরের দলের দেহগুলো পড়ছিল পূর্ববর্তী দলের দেহগুলোর উপর। ইউক্রেন জোড়া এই নাজি হত্যালীলায় কেবল ইহুদি মানুষই মরেছিল ১৫ লাখের উপর। আরও অগুন্তিকে চালান করা হয়েছিল জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে গড়ে তোলা নাজি মৃত্যুশিবিরগুলোয়। জার্মান দখলদারি শেষ হওয়ার পর লালফৌজের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যাওয়া ভাসিলি গ্রসমানের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে এই নরকের ছবি:

> ইউক্রেনে আর কোনও ইহুদি নেই। না— পোলতাভা, খারকোভ, ক্রেমেনচুঙ, বোরিসপোল, য়াগোতিন— কোথাও নেই। বড় শহরে বা শয়ে শয়ে ছোট বা মাঝারি শহরে বা হাজার হাজার গ্রামে তুমি আর ছোট মেয়েদের অশ্রুতে ভাসা আতঙ্কে ভরা কালো চোখ দেখতে পাবেনা, কোনও বৃদ্ধ মহিলার যন্ত্রণাকাতর স্বর শুনতে পাবেনা, ক্ষুধার্ত কোনও শিশুর আঁধার নেমে আসা মুখ আর চোখে পড়বে না। অখণ্ড নিস্তব্ধতা। সবকিছু স্থির-নিশ্চল। গোটা এক মানবগোষ্ঠীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।
>
> ————————
>
> কাজারিতে আর অভিযোগ জানানোর মতো কেউ পড়ে নেই। কী ঘটেছিল তা বলার মতো কেউ নেই, শোকে কাঁদার মতো কেউ নেই। ঘরগুলোর আগুন জ্বালানোর জায়গা ধ্বসে পড়ে নিচে চাপা পড়ে আছে শব, নিঝুম নিস্তব্ধতা তাদের ঘিরে ফিরছে, আগাছা গজিয়ে আড়াল করছে। অশ্রু ও অভিশাপের থেকেও হাড়-হিম-করা এই স্তব্ধতা। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা মারা গেছে, মারা গেছে সব কারিগর ও পেশাজীবী: দরজি, জুতোনির্মাতা, টিনের কারিগর, গহনানির্মাতা,

বাড়ি রঙ করার লোক, কামার, বই-বাঁধাইকারী, শ্রমিক, হরকরা, ছুতোর মিস্ত্রি, উনুননির্মাতা, বিদূষক, আসবাবপত্র-নির্মাতা, জল বওয়া ভারী, গমপেষাইকারী, রুটি-প্রস্তুতকারক আর রাঁধুনি; আরও মারা গেছে সব চিকিৎসক, গির্জার যাজক, শল্যচিকিৎসক, স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী— জীবাণুবিৎ, প্রাণরসায়নবিৎ, বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসালয়ের নির্দেশক— ইতিহাস, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির শিক্ষকরা। অধ্যাপক, উপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য, বাস্তুকার ও স্থপতিরা মৃত। কৃষিবিদ, মাঠ-পর্যায়ের কর্মী, হিসাবরক্ষক, দপ্তরী, বিপণি-সহায়ক, সরবরাহকারী ব্যবসায়ী, সহায়সচিব, রাতপ্রহরীরা মৃত। জনশিক্ষার কর্মীরা মৃত। মৃত সেই বাবুশকারা যারা মোজা সেলাই করতে পারত, সুস্বাদু গোলরুটি বানাতে পারত, বুইলঁ রাঁধতে পারত, আপেল ও বাদাম দিয়ে স্ট্রুডেল তৈরি করত। স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত মহিলারা মৃত। চপল মহিলারাও মৃত। সুন্দরী সব তরুণী, গুণী ছাত্রী, হর্ষোচ্ছল স্কুলপড়ুয়ারা মৃত। কুৎসিত ও বোকা মেয়েরা, কুঁজো মহিলারাও মৃত। গায়করা মৃত, অন্ধ ও মূক-বধিররা মৃত, ভায়োলিন-বাদক ও পিয়ানো-বাদকরা মৃত। দুই বছর বয়সীরা মৃত। তিন বছর বয়সীরা মৃত। ছানি পড়া ঝাপসা চোখ, স্বচ্ছ শীতল আঙুল আর সাদা কাগজের মতো মৃদু-মর্মরিত চুলের আশি বছর বয়সী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মৃত। নবজাত শিশুরা জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি প্রলুব্ধ মুখে মায়ের স্তন আঁকড়ে থেকে মারা গেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ গৃহ, পরিবার, মাঠ-ময়দান, গান, পরম্পরা, লোককথা পিছনে ফেলে রেখে যাওয়া মানুষরা হাতে অস্ত্র আঁকড়ে মরে। কিন্তু এ মরণ সে মরণ নয়। এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে হাজার হাজার কারিগর ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকারী পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মহান ও প্রাচীন এক পেশাগত অভিজ্ঞতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। দাদুরা তাদের নাতিদের মধ্যে সংবাহিত করে এসেছে যে প্রাত্যহিক পরম্পরা, তাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে স্মৃতিকে, বেদনাবিধুর সঙ্গীতকে, অম্লমধুর জীবনের লোককাব্যকে। গৃহের অগ্নিকুণ্ড থেকে কবরস্থান অবধি সব ধ্বংস করা হয়েছে। ইউক্রেনিয়দের পাশাপাশি কয়েক শো বছর ধরে জীবনযাপন করা এক জাতিকে হত্যা করা হয়েছে।

———————

কিয়েভ প্রদেশের ব্রোভারস্কি জেলার ক্রাসিলোভকা গ্রামের খ্রিস্টিয়া চুনিয়াক এক কৃষকরমণী, চল্লিশ বছরের মতো বয়স হবে। তিনি আমায় এই ঘটনার কথা বলেছিলেন। ব্রোভারিতে জার্মানরা ফেল্ডম্যান নামের এক ইহুদি চিকিৎসককে মেরে ফেলার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। অবিবাহিত এই বৃদ্ধ চিকিৎসক গ্রামের

কৃষকঘরের দুই অনাথ শিশুকে দত্তক নিয়ে নিজ সন্তানের মতো পালন করছিলেন, অঞ্চলে সবার কাছেই তিনি ছিলেন ভালোবাসার মানুষ। এক দঙ্গল কৃষকরমণী ছুটে এসে জার্মান কম্যান্ডান্টকে ঘিরে কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয় করতে লাগল যাতে ফেল্ডম্যানকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কম্যান্ডান্ট বাধ্য হয়েছিল কৃষকমহিলাদের কথা শুনতে। ১৯৪১ সালের শরৎকালে এই ঘটনা ঘটেছিল। ফেল্ডম্যান ব্রোভারিতেই বাস করতে লাগলেন, অসুখে-বিসুখে কৃষকদের চিকিৎসা করাও জারি রইল। কিন্তু ১৯৪৩ সালের বসন্তে গ্রামের কৃষকরা আর তাঁকে আগলে রাখতে পারল না, জার্মানরা তাঁকে হত্যা করল। খ্রিস্টিয়া চুনিয়াক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, তাঁর উশ্রুধারাও আর বাঁধ মানল না যখন তিনি আমার কাছে বর্ণনা করছিলেন কীভাবে বৃদ্ধ ফেল্ডম্যানকে হত্যা করার আগে তাঁকে দিয়ে তাঁর নিজের কবর খোঁড়ানো হয়েছিল। মৃত্যুর সময় ফেল্ডম্যান বড় একা হয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনও ইহুদি তো ১৯৪৩ সালের বসন্তে জীবিত ছিল না।

———————

বেরদিচেভ-য়ে প্রায় ৩০,০০০ ইহুদিকেহত্যা করা হয়েছিল। পেকিলিস পরিবারের দুই ভাই— মিখেল ও উলফ— রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। পেকিলিসদের পরিবারকে শহরের অনেকেই চিনত। বাবা এবং পাঁচ ছেলের পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিস্ত্রী হিসেবে পরিচিতি ছিল। তারা বেরদিচেভে অনেক বাড়ি তৈরি করেছে, কিয়েভে কারখানা তৈরি করেছে, এমনকি মস্কোর পাতালপথ তৈরিতেও অংশ নিয়েছে। যখন জার্মানরা এল, মিখেল ও উলফ আত্মগোপন করেছিল। কৃষকদের জন্য সুন্দর অগ্নিকুণ্ড বানাচ্ছিল তারা, সেই অগ্নিকুণ্ডের নিচেই তারা লুকিয়ে থাকত। তারপর তারা সভেরদলোভস্কায়া সরণির একটি জার্মান দপ্তরের নিচে মাটির তলায় গুহা খুঁড়ে সেখানে ১৪৫ দিন লুকিয়ে ছিল। এভগেনি ওসিপোভিচ নামে এক রুশ বাস্তুকার গোপনে তাদের খাদ্য সরবরাহ করত। এরপর তারা তাদের এই পাতালগুহা থেকে পালিয়ে জার্মান-বিরোধী গোপন যোদ্ধাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়, বেরদিচেভকে থেকে জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে তারাও অংশ নিয়েছিল।

বেরদিচেভের এক কিশোরের জবানবন্দি: "ওরা আমায় মিতয়া ওস্তাপচুক নামে ডাকে, কিন্তু আমার নাম খাইম রোইতমান। আমার বাড়ি ছিল বেরদিচেভে। এখন আমার বয়স তের। জার্মানরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে, মাকেও হত্যা করেছে। বোরিয়া নামে আমার এক ছোট ভাই ছিল। এক জার্মান তার সাবমেশিনগান দিয়ে আমার সামনেই আমার সেই ভাইকে হত্যা করেছিল।

আমাকেও তারা নিয়ে গিয়েছিল সেই খাদের ধারে। অদ্ভুত সেই অভিজ্ঞতা। পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করছি। ভাবছি এই মুহূর্তেই হয়ত তারা আমায় গুলি করবে। একটা জার্মান আমার কাছে ঘেঁষে চোখ কুঁচকে তাকাল। আমি খাদের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখ, একটা ঘড়ি পড়ে আছে!' একটুকরো কাঁচে আলো পড়ে চকচক করছিল। জার্মানটা ওটা কুড়িয়ে তুলতে গেল। আর সেই সুযোগে আমি যত জোরে পারি দৌড়তে শুরু করলাম। জার্মানটাও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার পিছু ধাওয়া করে ছুটছিল, একটা বুলেট আমরা টুপি ফুটো করে বেরিয়ে গেল। আমি কেবল ছুটছিলাম আর ছুটছিলাম। তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। তারপরে কী ঘটেছিল আমার স্মৃতিতে নেই। জেরাসিম প্রোকোফিয়েভিচ ওস্তাপচুক নামের এক বৃদ্ধ আমায় কুড়িয়ে তুলে বলল, 'এখন থেকে তুমি আমার পুত্র মিতয়া।' তার নিজের সাত সন্তান ছিলই, আমি হলাম অষ্টমজন। একবার বেশকিছু জার্মান এল তল্লাশিতে, সবাই তারা মদে চুর। তারা খেয়াল করল যে সবার মধ্যে আমার গায়ের রঙই কালো। তারা চিৎকার শুরু করল। জেরাসিম প্রোকোফিয়েভিচকে তারা প্রশ্ন করতে লাগল, 'এটা কার ছেলে?' সে নির্বিকারে উত্তর দিল: 'আমার'। তারা জেরাসিমকে বকাঝকা গালাগাল করতে লাগল, বলতে লাগল যে সে মিথ্যা কথা বলছে কারণ আমার গায়ের রঙ কালো। অথচ কী শান্তভাবেই না জেরাসিম উত্তর দিল: আমার প্রথম বউ ছিল জিপসি জাতির। সেই বউয়ের গর্ভের সন্তান ও।'..."

জার্মানরা দখল নেওয়ার পর ষষ্ঠ দিনে কাঠের মিস্ত্রী গিরস গিটেরমান বেরদিচেভ ছেড়ে পালিয়েছিল। প্রথম সেই দিনগুলোয় ইহুদিদের প্রতি জার্মানদের করা অপরাধের কথা সে আমায় বলেছিল। বোলশায়া ঝিটোমিরস্কায়া, মালায়া ঝিটোমিরস্কায়া ও স্থেইনোভস্কায়া সরণির বহু মানুষকে তাদের আবাসনের ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল জার্মানরা। এই সব রাস্তার কাছেই হল চামড়ার কারখানা। ঘরছাড়া করা মানুষগুলোকে সেই কারখানার কাঁচা চামড়াকে পাকানোর জায়গায় নিয়ে গিয়ে কষায় খয়েরে ভর্তি বিশাল গর্তগুলোর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। কেউ ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করলে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে তাদের লাশটাকে ওই গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল। জার্মানদের কাছে এভাবে হত্যা করা ছিল এক মজার খেয়াল: ইহুদিদের কাঁচা চামড়াকে পাকা করার এক মজার অভিযান।

পুরানো শহরেও এমন মজার ছলে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। যে 'তাল্লিত' ও 'তেফিল্লিন' পরে ইহুদিরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, জার্মানরা হুকুম দিল যে

তা পড়ে বৃদ্ধ পুরুষদের পুরানো সিনাগগে জমায়েত হতে হবে এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে করা ইহুদিদের সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনাসভা করতে হবে। জোর করে ধর্মীয় পোষাক পরিয়ে বৃদ্ধদের বহু প্রাচীন সিনাগগের মধ্যে ঢুকিয়ে সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল এবং তারপর বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। এমনই আর এক ঘটনা ঘটেছিল একটি জলচালিত কলের কাছে। জার্মানরা বেশ কয়েক গণ্ডা মহিলাকে গ্রেফতার করে সেখানে নিয়ে এসে সমস্ত পোষাক খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর ঘোষণা করেছিল যে যারা সাঁতার কেটে নদীর অপর পারে পৌঁছতে পারবে তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে। সেই জমচালিত কলের কাছে নদীতে বাঁধ দেওয়া ছিল, নদী সেখানে অনেক চওড়া। বেশিরভাগ মহিলাই নদীর মাঝে ডুবে মরেছিল। যারা সাঁতরে অন্যপারে পৌঁছতে পেরেছিল, তাদের তখনই আবার সাঁতরে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আবার জলে নেমে তারাও ডুবে মরেছিল।

ঠাট্টার ছলে হত্যা করার জার্মানদের এই চর্চার আরেকজন বলি হয়েছিল আরন মেজর। বৃদ্ধ এই মানুষটির পেশা ছিল মাংসের জন্য ইহুদিপ্রথায় পশুজবাই করা। জনৈক জার্মান আধিকারিক আরন মেজরের ঘরে তল্লাশিদল নিয়ে এসে তল্লাশির নামে লুটতরাজ চালিয়ে তাঁর বাছাই করে জড়ো করা জিনিষপত্র-আসবাব নিয়ে অন্য সেনাদের পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে রয়ে গেলেন দুজন সেনাকে নিয়ে কিছু আমোদ করার জন্য। তল্লাশির সময় তাঁর হাতে আরন মেজরের পশুজবাইয়ের বড় ছুরিটি পড়েছিল এবং সেইসূত্রে আরনের পেশা সম্পর্কে তিনি জেনেছিলেন। আরনকে তিনি বললেন যে আরনের হাতের কাজ তিনি দেখতে চান। সঙ্গের দুই সেনা তাঁর হুকুম অনুযায়ী পড়শিদের ঘর থেকে তিনটে বাচ্চা শিশুকে ধরে নিয়ে এল। বৃদ্ধ আরনকে বাধ্য করা হল সেই শিশুগুলোর উপর ছুরি চালাতে।...

স্বয়ং রাষ্ট্র এইসব 'অনুমোদনহীন' প্রাণদণ্ড অনুমোদন ও উৎসাহিত করছে, ইহুদিদের আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে এই ভয়ানক নিপীড়ন, হিংসা ও হত্যালীলার সহজতম শিকার করে তুলেছে— ভয়াবহ অথচ সরল সত্য হয়ে ওঠা একথা হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যেন বিশ্বাসও করতে পারছিল না। বাস্তুচ্যুত করে দঙ্গল পাকানো যে মানুষদের 'ঘেটো' নামক মৃত্যুশিবিরে চালান করা হয়েছিল, তাদের একজনও কল্পনা করতে পারেনি যে তা ছিল ২০,০০০ ইহুদির প্রত্যেককে হত্যা করার সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের প্রথম ধাপ মাত্র।

বেরদিচেভ-য়ের একজন হিসাবরক্ষক তাঁর বন্ধু যন্ত্রবিৎ নুঝনির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ঘেটোয় গিয়েছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন যে নুঝনির স্ত্রী খুব

কান্নাকাটি করেছিলেন এই আশঙ্কা থেকে যে তার দশ বছরের ছেলে গারিক সেই শরতে আর তার রুশ বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে পারবে না।

বেরদিচেভ-য়ের বৃদ্ধ চিকিৎসকরা আশায় ছিলেন যে লালফৌজ আবার ফিরে আসবে। একটা সময় তারা একে অপরকে এই বলে আশ্বস্ত করত যে কোনও একজন নাকি বেতার-সম্প্রচারে শুনেছে যে জার্মান সরকারের কাছে ইহুদিদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা পড়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তখনই বিমানঘাঁটির কাছে গোরোদস্কায়া সরণি যেখানে শেষ হয়ে একটা বাঁধাই রাস্তা রোমানোভকা গ্রামের দিকে চলে গেছে, সেখানে লিসায়া গোরা থেকে আনা সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিরা পাঁচটি গভীর পরিখা খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

৪-ঠা সেপ্টেম্বর। ঘেটো তৈরির পর এক সপ্তাহ কেটেছে। ঘেটোর ১,৫০০ তরুণকে হুকুম করা হল কৃষিকাজে নামার জন্য প্রস্তুত হতে। তরুণেরা ছোট পুঁটলিতে খাবার বেঁধে নিয়ে বাবা-মা-কে বিদায় জানিয়ে কাজে বেরোল। সেই দিনই এই ১,৫০০ তরুণকে লিসায়া গোরা ও খাঝিনা গ্রামের মাঝামাঝি এক জায়গায় গুলি করে হত্যা করা হল। ঘাতকরা তাদের শিকারদের ভ্রমে বাঁধতে এতটাই সফল হয়েছিল যে শেষ মুহূর্ত ঘনানোর আগে অবধি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি যে কী ঘটতে চলেছে। এমনকি এই তরুণদের এমনটাও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে কাজশেষে ফেরার সময় পরিবারের বয়স্কদের জন্য গোটাকয়েক আলু তারা নিয়ে যেতে পারবে। ঘেটোয় থাকা মানুষরাও তাদের জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিনে জানতে পারেনি যে তাদের তরুণদের কী পরিণতি হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড ঘেটো থেকে তেমন প্রায় সমস্ত তরুণ যুবককে সরিয়ে দিল যাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা ছিল। কর্মকাণ্ডের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার প্রস্তুতিও তখন সম্পূর্ণ। ব্রডস্কায়া সরণির প্রান্তেও তখন গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এস এস রেজিমেন্টের কয়েক দল এসে পৌঁছল ১৪-ই সেপ্টেম্বর, শহরের পুলিশবাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হল। সেইদিন রাতেই গোটা ঘেটোটাকে ঘিরে ফেলা হল। ১৫-ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় চরম সংকেতটি এল। এস এস ও পুলিশ বাহিনী ঘেটো থেকে সবাইকে তাড়িয়ে বের করে বাজার-চৌহদ্দিতে জড়ো করতে লাগল। তাদের আচার-ব্যবহারেই প্রকাশ পাচ্ছিল যে এই ইহুদিদের জীবনের শেষ দিনটি আজ এসে গেছে। অতি বৃদ্ধ ও পঙ্গু যারা হাঁটতে অক্ষম তাদের ঘেটোর ঘরের মধ্যেই ঘাতকরা গুলি করে মারল। মহিলা ও শিশুদের ভয়ানক কান্নার রোলে গোটা শহরের সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। অচিরেই বাজার-চৌহদ্দিকে ঘিরে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে গেল।

প্রথম দফার জন্য চারশো মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধ চিকিৎসক সুগোভার, বারাবান, লিবেরমান, মহিলা চিকিৎসক ব্লাঁক, বিদ্যুতের মিস্ত্রী এপেলফিল্ড, আলোকচিত্রী নুঝনি, জুতোনির্মাতা মিলমেইস্টার, বৃদ্ধ পাথরের ঘরামি পেকেলিস আর তার দুই ছেলে মিখেল ও উল্ফ, দরজী, মুচি, ধাতুর কারিগর আর বহু কেশবিন্যাসকারী। এই পেশাজীবী মানুষদের তাদের পরিবারকে সঙ্গে নিতে বলা হয়েছিল। অনেকেই সেই জট-পাকানো দঙ্গলে তাদের বউ আর সন্তানদের হারিয়ে ফেলেছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না। জড়ো হওয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা যায় সেই বীভৎস বর্ণনা: লোকগুলো তাদের বউ আর সন্তানদের নাম ধরে চিৎকার করছিল, মানসযন্ত্রণায় উন্মত্ত সেই দঙ্গল থেকে ওঠা কোলাহলের উপরে গলা চড়িয়ে ডাকার চেষ্টা করছিল প্রাণপণ। মৃত্যুকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা মায়েরা তাদের শিশু পুত্র ও কন্যাকে জড়ো হওয়া শহরের অন্য লোকেদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, অনুনয় বিনয় করছিল যে তারা যেন তাদের নিজ পুত্র-সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। 'নিজের সন্তানদের আর এই ভিড়ে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।'

সাবমেশিনগান গর্জে উঠল প্রথমবার। জানি না জার্মানরা এটা ইচ্ছা করেই করেছিল নাকি তারা বুঝতে পারেনি যে হত্যা করা শবেদের জন্য তৈরি করে রাখা পরিখাগুলো তখনও ৫০ থেকে ৬০ মিটার দূরে। হতভাগ্যদের দলকে ঠেলে বধমঞ্চে ঢোকানো হল। একের পর এক শব লুটিয়ে পড়তে থাকল সমবেত দর্শকচক্ষুর সামনেই।... বাকি বধ্যদের ঠেলে ঢোকানো হল বিমানঘাঁটির ছাউনিতে। সেখানে তাদের অপেক্ষা করতে হল ঘাতকদের ডাকের জন্য। এক একটা দলকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিখার ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে পরিখায় ফেলে দেওয়া চলল।

নির্দোষ ও অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা এভাবে গোটা দিন ধরে চলল। হলুদ কাদামাটি অঝোরে ঝরল রক্ত। খানাখন্দগুলো ভরে উপছে পড়ল রক্ত। কাদামাটিও অতো রক্ত শুষে নিতে পারল না। মাটির উপর বিশাল বিশাল রক্তের ডোবা তৈরি হয়ে গেল। শীর্ণ নদীর মতো রক্ত বয়ে চলল।... ঘাতকদের বুটগুলো রক্ত শুষে সপসপে ভারী হয়ে উঠল।

(ভাসিলি গ্রসমান, এ রাইটার অ্যাট ওয়ার: ভাসিলি গ্রসমান উইথ দি রেড আর্মি, আনতনি বিভর ও লুবা ভিনোগ্রাদোভা দ্বারা সম্পাদিত ও ইংরেজিতে অনুদিত, দি হারভিল প্রেস, ২০০৫, পার্ট ফোর থেকে উদ্ধৃত। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

ভাসিলি গ্রসমান কেবল একজন সাংবাদিক হিসেবে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ করেননি। এ ছিল তাঁর কাছে গভীর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার এক যাত্রা— তাঁর মায়ের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। ইয়েকাতেরিনা সাভেলিয়েভনা গ্রসমান, ভাসিলি গ্রসমানের মা এই বেরদিচেভ গণহত্যাতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর জন্য এক অপরাধবোধ ভাসিলি গ্রসমানকে কুরে খেত। গ্রসমান সোভিয়েত লেখক-সাংবাদিক হিসেবে মস্কোতে থাকার জায়গা পাওয়ার পরও পিতার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা মাকে নিজের কাছে নিয়ে যাননি, মস্কোর বাসস্থানের পরিসরের অপ্রতুলতার অজুহাতে। বেরদিচেভের ইহুদি-গণহত্যায় তাঁর মায়ের নিদারুণ মৃত্যুর জন্য তিনি তাই নিজেকে দোষী করতেন। বেরদিচেভের গণহত্যাপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে এই তীব্র ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে মিশে অন্য এক সাধারণ অনুভূতিও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। শৈশব-কৈশোর ও প্রথম তারুণ্যে এক উচ্চাকাঙ্খী যুবক হিসেবে বেরদিচেভে বেড়ে ওঠার সময় গ্রসমান রুশ আদবকায়দা, জীবনচর্যাকে অনুকরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন, রুশ ভাষাকেই নিজের ভাষা করে নিয়েছিলেন। ইহুদি জীবনাচার, পরম্পরা ও ঈদ্দিস ভাষা তাঁর চোখে ছিল সেকেলে পশ্চাৎপদ হিসেবে পরিত্যাজ্য। গণহত্যার বিবর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করলেন: 'এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে হাজার হাজার কারিগর ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকারী পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মহান ও প্রাচীন এক পেশাগত অভিজ্ঞতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।' অনুভব করলেন যে মানবসভ্যতার একটা ধারাকে শুকিয়ে মারতে চাওয়া হচ্ছে, একটা ভাষাকে মানুষের মুখ থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। তখন নিজেকেও অপরাধী বলে মনে হল, পরম্পরা-সংস্কৃতি-ভাষাকে বাচাল স্বার্থান্ধতায় পরানুকরণের পথে বিসর্জন দেওয়ার জন্য।

ভাসিলি গ্রসমান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ডকে তিনি নথিবদ্ধ করে যাবেন। সঙ্গী লেখক-সাংবাদিক ইলিয়া এহরেনবুর্গের সঙ্গে তিনি 'কালো বই' নামের এক পাণ্ডুলিপিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বলা মৌখিক ইতিহাসের এক বিপুল সংকলন করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত সরকার তা ছাপার অনুমতি দেয়নি। কোনও সোভিয়েত সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে পাঠানো গ্রসমানের প্রতিবেদনগুলো ছাপা হয়নি। স্তালিন নিজে তা ছাপার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। স্তালিনের গররাজি হওয়ার একটা কারণ ছিল এই যে ইউক্রেনে জার্মান-আগ্রাসনের মান্য ইতিহাসকে তিনি কেবল 'সোভিয়েত নাগরিক' এবং 'সোভিয়েত সমাজের'

উপর জার্মান আক্রমণ হিসাবে তৈরি করতে চাইছিলেন, ইহুদি সমাজ-পরম্পরা-ভাষা-র স্বতন্ত্র কোনও উপস্থিতি বা গুরুত্বের ইঙ্গিতমাত্রেরও অনুমোদন সেখানে ছিলনা। এছাড়াও জার্মান হাতে বন্দি হওয়া কিছু লালফৌজের সেনা ও কিছু ইউক্রেনিয় নাগরিক যেভাবে ইহুদিনিধনে হিটলারের বাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করেছিল, যেভাবে সোভিয়েত শাসনের প্রতি ক্ষোভ কিছু মানুষকে কিছু সময়ের জন্য জার্মানদের সমর্থন করার দিকে ঠেলে দিয়েছিল— এসব কথাও ইতিহাসে নথিবদ্ধ হয়ে থাক তা স্তালিন চাননি। ভাসিলি গ্রসমানের বহু পরিশ্রমের ফসল 'কালো বই' তাই ছাপাখানার মুখ দেখেনি গ্রসমানের জীবৎকালে।

ইউক্রেনের যে বাবি ইয়ার-য়ে ১৯৪১-১৯৪৩ সময়কালে নাজিরা দেড় লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল ইহুদি অথবা ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী, ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত সরকার সেখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছিল। স্তালিন তখন মারা গেছেন, ক্রুশ্চেভের 'নিস্তালিনিকরণ'ও সম্পন্ন, তবু সেই স্মৃতিস্তম্ভে খোদাই করা লেখায় ইহুদি বা ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের উল্লেখ করা হয়নি, তা নিবেদন করা হয়েছিল 'কিয়েভের নাগরিক ও যুদ্ধবন্দিদের স্মৃতিতে'। ৫০ বছর পর, সোভিয়েত শাসনের পতনের পর ১৯৯১ সালে একটি ইহুদি গোষ্ঠী সেখানে প্রথম গণহত্যায় নিহত ইহুদিদের স্মৃতিতে স্মৃতিসৌধ —১০ ফিট উচ্চতার একটি 'মেনোরাহ'— নির্মাণ করে।

ফিরে যাওয়া যাক ইউক্রেনে জার্মান দখলের দিনগুলোয়। ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের ইহুদিদের মতোই নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনার পাশাপাশি ইউক্রেনিয়দের উপর নিকৃষ্ট জাতির তকমা এঁটে জার্মান-পদানত ও জার্মান-সেবক এক দাসজাতিতে পরিণত করা ছিল নাজি পরিকল্পনা। ইউক্রেনিয়ার বহু শহরে বেশকিছু স্কুল, রেস্তোরাঁ ও গণযান কেবলমাত্র জার্মানদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। জার্মানদের জন্য আলাদা ডাক্তার, আলাদা হাসপাতালেরও বন্দোবস্ত হয়েছিল। স্থানীয় ইউক্রেনিয়দের জন্য চিকিৎসা বা অন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবা 'অপ্রয়োজনীয়' আখ্যা দিয়ে যতটুকু ছিল তারও বেশিটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ে ইউক্রেনিয় ছাত্রছাত্রীদের চতুর্থ শ্রেণির বেশি পড়াশোনা করার দরকার নেই বলে হুকুম জারি হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ইউক্রেনিয়রা তো জার্মানদের নির্দেশ মতো ক্ষেতে-খামারে কাজ করবে, সুতরাং তাদের বিদ্যালয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পত্তন করা রাষ্ট্রীয় খামার ব্যবস্থাটি নাজি জার্মানদের খুব মনে ধরেছিল। ইউক্রেনকে একটি কৃষি-উপনিবেশ হিসেবে পদানত রাখার জন্য এই রাষ্ট্রীয় খামার ব্যবস্থাই আদর্শ

বলে নাজি পরিকল্পকরাও মনে করেছিল। নাজি আধিকারিকরা তাই রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর পরিচালন-ব্যবস্থার দখল নিয়েছিল এবং কোনও ইউক্রেনিয় শহরে জার্মানদের অনুমতি ব্যতিরেকে খাদ্য বা শস্য পাঠানো যাবে না বলে হুকুম জারি করেছিল। এর ফলে শহরগুলোর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তীব্র খাদ্যসংকট তৈরি হয়, বহু মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসেন। ইউক্রেনিয় শহরগুলোয় উৎপাদনশিল্প চালানোর ভাবনা নাজি-পরিকল্পনায় ছিল না, তাই হিটলার-বাহিনী ইউক্রেনিয়ার শহরগুলো থেকে ২০ লাখেরও বেশি তরুণ-তরুণী শ্রমিকদের আটক করে জার্মানিতে পাঠিয়ে দেয় সেখানকার কল-কারখানায় প্রায় দাস-শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য।

এই গোটা প্রক্রিয়া চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে। নাজি জার্মান দখলদারির বিরুদ্ধে ইউক্রেনিয়দের মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে দুটি ধারায়। প্রথম ধারায় সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষ নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে জার্মান বাহিনীর যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ঝটিতি আক্রমণ পরিচালনায় প্রায় ২ লাখ ইউক্রেনিয় অংশ নেয়। দ্বিতীয় ধারায়, ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোভিয়েত শাসন ও নাজি জার্মান শাসন দুইয়ের বিরুদ্ধেই অগণিত ইউক্রেনিয় সংগ্রামে সামিল হয়। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠিত হওয়া একটি ছোট গোষ্ঠী 'ইউক্রেনিয়ান ইনসার্জেন্ট আর্মি' (ইউ-পি-এ) নাম নিয়ে সক্রিয় ছিল। ১৯৪২ সাল থেকে তারা জার্মানদের বিরুদ্ধেও আঘাত হানতে শুরু করে। ও-ইউ-এন-বি এবং ও-ইউ–এন-এম জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যোদ্ধাবাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ও জার্মান উভয় দখলদারির বিরুদ্ধে অবস্থানকারী বিভিন্ন ছোট-বড় গোষ্ঠী ইউ-পি-এ-র আধারে মিলিত হয়ে ৪০,০০০ জন যোদ্ধার একটি মিলিত বাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে সোভিয়েত ও জার্মান উভয়ের বিরোধী এই যোদ্ধাদলগুলো বিভিন্ন সময় কখনও লড়েছে জার্মান নাজি বাহিনীর বিরুদ্ধে, কখনও সোভিয়েত-পক্ষাবলম্বীদের বিরুদ্ধে, কখনও সোভিয়েত লাল ফৌজের বিরুদ্ধে, আবার কখনও পোল গেরিলা প্রতিরোধ বাহিনীর বিরুদ্ধে।

২২

সোভিয়েত শাসনের প্রত্যাবর্তন

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুব সীমান্তে গতিবদল হতে শুরু করল। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের নাছোড়বান্দা প্রতিরোধ নাজি হামলাবাহিনীর শক্তিকে ক্রমে নিঃশেষ করে এনেছে। ১০ লাখের উপর সেনার প্রাণের বিনিময়ে লালফৌজ জার্মান বাহিনীকে পিছু ঠেলে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। রাশিয়ার 'ক্রাসনায়া জভেজদা' সংবাদপত্রে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের শেষে প্রকাশিত 'স্তালিনগ্রাদে আজ' শীর্ষক ভাসিলি গ্রসমানের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই ছবি:

> শীতের সূর্যকিরণ ছড়িয়ে আছে গণকবরগুলোর উপর, আক্রমণের মূল অক্ষে প্রাণ হারানো সেনাদের মৃত্যুস্থলে বসানো রুক্ষ হস্তনির্মিত কবরফলকগুলোর উপর। মৃতেরা এখন ঘুমোচ্ছে, তারা ঘুমোচ্ছে কারখানা-উৎপাদনশালার ধ্বংসাবশেষের স্তূপের মাঝে, তারা ঘুমোচ্ছে খাদ ও পরিখাগুলোয়, তারা ঘুমোচ্ছে খাদমধ্যের আলিদেশে। জীবিত অবস্থায় যেখানে তারা যুদ্ধ করছিল, ঠিক সেখানেই এখন মৃতরা ঘুমোচ্ছে। কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করা এই পরিখা, বাঙ্কার, পাথরের দেওয়াল, কামান বসানোর ফাঁকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কবরফলকগুলো এক সহজ রক্তধোয়া আনুগত্যের মহান স্মারক হিসেবে।
>
> পবিত্র ভূমি! চিরদিনের জন্য স্মৃতিতে অমলিন রাখতে ইচ্ছে হয় এই নতুন শহরকে যে তার জনগণকে জয়োল্লাসে মত্ত স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে, সমস্ত প্রতিকূলতা শুষে নিতে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছে— তার মাটির তলায় বানানো আবাসস্থল, সূর্যের মুখে ধোঁয়া উগরানো চিমনি, রাস্তা আর নতুন পথের জালিকা, বাঙ্কার ও পরিখার মধ্যে থেকে উঁকি মারা ভারী কামানের দেহাংশ, তুলোয় ভরা জ্যাকেট বা ভারী আবরণী ও উশাঙ্কা টুপি পরা যুদ্ধের নিদ্রাহীন শ্রমে রত শয়ে শয়ে মানুষ, মাইনগুলোকে পাঁউরুটির চাঁইয়ের মতো

বগলে করে যারা নিয়ে যাচ্ছে, ভারী বন্দুকের ছুঁচোলো মুখ দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে, ঝগড়া-খুনসুটি করছে, নিচু গলায় গান গাইছে, গতরাতের গ্রেনেড আঘাত-প্রত্যাঘাত নিয়ে বলাবলি করছে। তাদের বীরত্বে তারা কতই না গরিমময় অথচ চাঁছাছোলা।

(ভাসিলি গ্রসমান, এ রাইটার অ্যাট ওয়ার: ভাসিলি গ্রসমান উইথ দি রেড আর্মি, আনতনি বিভর ও লুবা ভিনোগ্রাদোভা দ্বারা সম্পাদিত ও ইংরেজিতে অনুদিত, দি হারভিল প্রেস, ২০০৫, পার্ট থ্রি থেকে উদ্ধৃত। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

স্তালিনগ্রাদে জয়লাভের পর লালফৌজ নাজি জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে এগোতে থাকে জার্মানদের দখলে চলে যাওয়া অঞ্চল সোভিয়েত দখলে পুনরুদ্ধার করতে করতে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ইউক্রেনের ঠিক উত্তরে কুর্স্ক-য়ের বিপুল সেনা ও অস্ত্র সমাবেশ হওয়া যুদ্ধেও লালফৌজ জার্মানদের হারায় এবং তারপর ইউক্রেন পুনর্দখল শুরু করে। ১৯৪৩-য়ের আগস্টে খারকিভ, নভেম্বরে কিয়েভ এবং ১৯৪৪-য়ের জুলাইয়ে ল্‌ভিভ পুনর্দখল হয়। এরপর ১৯৪৪-য়ের অক্টোবরে সোভিয়েত সাঁজোয়া গাড়ির বহর যখন ট্রান্সকারপাথিয়ায় প্রবেশ করে, তখন সোভিয়েত সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয় যে সমগ্র ইউক্রেনের 'মুক্তি' লালফৌজের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

'মুক্তি' কাকে বলে? গোটা ইউক্রেন পাক খেয়ে চলা হিংসার আবর্তে অন্তহীন যুদ্ধের প্রান্তরে পরিণত হল। ধ্বংসলীলা ঢেউয়ের মতো বারম্বার শহরগুলোর উপর আছড়ে পড়তে লাগল। মাঠের ফসলে আগুনে ধ্বংস হল। অগ্রসরমান সোভিয়েত লালফৌজ, পশ্চাদপসরণকারী নাজি জার্মান বাহিনী এবং ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র দল— একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এই তিন পক্ষ হিংসার উন্মত্ততায় একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিল। কোনও গ্রামের মানুষদের সোভিয়েত পক্ষকে সহায়তা করার জন্য জার্মানরা জ্বালিয়ে দিল, আবার অন্য কোনও গ্রামকে জার্মানদের সহায়তা করার জন্য সোভিয়েত লালফৌজ জ্বালিয়ে দিল। কোথাও কোথাও গোটা গ্রাম এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে অগ্রসরমান লালফৌজ যখন পোল্যান্ডে প্রবেশ করল এবং দখল নিতে নিতে জার্মানির দিকে ঠেলে চলল, ইউক্রেন দেখভাল করার জন্য কয়েক হাজার সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ ও সুরক্ষাবাহিনী পাঠানো হল। বিশেষভাবে পশ্চিম ইউক্রেনে তাদের মোতায়েন করা হল ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দমন করে নির্মূল করার জন্য। বহু ইউক্রেনিয়

পুনর্দখলকারী সোভিয়েত বাহিনীর হাতে নিপীড়নের আশঙ্কায় পশ্চাদপসরণকারী জার্মান বাহিনীর সাথে সাথে ইউক্রেন ছেড়ে পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নিয়েছিল। জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দি হওয়া বা দাসশ্রমিক হিসেবে চালান হওয়া বহু ইউক্রেনিয় শ্রমিক ও বন্দিরাও নাজি-পতনের পর মুক্ত হয়েও ইউক্রেনে ফেরেনি সোভিয়েত নিপীড়নের ভয়ে। তাছাড়া, যুদ্ধের জন্য শহর ছাড়তে হয়েছিল যাদের, যুদ্ধের পর তারা অনেকেই আর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শহরে ফেরার অনুমতি পেলেন না। যারা অনুমতি পেয়ে ফিরলেন, তাদের অধিকাংশ নিজেদের ফেলে-যাওয়া ঘর-বাড়ি-আসবাবপত্র ফিরে পেলেন না বেদখল হয়ে যাওয়ায়। অনেকে নতুন থাকার জায়গাও পেলেন না। শহরে থাকার জায়গার তখন বড় অভাব, তা পেতে গেলে সোভিয়েত কর্তা-আমলাদের উঁচু মহলে প্রভাব বা উৎকোচ প্রয়োগ করতে হবে। শহরের বাসস্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েত কর্তাদের ক্ষমতা খাটানোর ও স্বজনপোষণের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠল। জার্মান দখলের সময় সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়েছিল যে ইহুদি সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের মানুষরা সোভিয়েত দখলে ফেরা শহরে ফিরে এসে দেখল যে সোভিয়েত কর্তারাও আর তাদের শহরে স্থান দিতে ইচ্ছুক নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গড়ে ওটা 'ইহুদি ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিটি' এই বিষয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার দরবার করে, সেই কমিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং এ ব্যাপারে প্রতিবিধানের জন্য মলোটভের কাছে চিঠি লেখেন, অথচ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়না। যুদ্ধশেষের পর ও বিশেষ করে ইজরায়েলে নবগঠিত ইহুদি-রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হিসেবে সোভিয়েত প্রভাববলয়ের বাইরে অবস্থান নেওয়ার পর সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতাদের কাছে 'ইহুদি ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিটি'র প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় নাকি ইহুদিরা প্রতিরোধ না করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই প্রচার লোকমুখে ঘুরছে আর ইহুদি বিরোধী মানসিকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। (সূত্র: জুলিয়ান ফুরস্ট সম্পাদিত,লেট স্তালিনিস্ত রাশিয়া: সোসাইটি বিটুইন রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিইনভেনসন, রুটলেজ, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ২৩৩–২৪৩)

সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত নয় এই অভিযোগে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছিল আরও একাধিক জনজাতির মানুষদের। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ তাতাররা। তাতার জনজাতির মানুষরা ক্রিমিয়ার আদি বাসিন্দা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ১৯৪১ সালের অক্টোবরেই জার্মান সেনা ক্রিমিয়া দখল করে। জার্মান দখলে থাকার সময় জার্মানদের গড়ে তোলা প্রশাসনে কিছু তাতার অংশ নিয়েছিল।

তবে বেশিরভাগ তাতার গ্রামের মানুষদের জার্মানরা ব্যবহার করেছিল বদ্ধ-শ্রমিক হিসেবে। জার্মান দখল বহাল ছিল ১৯৪৪ সালের এপ্রিল অবধি। এরপর সোভিয়েত লালফৌজ ক্রিমিয়া পুনর্দখল করে। জার্মান দখলে থাকার সময় তাতাররা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এই অভিযোগে স্তালিন তখন হুকুম দিলেন ক্রিমিয়াকে নিরাপদ করার জন্য সমস্ত তাতারদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের জায়গায় রুশদের নিয়ে গিয়ে বসাতে হবে। সোভিয়েত গুপ্তপুলিশ ও সুরক্ষাবাহিনী সেই অনুযায়ী কাজে নামল। ২ লাখেরও বেশি তাতার জনজাতির মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে গরু-ভেড়ার মতো পশুচালানকারী রেলের চার-দিক-বন্ধ বগিতে ঠাসা হল। তারপর সতর্ক প্রহরায় সেইসব রেল ক্রিমিয়া ছেড়ে যেতে লাগল দূরে আরও দূরে। বদ্ধ বগিতে ঠাসাঠাসি শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, পুরুষ। তাদের কারও কারও পরিবারের যুবকটি হয়ত তখনও লালফৌজের উর্দি পরে দূর কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে, সে জানে না তার বাবা-মা-বউ চলেছে নির্বাসনে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। দিনের পর দিন অবিরাম চলে রেল। প্রায় অনাহারে বদ্ধ বগির মধ্যে প্রাণ হারায় কোনও বৃদ্ধ, কোনও শিশু, কোনও পুরুষ, কোনও মহিলা। মাঝে জনহীন চরাচরে ট্রেন থামে, প্রহরীরা এসে বগির দরজা খুলে মৃতদেহগুলোকে টেনে বাইরে ফেলে দেয়। আবার ট্রেন চলতে শুরু করে। মধ্যএশিয়ার ঊষর জনহীন প্রান্তরে এসে ট্রেন থামে। অর্ধমৃত মানুষগুলোকে নামানো হয়। যতজনকে নিয়ে এই জেলখানা-ট্রেন যাত্রা শুরু করেছিল, তার অর্ধেক ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বাকিদের বলা হয় ওইখানেই তাদের বসত গড়ে নিতে হবে। ট্রেন ও প্রহরীরা চলে যায়। রাষ্ট্র নতুন প্রহরী পাঠায়। রাষ্ট্রের প্রহরায় অচেনা অনভ্যস্ত ভূমিতে দেশ-কেড়ে নেওয়া মানুষগুলো আবারও বাঁচার চেষ্টা শুরু করে। অনেকে অপুষ্টিতে মারা যায়। অন্যদিকে তাতার মানুষদের ফেলে আসা ঘর-বাড়ি-জমিতে রুশ জাতির মানুষদের নিয়ে এসে বসানো হয়। ক্রিমিয়া হয়ে ওঠে রুশ-প্রধান অঞ্চল। তার প্রধান শহর সেবাস্তোপোল সোভিয়েত রাষ্ট্রের নৌবহরের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে ওঠে।

আবলিয়াজিজ উমেরোভিচ রমজানোভ একজন তাতার, ১৬ বছর বয়সী এক যুবক হিসেবে যাকে বাস্তুভূমি চ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত মানুষদের শিবিরের সোভিয়েত নজরদার কর্তারা তার নামটাও বদলে দিয়েছিল। আবলিয়াজিজের আদি পদবি ছিল এদরিসভ। সোভিয়েত কর্তারা তা পাল্টে তার বাবার প্রথম নাম রমজান-য়ের

থেকে নতুন পদবি রমজানভ তৈরি করে সেই নামেই সব কাগজপত্র করেছিল। পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী পদবির মৃত্যু হয়েছিল সেখানেই। কেবল নাম বা পদবি পরিবর্তন নয়, স্থানান্তরিত তাতারদের আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতি সবই বদলে দিতে চাওয়া হয়েছিল। তাতারদের প্রথাগত সামাজিক বা ধর্মীয় রীতি বা অনুষ্ঠান পালন ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাতারদের নিজেদের মধ্যেও তাতার ভাষায় কথা বলা ছিল নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য, রুশ ভাষায় কথা বলা ছিল বাধ্যতামূলক। ২০০৪ সালের জুনে রবার্ট লাতিপভ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবলিয়াজিজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

> আমাদের নিপীড়ন করা হয়েছিল। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬ অবধি ১২ বছর ধরে কমাণ্ডান্টের দপ্তর আমাদের নিপীড়ন করেছিল। গোটা সময়কাল আমাদের রুশ ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল।
>
> আমাদের বাড়ি ছিল ক্রিমিয়ায় তাতারদের গ্রামে। জার্মানরা ক্রিমিয়া দখল করল। আমাদের গ্রামে এল প্রতি ঘর থেকে সমর্থ পুরুষদের তুলতে লাগল তাদের হয়ে বেগার শ্রম করার জন্য। আমি ছিলাম বড় ছেলে। আমার বাবা আমাকে বলল, তোকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি। জার্মানরা রেললাইন বানাচ্ছিল। সেই কাজে বাবা চলে গেল। আর ফিরল না। সেখানেই মারা গেল। আমরা ছয় ভাইবোন, আর মাকে নিয়ে পরিবারে সাতজন। খাওয়া জুটবে কী করে। আমি বড়, আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। জামাকাপড় যা জুটল গায়ে চাপিয়ে আমি শহরের পথে বের হলাম। একবাক্স শুকনো ফল নিয়ে শহরে এসে সেগুলোর বিনিময়ে যা করেই হোক ভুট্টা, গম বা যে কোনও শস্যদানা জোগাড় করতাম, তারপর আবার ৩৫ কিলোমিটার পেরিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ঘরে তা গুঁড়ো করে সবার খাওয়ার জোগাড় হত। সেই শহরের নাম ছিল কারাসাবাজার, এখন তার নাম হয়েছে বেলোগোরস্কি।... একদিন শহরে যাওয়ার পথে বেরিয়ে কিছুটা গিয়ে দেখলাম জার্মানরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কোথাও পালানোর উপায় ছিল না। জার্মানরা সবাইকে গ্রেফতার করছিল। আমাকেও গ্রেফতার করল। তরুণ বা বয়স্ক শুধু পুরুষদের ধরে তারা জড়ো করল। মেশিনগান হাতে জার্মান সেনারা পাহারায়। জার্মান সেনার গাড়ি এল। তারা সবাইকে নিয়ে গেল সিমপেরফুল-য়ে। সেখানে একটা বড় বাড়িতে এক কি দুই মাস বন্দি থাকতে হল। তারপর সবাইকে ঠেসে তুলল ট্রেনে, নিয়ে গেল কৃষ্ণসাগরের কূলে। ওখানে একটা বন্দর ছিল। আমাদের সবাইকে জাহাজে চড়ে বেগার শ্রমিক হিসেবে জার্মানিতে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু জাহাজ আসার আগেই সে পরিকল্পনা নাকচ হয়ে

যায়, জার্মানরা আমাদের আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে দিল— এ গ্রামে ১০ জনা তো ও গ্রামে ১০ জনা, গ্রামের লোকদের বলা হল আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। দিনের বেলা আমাদের বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হত আর রাতে আমাদের দিয়ে পরিখা কাটানো হত। প্রায় এক মাস এই চলল। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সিভাস নামের এক জলা জায়গায়। যুদ্ধের পরিখা খোঁড়ার জন্য। অপরদিকে রুশ বাহিনী আর এদিকে জার্মান বাহিনী। রুশরা ক্রমশ এগিয়ে এল। জার্মান সেনা, আমাদের অস্থায়ী শিবিরের প্রহরীরা সহ, পালাতে লাগল। আমরা হঠাৎ মুক্ত হয়ে গেলাম। আমি হেঁটে আমার গ্রামে ফেরার পথ ধরলাম। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম লালফৌজের সেনারা পিছে পড়ে যাওয়া পলায়নপর জার্মান সেনাদের হত্যা করছে কীভাবে।

অবশেষে গ্রামের বাড়িতে ফিরলাম। ভাইবোনেরা বেঁচে ছিল, মা-ও বেঁচে ছিল। কিন্তু এক মাসও পেরোল না, রুশরা আমাদের এবং আমাদের গ্রামের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ভিটেছাড়া করল। আমাদের গ্রামে একটা স্কুল ছিল। স্কুলবাড়িটা বেশ বড়। রুশরা গ্রামের সবাইকে জড়ো করে সেই স্কুলবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল। রুশদের সমস্ত পরিকল্পনা আগে থেকেই ছক কষে রাখা ছিল। সেই অনুযায়ী ওরা আমাদের রেলবগিতে ঠেসে ঢুকিয়ে পাঠিয়ে দিতে লাগল। রুশরা আমাদের কাউকে নিজেদের একটা কোনও জিনিষ নিয়ে আসতে দেয়নি। হাতে বহন করা যায় এমন তিন দিনের মতো খাবার শুধু সঙ্গে নিতে বলেছিল। ব্যাস। তাছাড়া কেবল খালি হাতেই গ্রাম ছাড়তে তারা বাধ্য করেছিল। প্রথমে ট্রেনে, তারপর বজরায়। বহু দূর। আমাদের এনে ফেলল জাবাতস্কি-তে। সেখানে পুরানো ব্যরাক ছিল। আমাদের আগে সেখানে ধরে আনা হয়েছিল কুলাকদের– নিকুলাকিকরণের জন্য। কিন্তু আমাদের যখন আনা হল তখন ইতিমধ্যেই তা ফাঁকা হয়ে গেছে। আগে আসা সে কুলাকদের কী পরিণতি হয়েছিল কে জানে! সেখানে আমাদের শ্রম করার জন্য নথিভুক্ত করা হল। গাছকাটা ও কাঠচেরাইয়ের কাজ। তৎক্ষণাতই আমরা কমাণ্ডান্টের দপ্তরের জিম্মায় চলে গেলাম। নথিভুক্তকরণের পর তারা আমাদের জঙ্গলে নিয়ে গেল, কোথায় কাজ করতে হবে দেখিয়ে দিল, করাত ও তেমন আরও কিছু হাতিয়ার দিল।

জঙ্গল, জঙ্গল আর জঙ্গল... শ্রম, শ্রম আর শ্রম। সর্বক্ষণ। অন্য কোথাও যাওয়া মানা, অন্য কিছু ভাবা মানা, পৃথিবীতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

দুজন দুজন করে জুটি বেঁধে আমাদের কাজ করতে হত। আমরা করাত চালিয়ে গাছ ফেলতাম, গুঁড়ি চেরাই করতাম, টুকরো করতাম— এই-ই করে যেতাম। ওরা প্রত্যেকের জন্য কাজের কোটা বেঁধে দিয়েছিল তিন কিউবিক মিটার করে।

চেরাই কাঠ ঘোড়া দিয়ে টেনে ভিসেরা নদীর ধারে এনে গাদা করা হত, তারপর জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ওই সব কাঠ ছিল ভিসেরস্ক কাগজ কারখানার জন্য। যারা খাটতে পারত না তারা টিকতে পারেনি, বাঁচতে পারেনি। আমি খুব খাটতে পারতাম। খালি খাটতাম আর খাটতাম। আমাদের দায়িত্বে থাকা সোভিয়েত অরণ্যপাল আমাকে একদিন বলল, 'ছোকরা, তোকে আমি ঘোড়া দেব, এখন থেকে ঘোড়া দিয়ে কাঠ টানার কাজ করবি তুই'। প্রায় এক বছর ধরে ওই কাঠ টানার কাজ করে গেছিলাম। ভয়ানক শীত পার করেছিলাম। তারপর ১৯৪৫ সালের বসন্ত এল। ওরা আমাদের ভোলিনকা-তে পাঠিয়ে দিল।

সেই প্রথম এক বছরে অনেকজন মারা গিয়েছিল। কতজন কী করে বলব? বলতে পারব না। সবার প্রথমে মারা গিয়েছিল বৃদ্ধরা। তারপর দুর্বল অশক্তরা। তারপর শীতের কোপ সহ্য করতে পারেনি যারা তারা মরেছিল। জাবাতস্কি গ্রাম ছিল গোটাটাই একটা বড় ব্যারাক, ছোট্ট একটাই দোকান ছিল আর একটা ছোটমতো বারোয়ারি খাওয়ার ঘর ছিল। পরিবেশ ও আবহাওয়া ছিল কঠিন। কতো যে ডাঁশ ছিল, কল্পনাতীত! মানুষের পক্ষে তা ছিল সহ্যের অতীত! আর ছিল ছারপোকার কামড়! ডাঁশের দল ঝাঁক বেঁধে উড়ত... কীভাবে যে তারা কামড়াতো... মুখে গায়ে সারা জায়গায়। সহ্য করা ছিল দুষ্কর। তাতাররা খুব শক্তপোক্ত মানুষ, তবু অনেকে মরেছিল। যারা বেঁচেছিল তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

ভোলিনকার শিবিরের রুশ কমাণ্ডান্টের নাম ছিল এভেগেনি ইভানোভিচ সেমিভিয়াকভ। সে আমাকে জেলে পোরার ফন্দি এঁটেছিল। মুখ বুজে কী খাটনিই না আমি খাটতাম! তবু কে জানে কেন তার আক্রোশ থেকে রেহাই পাইনি। তার আক্রোশ ফলানোর ছুতো হয়েছিল আমার এক বিনীত অনুরোধ। আমাদের ভাইবোন আর মাকে আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা শিবিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ ভোলিনকায়, কেউ ক্রাসনোভিসেরস্কে...। সারাদিন জঙ্গলে খাটতে খাটতে জামাকাপড় ছিঁড়ে যেত, প্যান্ট ছিঁড়ে যেত, সেলাই করারও সময় বা উৎসাহ অবশিষ্ট থাকত না। পরিবারের জীবন মনে পড়ত। পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকতে পারলে হয়ত কিছুটা ভালো থাকতে পারব সাবাই। তাই আমি কমাণ্ডান্টের দপ্তরে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের পরিবারের সকলকে এক জায়গায় থাকতে দিতে। কমাণ্ডান্ট ক্ষিপ্ত হয়ে গেল তাতেই, আইন ভাঙার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের মোটা ফাইল তৈরি করে সেই ফাইল সমেত আমাকে পাঠাল উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে জেলে পাঠানোর জন্য। প্রচুর কাজ করার জন্য ১৯৪৭

সালে খেতাব পেয়েছিলাম বলে সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলাম, জেলে যেতে হয়নি। আবার শিবিরে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

তারপর মুখবুজে আবারও শ্রম করে যেতে লাগলাম। জঙ্গলে আমাদের সঙ্গেই কাজ করত ওডেসার আদি বাসিন্দা এক জার্মান মেয়ে। ইউক্রেনের নানা জায়গায় থাকা জার্মানদেরও আমাদের মতোই বাস্তুচ্যুত করে শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। তার সাথেই ঘর বাঁধলাম, আমরা দুজনে শিবির দপ্তরে গিয়ে বিবাহ নথিভুক্তকরণ করে নিয়েছিলাম। আমাদের প্রথম সন্তানকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। শিশুকন্যাটি কঠিন আবহাওয়ায় অপুষ্টিতে মারা গিয়েছিল।

গাছকাটা ও কাঠচেরাই স্টেশনের কর্তা স্যাভিলেভ তারপর আমাকে ক্রাসনোভিসেরস্কে পাঠাল গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে। তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি গাড়ি চালাতে শুরু করি। তারপর ৩২ বছর আমি সোভিয়েত কর্তাদের গাড়ির চালক হিসেবেই কাজ করেছি।

জাবাতস্কি আর ভোলিনকা ছাড়া আশেপাশে আরও পাঁচটা গ্রাম গড়ে উঠেছিল বলপূর্বক স্থানান্তরিত করা মানুষদের শিবির হিসেবে— মুতিখা, ভাইয়া, জোলোটাঙ্কা, ভেলস আর কোলচিন। ইহুদি, তাতার, জার্মান, ইউক্রেনিয় ও বেলারুশদের জড়ো করা হয়েছিল সেখানে। ত্রাস ছিল সর্বত্র। সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা যাবেনা। রুশদের কথা বাদ, ওরা তো রুশ। যারা রুশ নয় তারা সবাই সোভিয়েত কমাণ্ডান্টের অধীনস্থ। কমাণ্ডান্টের বিরুদ্ধে গিয়ে একটা কথা বললে তোমাকে কমাণ্ডান্ট জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, তোমার বিরুদ্ধে মোটা অভিযোগের ফাইল তৈরি হবে আর জেলখানা তোমাকে গিলে নেবে। জঞ্জাল যত রকমের! কখনও যদি তুমি মেজাজ হারিয়ে ফেল, কোনওরকম প্রত্যাঘাত করে বস, তোমাকে 'সরকার-বিরোধী জনগণের শত্রু' হিসেবে গিলে ফেলা হবে।

স্তালিন? স্তালিনের বিরুদ্ধে একটা কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্ষেত্রেই চরম শাস্তি বরাদ্দ ছিল। হ্যাঁ, আমরা ভয় পেতাম। ভয় তো পেতামই। স্তালিন নিয়ে খারাপ কিছু বলা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৯৫৩-য় স্তালিন মারা গেল। আর ১৯৫৬ সালে ওরা আমাদের ওই 'স্বাধীনতা' শব্দটা উপহার দিল নেড়েচেড়ে দেখার জন্য। স্বাধীনতা? রসবোধেও ওরা নিষ্ঠুর। 'স্বাধীন' তাতাররা তাদের নিজেদের চোদ্দপুরুষের ভিটেয় ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতাটুকুও পেলনা।

(২০০৪ সালের জুনে পার্ম প্রদেশের ভিসেরোগোরস্ক গ্রামে রবার্ট লাতিপভের নেওয়া আবলিয়াজিজ উমেরোভিচ রামাজানভ-য়ের সাক্ষাৎকার অবলম্বনে

লিখিত। মূল সাক্ষাৎকারটির প্রতিলিপির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে ২০১১ সালে প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত জেহানে এম ঘেইথ ও ক্যাথেরিন আর জোলুক সম্পাদিত 'গুলাগ ভয়েসেস: ওরাল হিস্ট্রিজ অফ সোভিয়েত ইনকারসেরেশন, অ্যান্ড এক্সাইল' বইয়ের ৪৭–৬৬ পৃষ্ঠায়।)

স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর জন্য সোভিয়েত প্রশাসনের 'বিশেষ উপনিবেশ'-গুলোয় আবলিয়াজিজ হরেক জনজাতির মানুষদের দেখেছিলেন। জনজাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষদের 'অপরাধী' বা 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে গণস্থানান্তরকরণ ও 'বিশেষ উপনিবেশ'-য়ের শিবিরে বন্দি রাখা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই। গ্রামে গ্রামে 'কুলাক'-দের উচ্ছেদ করার পর্বের পরেই শুরু হয়েছিল তা। তার প্রথম বলি হয়েছিল কোরিয়, পোল, জার্মান ও ফিন জাতিপরিচয়ের সোভিয়েত নাগরিকরা। তারা সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গোটা জনসম্প্রদায়কে বসতভিটে থেকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে নজরবন্দি শ্রমশিবিরে আনা হয়, বহুজনকে গুলাগের বন্দিশিবিরেও পাঠানো হয়। কারণ এই জনজাতির মানুষরা সীমান্ত অঞ্চলে বাস করলে রাষ্ট্র নিজেকে নিরাপদ মনে করছিল না। পররাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে এই জনজাতির মানুষরা রাষ্ট্রের পক্ষ নাও নিতে পারে এই আশঙ্কাই গোটা জনজাতিগুলোকে রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী করে তুলেছিল। একই কারণে ১৯৩৬ সালে ৪৫,০০০ জার্মান ও পোল জাতিপরিচয়ের মানুষদের ইউক্রেনে তাদের দীর্ঘদিনের বসত থেকে উচ্ছেদ করে কাজাখস্তানে পাঠানো হয়, তাছাড়াও অনেককে গ্রেফতারের পর গুলি করে মেরে ফেলা হয়। ১৯৩৯-য়ে হিটলারের নাজি রাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ ও সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমদিকে দখলদারি বিস্তারের সময় নব্য অধিকৃত লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, পূর্ব পোল্যান্ড ও উত্তর-পূর্ব রোমানিয়া থেকেও সেখানকার জনজাতীয় মানুষদের গণহারে গ্রেফতার ও গুলাগ বন্দিশিবিরে পাচার বা নজরবন্দি শ্রমশিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কারণ ছিল একই— এসব জনজাতির মানুষদের সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্বস্ত বলে রাষ্ট্র মনে করেনি। হিটলার চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করার পর ইউক্রেনে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী জার্মান জাতিপরিচয়ের মানুষদের ('ভোলগা জার্মান' নামে যারা পরিচিত ছিল) একইভাবে রাষ্ট্রের চোখে সন্দেহভাজন হিসেবে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চেচেন ও তাতার জনজাতির মানুষদের স্থানান্তরিত

করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পশ্চিমের পুনর্দখলে আসা এলাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার জন্য আবারও এই সমস্ত এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে গুলাগে পাঠানো হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ছিল পশ্চিম ইউক্রেনের ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদীরা। সোভিয়েত গুপ্তপুলিশের নথিতে নথিভুক্ত সংখ্যা থেকে হিসেব করলে দেখা যায় যে ১৯২৮ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে গুলাগে এভাবে অন্তরীণ হতে হয়েছিল প্রায় ২কোটি ৫০লক্ষ মানুষকে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজে গড়ে বছরে ৮লাখ মানুষকে বদ্ধ শ্রমিক হিসেবে নবনিয়োগ করে গেছে সোভিয়েত রাষ্ট্র, তার সিংহভাগটাই এসেছে এই স্থানান্তরিত জনজাতিদের মধ্য থেকে। ভিসেরস্ক-য়ের নতুন কাগজ কারখানায় কাঠ যোগান দিতে যেভাবে আবলিয়াজিজরা দাস-শ্রমিকের মতো কাজ করেছিলেন, তেমনভাবেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে সাকার করার জন্য এই সমস্ত বদ্ধ শ্রমিকদের কাজ করতে হয়েছিল। তাদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, সন্ত্রাসের শাসনে শরীর-নিঙড়ানো শ্রম করে যেতে হয়েছিল। জঙ্গলকাটা ও কাঠচেরাই ছাড়াও বিপুল মাত্রার নির্মাণকাজ, কয়লার খনি, সোনার খনি সর্বত্র এদের ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিপুল সংখ্যক অ-রুশ জনজাতির মানুষদের রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে অন্তর্ভুক্তি গুলাগের বন্দিশিবিরগুলোর পরিবেশে কিছু বদল আনতে শুরু করেছিল। 'গুলাগ' নাম-সংক্ষিপ্তকরণটি রুশ নাম 'গ্লাভনোয়ি উপরাভ্লেনি লাজেরেই' থেকে এসেছে। এই রুশ নামের অর্থ হল 'প্রধান শিবির প্রশাসন'। সোভিয়েত প্রশাসনের এই শাখাটির পত্তন হয়েছিল ১৯২৯ সালে। স্তালিনের আমলে বন্দিদের দিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রম করানোর ব্যবস্থা নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যে বহুবিস্তৃত রূপ ধারণ করেছিল, তা পরিচালনা করার জন্য এই 'প্রধান শিবির প্রশাসন'। জেলখানা, শ্রমশিবির, শ্রমউপনিবেশ ও বন্দিচালান শিবিরগুলোর সোভিয়েত দেশ জুড়ে বিস্তৃত জালটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করত এই 'গুলাগ', সেই থেকে এই গোটা জালটিই 'গুলাগ' নামে পরিচিত হয়ে উঠল। শুরুর দিকে বন্দিদের বাধ্যতামূলক শ্রম করানোর পিছনে আদর্শনৈতিক যুক্তি হিসেবে 'শ্রমের মাধ্যমে অপরাধীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে পুনঃশিক্ষিত করে তোলার' কথা বলা হত। ক্রমশ সে যুক্তি-অজুহাত বাতুল হয়ে পড়ল। দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটানোর স্তালিনিয় পরিকল্পনায় গুলাগ হয়ে উঠল

অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। মানুষের বসবাস দুরূহ এমন জলা-জঙ্গল ও তুষার-অঞ্চলে বন্দিদের শরীর নিঙড়ে সোভিয়েত উৎপাদন নিঃসারিত হতে লাগল। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তার সর্বময় কর্তা স্তালিন সন্দেহভাজন ও ডানের-বাঁয়ের সব সমালোচকদের দিয়ে গুলাগ ভরে তুলল। গুলাগে চুরি-খুন-জখম-রাহাজানি করে গ্রেফতার হওয়া বন্দিদের তুলনায় এই রাজনৈতিক কারণে বন্দিরা হয়ে উঠল সংখ্যাধিক। কেবল ১৯৩৭-১৯৩৮ সালেই সোভিয়েত গুপ্তপুলিশের নথি অনুযায়ী এমন ১৬ লাখ রাজনৈতিক বন্দিকে গুলাগে পাঠানো হয়েছিল। গুলাগ শিবিরগুলোয় 'অপরাধী' ও 'রাজনৈতিক বন্দি'-দের মধ্যে বিভাজন ছিল প্রকট। গুলাগ শিবিরগুলোর সোভিয়েত প্রশাসকদের চোখে 'অপরাধী'-রা ছিল তুলনায় বেশি আস্থাভাজন, তাদেরকে দিয়ে রাজনৈতিক বন্দিদের উপর নজরদারি ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 'অপরাধী'-রা তাদের এই সুবিধাভোগী অবস্থানকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক বন্দিদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব জারি করার সুযোগ নিতে পিছপা হয়নি। 'অপরাধী'-দের হাতে রাজনৈতিক বন্দিদের নানা হেনস্থা হতে হত, নিজেদের প্রাত্যহিক ভাগের খাবারটাও তাদের হাতে তুলে দিতে হত, কারণে-অকারণে মারধোর খেতে হত। বন্দিদের মধ্যে উচ্চাবচ ধাপবন্দি এক কাঠামো সোভিয়েত প্রশাসকরা নিজেদের সুবিধার্থে এভাবে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। তারপর সোভিয়েত রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশ বাসী বিভিন্ন অ-রুশ জনজাতি সম্পর্কে যত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠতে থাকল, গুলাগ ততই ভরে উঠল সেইসব বিভিন্ন জনজাতির মানুষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই জনজাতীয় পরিচয়ের জন্য গ্রেফতার হওয়া মানুষরাই হয়ে উঠল রাজনৈতিক বন্দিদের সিংহভাগ অংশ। জনজাতীয় পরিচয়ের জন্য গ্রেফতার হওয়া মানুষরা গুলাগের শিবিরে শিবিরে তাদের নিজস্ব জনজাতির বন্দিদের জোট গড়ে তুলতে লাগল। ভাষা-জাতীয়তার বন্ধন, ভাষা-নিপীড়ন জাতি-নিপীড়নের তীব্র বোধ অন্য রাজনৈতিক বন্দিদের তুলনায় তাদের এই জোট বাঁধাকে অনেক সহজ করে তুলেছিল। বিশেষ করে ইউক্রেনিয় বন্দিরা এক্ষেত্রে ছিল আগুয়ান। তাদের অনেকেই ইউক্রেনিয় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও লালফৌজের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করে এসেছে। বন্দিশিবিরগুলোয় জোট বেঁধে তারা প্রথমে 'অপরাধী'-দের জোরজুলুমের বিরুদ্ধে এবং তারপর সোভিয়েত প্রশাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ১৯৫০-য়ের দশকের প্রথম দিক থেকেই গুলাগের শিবিরগুলোয় বন্দিদের বিদ্রোহের অভূতপূর্ব ঢেউ উঠল। সংগঠিত বন্দিরা অনশন ও ধর্মঘটের মতো পদক্ষেপ

নিতে শুরু করল একের পর এক গুলাগ শিবিরে। প্রহরী-প্রশাসকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে দলবেঁধে বন্দিদের পালানোর ঘটনাও ঘটল। কাজাখস্তানের উত্তর-পূর্বে একিবাসতুজ শিবিরের বন্দিদের ১৯৫১ সালের গণ-অনশন এবং ভোরকুটা শ্রমশিবিরের বন্দিদের ১৯৫৩ সালের ধর্মঘট ছিল সবচেয়ে বড় দুটো ঘটনা। ভোরকুটায় অনমনীয় বন্দিদের ধর্মঘট ভাঙতে সোভিয়েত সেনা গুলি চালিয়ে কয়েক শো বন্দিকে হত্যা করেছিল। ভোরকুটা শিবিরের ২৯ নম্বর খনির একজন বন্দি-শ্রমিকের বর্ণনায়:

> সোভিয়েত সেনা ও পুলিশের দল সঙ্গে জলকামান এনেছিল। জলকামানের নলের জলের তোড়ে ধর্মঘটীদের অবরোধকে ভাঙার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু জলকামানের নলের পাক খুলে আমাদের উপর তাক করার আগেই রিপেতস্কির ইশারায় আমরা বন্দিরা দল বেঁধে একটা দেওয়ালের মতো এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিতে দিতে ওই জলকামানকে গেটের বাইরে বার করে দিলাম, যেনবা তা একটা পুতুল-গাড়ি।... সেনা আর প্রহরীরা এক দমক গুলি ছুড়ল, সরাসরি বন্দিদের লক্ষ্য করে। আমরা একে অপরের হাতে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই প্রথমে কেউ লুটিয়ে পড়েনি, যদিও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, মারাও গিয়েছিল। কেবল ইহনাতোউইকজ আমাদের সকলের কিছুটা সামনে একা ছিল। মনে হল যেন হঠাৎ সে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তারপর সে ঘুরে আমাদের মুখোমুখি হল। তার ঠোঁট নড়ে উঠল কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না। একটা হাত সে সামনে বাড়িয়ে দিল, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
>
> (অ্যান অ্যাপেলবম, গুলাগ: এ হিস্ট্রি, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৪৪৩)

সেনা-পুলিশের সন্ত্রাস দিয়ে এক-একটা ধর্মঘট ভাঙলেও গুলাগ শিবিরে ধর্মঘট ও প্রতিরোধের ঢেউ আটকানো যায়নি। ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে সেই ঢেউ বজায় থেকেছে। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতারা গুলাগ নামের দপ্তরটিকে তুলে দেন, যদিও বন্দিনির্যাতনের শিবিরগুলি অধিকাংশই চালু রেখে দেওয়া হয়।

বন্দিশিবিরের বাইরের কথায় আবার ফিরে যাওয়া যাক। ইউক্রেনের গ্রামগুলো নিকুলাকিকরণের সন্ত্রাস, রাষ্ট্রের তৈরি দুর্ভিক্ষে অনাহার-মৃত্যু ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিংসায় দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় কৃষকদের মৃত্যু-শমন নিয়ে আসা সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর পতন ঘটবে এমন আশা অনেক ইউক্রেনিয়দের মনে দানা বেঁধেছিল। কিন্তু তা মরীচিকা বলে প্রমাণিত হল। জার্মান দখলদারির সময় ইউক্রেনকে জার্মানির কৃষি-উপনিবেশে পরিণত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে এই রাষ্ট্রীয় খামার ব্যবস্থা নাজি

পরিকল্পকদেরও পছন্দসই ছিল। আর সোভিয়েত পুনর্দখল তাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলল। যুদ্ধ থেকে ফেরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্মাননা ও পদক পাওয়া পূর্বতন সেনারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খামারের পরিচালকের আসনে বসল, তাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা মানে এখন 'জনগণের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া। এর উপর ইউক্রেনের গ্রামের মানুষদের ঘাড়ে আরও করের বোঝা চাপানো হল সোভিয়েত রাষ্ট্রের যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন পরিকল্পনার খরচ তোলার জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়:

> ইউক্রেনে... গ্রামের মানুষদের উপর একটা কৃষিকর চাপানো হয়েছিল। এর মানে দাঁড়াল এইরকম। তুমি যদি গ্রামে বাস কর, তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে তোমাকে সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে এতগুলো ডিম, এত পরিমাণ মাখন, এত পরিমাণ মাংস, এতগুলো আলু, এবং এত এত আরও বহু কিছু। আর তারপরও ওরা কর ধার্য করল প্রতিটা ফলের গাছের উপর। সুতরাং প্রতিটা গাছের জন্য ওদের কর বাবদ টাকা দিতে হবে।... কৃষকরা কোথায় পাবে টাকা? ইউক্রেন জুড়ে তারা তাদের কুড়ালগুলোকে তুলে নিয়ে ফলের বাগানে গেল, আপেল আর চেরির সব গাছগুলোকে কেটে ফেলল।... আবার কখনও ওরা হুকুম দিল যে মাঠ থেকে এত আলু তুলতে হবে— একটা বিশাল পরিমাণ— আর ওদের ওই আলুর কোটা যদি তুমি না মেটাতে পার, তো তোমার উপর জরিমানা বাবদ আরও নতুন কর চাপবে। বা অন্য কোনও ছুতোয় অন্য কোনও কর বসবে। মানুষরা তাই যে যেভাবে পারে প্রতিবাদ করেছিল। কেউ কেউ অস্ত্রও হাতে তুলে নিয়েছিল। কোনও না কোনওভাবে সরকারের কাজে অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা চালিয়েছিল।
>
> (ফেলিক্স আর্কাদিয়েভিচ সেরেব্রভ, ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে মস্কোয় এমিলি ডি জনসন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকার। পুরো সাক্ষাৎকারটি পাওয়া যাবে ২০১১ সালে প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত জেহানে এম ঘেইথ ও ক্যাথেরিন আর জোলুক সম্পাদিত 'গুলাগ ভয়েসেস: ওরাল হিস্ট্রিজ অফ সোভিয়েত ইনকারসেরেশন, অ্যান্ড এক্সাইল' বইয়ের ১৬৯–১৯০ পৃষ্ঠায়।)

এই প্রতিবাদের জন্য বহু ইউক্রেনিয় গ্রামবাসীকে গ্রেফতার হয়ে গুলাগে যেতে হয়েছিল। কোলখোজ, সোভখোজ নামধারী খামারগুলোর পরিচালক ও মাঝারি কর্তারা নিজেদের সরকারের নিঙড়ে নেওয়ার নীতি ও দমন নীতি উভয়ই কার্যকর করার হাতিয়ারে পরিণত করেছিল এবং সেই সুযোগে দুর্নীতি-

হাতসাফাইয়ের মাধ্যমে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার কাজে মনোযোগী হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে ইউক্রেন সহ সোভিয়েত দেশের গোটা পশ্চিমাংশে আবার খরা দেখা দিল, ফসল উৎপাদন ভয়ানক মার খেল। গ্রামে গ্রামে অনাহার আবার জেঁকে বসল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের গুদামে মজুত করা খাদ্যশস্য ছিল, কিন্তু স্তালিন ও তাঁর পারিষদবর্গ গ্রামে-শহরে অনাহারী মানুষদের জন্য সেই মজুত থেকে কোনও খাদ্যশস্য ছাড়লেন না, বরং তা বিদেশে রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা রোজগারের উপরই আরও জোর দিলেন। আর রাষ্ট্রীয় খামার মারফত কৃষকদের ঘাড়ে সেই দুঃসময়েও সরকারের হাতে আরও ফসল তুলে দেওয়ার হুকুম চাপানো হল, সরকারি ফসল সংগ্রহের কোটা ১৯৩৩-কে ফিরিয়ে আনার মতো বিপজ্জনক উঁচুমাত্রায় বাঁধা রইল। সরকারি ফসল সংগ্রহের পর বহু কৃষকের ঘরে পরের বছর ফসল বোনার মতো বীজটাও পড়ে রইল না। গ্রামে অনাহারের কোপ তীব্র হল। শহরেও কোপ পড়ল। প্রথমে শহরে খাদ্যের দাম বাড়ল, তারপর ২ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিক, দপ্তরী ও তাদের উপর নির্ভরশীল জনেদের খাদ্য রেশন ব্যবস্থা থেকে ছেঁটে ফেলা হল। সোভিয়েত দেশ জুড়েই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১০ লাখ থেকে ১৫ লাখ মনুষ সেই দুর্ভিক্ষে মারা গেল। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সবচেয়ে তীব্র ছিল ইউক্রেন ও মোলদাভিয়ায়, যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। (সূত্র: ডোনাল্ড ফিলৎজার, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিঙ ভার্সেস কোয়ালিটি অফ লাইফ: স্ট্রাগলিং উইথ দি আরবান এনভায়রনমেন্ট ইন রাশিয়া ডিউরিং দি আর্লি ইয়ারস অফ পোস্ট-ওয়ার রিকনস্ট্রাকশন, পৃষ্ঠা-৮২।) ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে রুশ চলচ্চিত্র পরিচালক এ এ সল্টিকভ 'দি চেয়ারম্যান' নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। ইউ এম নাগিবিন তার চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। চলচ্চিত্রটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই চলচ্চিত্রের একটি চরিত্র, যৌথ খামারের এক কৃষকের মুখে উঠে এসেছিল এই সংলাপ:

> আমি ভয় পাই। আমি ভয় পাই আমাদের নিজেদের লোকদের, আমি ভয় পাই বাইরের লোকদেরও। সমস্ত কর্তৃপক্ষ-কর্মকর্তা ও তাদের সব আদেশ-নির্দেশকে আমি ভয় পাই। আর সব চেয়ে খারাপ হল, আমার পরিবারের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার উপায় আমি করে উঠতে পারিনা।... মানুষ খুব ক্লান্ত। সবকিছুতেই তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

দশকের পর দশক জুড়ে পাক খাওয়া দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-সন্ত্রাস-হিংসা-র আবর্তের পর আবর্ত ক্ষয় ঘটিয়েছিল চরম। গ্রামগুলোয় পুরুষের সংখ্যা অতি কম। যুদ্ধ ও গুলাগ পুরুষ বলিই নিয়েছে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা সোভিয়েত দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যায় ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতি ১০০ জন মেয়ে পিছু মাত্র ২৮ জন ছেলে ছিল। ইউক্রেনে সে অনুপাত আরও কম। এর ফলে গ্রামীণ সমাজের বহমানতা রুদ্ধ। বিবাহ, পরিবার, নতুন শিশু জন্মের স্বাভাবিক ধারা শুকিয়ে এসেছে। জীবন যেন বিস্ময়ে ও যন্ত্রণায় নিজের বিকৃত ক্ষয়িত দেহের দিকে চেয়ে আছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরাও চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার নিয়ে। প্রতি ১০০০ জন পিছু নতুন শিশু জন্মের সংখ্যা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল ১৯৪৩ সালে। সোভিয়েত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী:

সাল	প্রতি১০০০ জন পিছু নতুন শিশু জন্মের সংখ্যা
১৯৪০	৩৫.৩
১৯৪১	৩১.৬
১৯৪২	২০.৫
১৯৪৩	১১.২

সোভিয়েত রাষ্ট্রপরিচালকরা তাঁদের অভ্যস্ত পথে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশ জারির মধ্য দিয়ে উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সমাধান করতে নামলেন। ১৯৩৬ সালেই পতনশীল জন্মহারকে ঠেলে তোলার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র একটি 'পরিবার আইন' জারি করেছিল। সেই আইনের মূল দিকগুলো ছিল :

- যে মহিলারা সাতটি বা তার বেশি সন্তানের জন্ম দেবে, তাদের সরকার থেকে বড় পরিমাণ ভরতুকি দেওয়া হবে,
- গর্ভপাত করা নিষিদ্ধ, গর্ভপাত করলে কঠোর সাজা পেতে হবে,
- প্রসূতিভবন ও সদ্যোজাতের যত্ন নেওয়ার পরিষেবা বাড়ানো হবে, এ ব্যাপারে খরচ যোগানোর জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা কর আদায় করা হবে,
- শিশু উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারকে মজবুত করার জন্য বিবাহবিচ্ছেদ অনুৎসাহিত করা হবে।

কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালকদের এহেন বিধিনির্মাণ যে জন্মহার পতনকে আটকাতে পারেনি, তা পূর্বোক্ত তথ্যেই প্রতীয়মান। সুতরাং তাঁরা ১৯৪১-য়ে আরো কঠোর বিধান জারি করলেন। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে জারি হল একটি ডিক্রি, তার নাম: 'ইউ এস এস আর-য়ের অবিবাহিত, সঙ্গীহীন ও সন্তানহীন নাগরিকদের উপর কর আরোপ প্রসঙ্গে'। এখানে সন্তান-উৎপাদনকে প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে সংজ্ঞাত করা হল এবং সেই দায়িত্ব যারা পালন করবে না তাদের উপর শাস্তিমূলক কর চাপানোর বিধি আনা হল।এই কারণে অবিবাহিত, বিপরীত লিঙ্গের যৌনসঙ্গী ছাড়া জীবন কাটানো বা সন্তানহীন (শারীরিক কারণে প্রজননক্ষমতাহীন হলেও) পুরুষ ও মহিলাদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-খেলাপী হিসেবে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হল এবং শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর কর চাপানো হল। যারা খামার, কারখানা বা দপ্তরে নিয়োজিত, তাদের মাইনে বা মজুরি থেকে সরাসরি এই কর কেটে রাখা হবে বলে ঘোষণা করা হল। এই ডিক্রি তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল স্তালিনের কাছে পাঠানো ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব। ক্রুশ্চেভ সেই ১৯৩৭-১৯৩৮ সালেই স্তালিনের বিশ্বস্ত জন হিসেবে ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত প্রশাসনকে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রকোপমুক্ত করতে নিজের কমরেডদের বলিদানে জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে ইউক্রেনের প্রধান নেতা হিসেবে উঠে এসেছিলেন। এখন এই পরিবার-আইনের খসড়া প্রস্তাব করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারক হিসেবে উপরে উঠে এলেন। ইউক্রেনে এই ডিক্রি লাগু হল অতিরিক্ত জোরজুলুমের সঙ্গে।

রাষ্ট্রের চোখে আর এক দল মানুষ নতুন করে দায়িত্বখেলাপী, অপরাধী বলে চিহ্নিত হলেও জন্মহার পতন আটকাল না, ১৯৪৩-য়ে তা তলানিতে এসে পৌঁছল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে ক্রুশ্চেভ নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলেন। বললেন যে ৫ বছরের মধ্যে ১৯৪০-য়ের হারে জন্মহারকে তুলে নিয়ে যাবে এই প্রস্তাব। ১৯৩৬ ও ১৯৪১ সালের বিধিগুলো এখানে আরও জোরদার করা হল। ৭-য়ের বদলে ২-টির বেশি সন্তান প্রসবকারী মহিলাই রাষ্ট্রীয় অনুদানের জন্য যোগ্য হল, সন্তানসংখ্যা আরও বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুদানও বাড়ার নিয়ম হল, সর্বোচ্চ অনুদান ও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান বরাদ্দ হল ১১-টি বা তার বেশি সন্তান প্রসবকারীদের জন্য। সন্তানহীনদের জন্য শাস্তি মূলক কর আরও বাড়ল, ২-য়ের কম সন্তান প্রসবকারীদের উপরও শাস্তি মূলক কর বসল, এমনকি তারপরও যদি তারা আরও সন্তান প্রসবে উদ্যোগী না হয় তাহলে সেই 'অপরাধ'-য়ের জন্য

জেলহাজতে পোরার শাস্তিও নির্দিষ্ট করা হল। কেবলমাত্র অতিরিক্ত সংস্থানহীন পেনশনভোগী ও যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা সৈনিকদের এর থেকে রেহাই দেওয়া হল। গর্ভপাতের জন্য শাস্তি আরও কড়া হল। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এল সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে। আগে বিপরীত লিঙ্গের বিবাহের মধ্য দিয়ে তৈরি পরিবারকেই সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র ধরা হয়েছিল। সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে নারীদের সংখ্যার তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমে যাওয়া এহেন সন্তান-উৎপাদন-ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার সামনে বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তাই নতুন প্রস্তাবে প্রধান সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারের বদলে জোর দেওয়া হল 'অবিবাহিত মা'-য়েদের উপর। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধন ছাড়াই সন্তান-উৎপাদনকারী মায়েদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাহায্য-সহায়তা দিয়ে সবকরমভাবে উৎসাহিত করার কথা বলা হল। পুরুষদের উৎসাহ দেওয়া হল যে পরিবারের বাইরে তার ঔরসজাত সন্তানের দায়িত্ব তাকে নিতে হবেনা। ১৯৪৪ সালের ৮-ই জুলাই এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হল। সোভিয়েত রাষ্ট্র 'অবিবাহিত মা' হওয়ার জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য 'মাতৃত্ব নায়িকা' নামে নতুন সম্মাননা চালু করল,'মাতৃত্ব গৌরব' ও 'মাতৃত্ব খেতাব' নামে নতুন পদক দেওয়ার কথা ঘোষণা হল।

ইউক্রেনে খোদ ক্রুশ্চেভের তত্ত্বাবধানে এই আইন কড়াকড়িভাবে লাগু হল। কিন্তু পুরুষবিরল গ্রামে 'অবিবাহিত মা'-য়েদের গর্ভধারণে 'সাহায্য' করা যায় কীভাবে? রাষ্ট্র তার সমাজব্যবস্থাপনায় সেখানেও ফাঁক রাখল না। সেনাবাহিনীর জওয়ানদের অভিনব 'দায়িত্ব' দেওয়া হল। বিশেষভাবে যৌনসক্ষম জওয়ানদের বিশেষ 'লিভ' বা অবকাশ মঞ্জুর করা শুরু হল, যা মুখে মুখে 'উর্বরতা অবকাশ' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এই অবকাশে জওয়ানরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ও রাষ্ট্রের খরচে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অবকাশযাপন করতে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের গর্ভবতী করার দায়িত্ব নিত। কোন অবকাশে কে কতজনকে গর্ভবতী করেছে তা নিয়ে জওয়ানদের মধ্যে ঘরোয়া আড্ডায় আস্ফালন ও বড়াই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। নিজ সেনার জওয়ানদের যৌনক্ষুধাকে স্নেহপূর্ণ প্রশ্রয়ের চোখে দেখা সোভিয়েত রাষ্ট্রে নতুন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে জার্মানির বার্লিন শহর দখল করার পর লালফৌজ যখন সেই শহরের মহিলাদের ধর্ষণ করার 'উৎসব' শুরু করায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তখন সর্বময় নেতা স্তালিন প্রশ্রয়ের সুরে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ কষ্টকর যুদ্ধের ধকল নিয়েছে ওরা, অনেকদিন পরিবার থেকে দূরে আছে, ছেলেরা হাঁফ ছাড়ার জন্য

অমন একটু করবেই।' কিন্তু সেনাদের যৌনক্ষুধাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের জন্য নবজাতক-উৎপাদনের এহেন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বোধহয় নজিরবিহীন। সেনা থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসা জওয়ানরাও বহুজনই গ্রামে তার পুরোনো স্ত্রী-সন্তানদের পরিবারে ফিরে গিয়ে দায়িত্ব নেয়নি, নতুন নতুন 'অবিবাহিত মা'-য়েদের গর্ভবতী করার দায়িত্ব নিয়েছিল, ইচ্ছেমতো স্বল্পস্থায়ী নতুন নতুন পরিবার তৈরি করে উর্বরতাবৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সামিল হয়েছিল। আর 'মাতৃত্ব নায়িকা' রাষ্ট্রীয়-আখ্যায় ভূষিত মেয়েদের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল? যুদ্ধ-সন্ত্রাস-হিংসার দগদগে ঘা ফুটে থাকা সমাজে, নতুন করে জাঁকিয়ে বসা দুর্ভিক্ষ-অনাহারের প্রকোপের মাঝে অধিকাংশ মহিলার কাছেই নিজের ও নিজের পরিবারের খাওয়ার জোগাড় করার একমাত্র উপায় ছিল গর্ভধারণ করে রাষ্ট্রের বহুপ্রজননকারীর জন্য বরাদ্দ সহায়তা লাভ করা। তবু, সম্পর্কহীন আবেগহীন যৌনাচারে নিজ দেহ সঁপে, পুরুষ-যৌনলালসার শ্বাপদের নখের দাগ বারবার দেহে দেগে বসতে দিয়ে তিনটি...সাতটি...এগারটি... সন্তানধারণের জন্য নিজ দেহকে একটি রাষ্ট্রীয় শিশু-খামারে পরিণত করা কেবলমাত্র ক্ষুধার তাড়নাতেও সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের তৈরি করা মাতৃসদন ও শিশুসহায়তা কেন্দ্রগুলো হয়ে উঠল রাষ্ট্রের নজরদারি সংস্থা। নারীদের জড়ো করে গর্ভধারণে 'সহায়তা' করা, গর্ভধারণের পর নজর রাখা যাতে গর্ভপাত না করতে পারে, সন্তানপ্রসবের পর নজর রাখা যাতে অবাঞ্ছিত সন্তানকে মেরে না ফেলতে পারে, পরিবারের সঙ্গে থাকলে নজরদারিতে অসুবিধা বলে 'অবিবাহিত মা'-য়েদের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পৃথক থাকার জায়গা করা— এভাবে নারীদের মনুষ্যত্ব খর্ব করে রাষ্ট্রীয় শিশু-খামারে পরিণত করার ব্যবস্থাপনা হল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে জন্ম নেওয়া ২০ লাখ শিশুর মধ্যে ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৫ লাখ বিবাহ-বহির্ভূত ভাবে জন্ম নিয়েছিল। ১৯৪৫–১৯৫৫ সাল সময়কালে ৮৭ লাখ নবজাতক 'পিতৃপরিচয়হীন' হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৮ অবধি সরকারি পরিসংখ্যানে এ ব্যাপারে একই হার লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৮ সালে নথিভুক্তকরণের পদ্ধতিই পাল্টে দেওয়া হল, যার ফলে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে এ বিষয়ে আর কিছু জানা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই হিসাব সমগ্র ইউ এস এস আর-য়ের, এর একটা বড় অংশই ইউক্রেনের, কারণ ইউক্রেনে অতিরিক্ত তৎপরতার সঙ্গে এই শিশু উৎপাদন পরিকল্পনা লাগু হয়েছিল। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সোভিয়েত পরিবার আইন ও শিশু উৎপাদন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যের সূত্র: মায়ি নাকাচি, পোপুলেশন পলিটিকস

অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন: লেট স্তালিনিজম অ্যান্ড ইটস লিগাসি। এই প্রবন্ধটি ২০০৬ সালে রুটলেজ থেকে প্রকাশিত জুলিয়ান ফুরস্ট সম্পাদিত 'লেট স্তালিনিস্ত রাশিয়া: সোসাইটি বিটুইন রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিইনভেনসন' পুস্তকের ২৩–৪১ পৃষ্ঠায় সংকলিত আছে।)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউক্রেন জুড়ে ইউক্রেনিয় জাতীয়তার স্বাতন্ত্রতা-আকাঙ্খীদের 'গণশত্রু' আখ্যা দিয়ে গুলাগে অন্তরীণ করার সাথে সাথে রুশ ভাষা ও রাষ্ট্র-নির্ধারিত রুশ জাতীয়তাকে নির্বিকল্প রূপে প্রতিষ্ঠা করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও তুঙ্গে উঠল। সরকারি কাজে, সর্বস্তরে শিক্ষায়, দৈনন্দিন ব্যবহারে রুশ ভাষাই একমাত্র রাষ্ট্র-অনুমোদিত ভাষা হয়ে উঠল। পশ্চিম ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমের স্কুলগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল অঞ্চলের মানুষের সমর্থন ও সহায়তায়, কিন্তু তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব ছিল ক্রমবর্ধমান। অপেরা এবং থিয়েটারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ রাষ্ট্রীয় নজরদারি লাগু হল যাতে সেখানে কোনওভাবেই ইউক্রেনের পুরানো ইতিহাস, কসাক গৌরবগাথা বা পুরানো গ্রামীণ গান বা গীতিনাট্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জায়গা করে নিতে না পারে। এসবকেই 'ভুল ও অনুপযুক্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা' হিসেবে চিহ্নিত করা হল এবং সেই 'ভুল' করার জন্য 'অপরাধী'-দের গুলাগে পাঠানো হল। এমনকি ইউক্রেনিয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকারদেরও 'বাহ্যিক আড়ম্বরসর্বস্বতা'-র অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সঙ্গীত পরিবেশনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আক্রমণ নেমে আসল বেশ কিছু ইহুদি থিয়েটার-আলোচকদের উপরও। অভিযোগ করা হল যে তারা বিশ্বজনীনতার নাম করে রুশ জাতীয়তার পরিচয়কে লঘু করতে চাইছে, তাই তাদেরও কেউ গেল গুলাগে, কেউ হল পেশাহীন। ইউক্রেনিয় ইতিহাসকে ফিরে দেখার মতো বিশ্বজনীনতার দৃষ্টিতে পশ্চিমের দিকে তাকানোও রাষ্ট্রের চোখে বিপজ্জনক অপরাধ হয়ে উঠল। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রকাশনা মাধ্যমে ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখাপত্রের প্রকাশনা অসম্ভব হয়ে উঠল। এমনকি তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতার প্রতিলিপি কারও কাছে পাওয়া গেলে তা তার রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত থাকার যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হত। তেমনই, গুলাগে ও তার বাইরে ইউক্রেনিয় প্রতিরোধকারীরা শেভচেঙ্কোর কবিতার পঙক্তির মাঝের সাদা অংশে তাদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদের গূঢ় লিপি ফুটে উঠতে দেখত।

২৩

উৎপাদন-অতিকথা

প্রকৃতি মানে কাঁচামালের ভাণ্ডার। মানুষ মানে শ্রমক্ষমতা সম্পন্ন একটা দেহ যা প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে কাঁচামাল নিষ্কাশন করে উৎপাদন করতে পারে। মগজ? তাও তো একটি পেশি বিশেষ যা উৎপাদনশক্তি বিকাশের প্রকৌশল উৎপাদন করে। আর মানুষ উৎপাদনের ক্ষেত্র হল নারী, নারীর গর্ভ। উৎপাদনের কাজকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিসংখ্যান-সমীক্ষা-সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতায় প্রকৃতি নিঙড়ে কাঁচামাল, মানবদেহ নিঙড়ে শ্রমশক্তি আর নারীগর্ভ নিঙড়ে নবজাতক উৎপাদন করে উৎপাদনশক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন করবে। যত উৎপাদন বাড়বে তা আরও উৎপাদন বাড়ার পূর্ব পরিস্থিতি তৈরি করে দেবে। যত উৎপাদন বাড়বে তা মানবসমাজের বস্তুগত ভিত্তিকে ততই উন্নত করবে। মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তর সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে এ পথেই। এই উৎপাদন-অতিকথার উপর ভিত্তি করা সর্বাত্মকতাবাদী রাষ্ট্রের প্রথম রূপ সোভিয়েত রাষ্ট্র। উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাব মুছে যাওয়ার কথা ছিল, অথচ রাষ্ট্রের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যত উর্ধ্বগামী, যত গাছ কাটা পড়ে, যত খনি ক্ষতের মতো জেগে ওঠে, শ্রমশক্তি নিঙড়ানোর পদ্ধতি যত আরো নির্দয় হয়, ততই দুর্ভিক্ষ ঘুরে ঘুরে আসে, অনাহার বিস্তৃত হয়, শহরে রুটির লাইন হয়ে ওঠে আরও দীর্ঘ, গ্রাম পরিণত হয় মৃত্যু-উপত্যকায়। কথা ছিল শ্রমিকরা নিজেদের মুক্তি নিজেরা নিয়ে আসবে, অথচ বন্দিশিবিরের সংখ্যা বাড়ে, সেই শিবিরে বন্দিদের বদ্ধ শ্রমিক হিসেবে খাটানো হয়, বন্দিশিবিরের বাইরের শ্রমিকরাও উৎপাদনক্ষেত্রে পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার অর্জিত অধিকারগুলো হারিয়ে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত হয়। কথা ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি মানুষের বস্তুগত অভাব মিটিয়ে দিলে প্রতিটি মানুষের সামনে ব্যক্তি হিসাবে আত্মবিকাশের অসীম প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে যাবে, অথচ সর্বাত্মকতাবাদী শাসন

মানবিক সমাজচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকে প্রথমে শৃঙ্খলিত ও ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। কথা ছিল প্রতিটি জনজাতি স্বাধীন বিকাশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে, অথচ রুশ জাতি-আধিপত্য হাতিয়ার করে রাষ্ট্র ক্রমশ অন্য সমস্ত জাতির ভাষা-সংস্কৃতির পরম্পরা ও ইতিহাসকে মুছে ফেলে জাতিসমূহের কারাগার পত্তন করে।

উৎপাদন-অতিকথা পঙ্গু করে তুলল জীবনের প্রতিটি অঙ্গকে। উৎপাদকদের শ্রমসময় কমিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও নান্দনিক চর্চার সময় উন্মুক্ত করা আর আদর্শ রইল না, শিক্ষাব্যবস্থা-সংবাদপত্র-গল্প-উপন্যাস প্রচার করতে লাগল যে বিরামহীনভাবে প্রায় সর্বসময়কে শ্রমসময় করে আরো বেশি বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া অতি উচ্চ উৎপাদন কোটাকেও ছাপিয়ে যাওয়া হল যথার্থ নায়কোচিত কীর্তি, মানব-সক্ষমতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ। কোন খনিশ্রমিক মাসের উৎপাদন কোটা দিনে পূরণ করেছেন, কোন ইস্পাত কারখানার শ্রমিক উৎপাদন কোটার কয়েকগুণ পূরণ করেছেন, তাদেরকেই 'সমাজের নায়ক' করে প্রচার চলল, বাকিদের তাদের অনুকরণ-অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক করা হল, এবং তা না করলে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বখেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তিরও বন্দোবস্ত হল। এরপর রাষ্ট্র নারীগর্ভের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপায় করতে বসল। বারবার গর্ভধারণে বাধ্য হওয়া একজন নারীর কাছ থেকে নিজ শরীর ও নিজ জীবনের উপর সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়, সেই যন্ত্রণাকে 'মাতৃত্ব গৌরব' উপাধির মোড়কে মুড়ে হাজির করা যেমন চরম পুরুষপ্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাবের পরিচয়, তেমনই তা দেখায় যে উৎপাদন-অতিকথা আর রাষ্ট্রের ভিত্তি মাত্র নেই, তা প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের আগাপাশতলা হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বপরিচয় নির্মাণের মূল কথা ছিল যে তা পুঁজিবাদী সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিনাশ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ার পরিচালক। কিন্তু তার উৎপাদন-অতিকথা পুঁজিবাদী সমাজ-অর্থনীতির উৎপাদন-অতিকথা থেকে আলাদা নয় তো। বস্তুগত উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যাওয়ার যে প্রবণতা পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যে প্রবণতার তাড়নায় উৎপাদিত বস্তু ক্রমশ ভোগ-ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে আরও বৃদ্ধির বীজাণু স্বরূপ পুঁজি রূপে পুঞ্জীভূত হতে থাকে, প্রকৃতি ও মানুষের অবক্ষয় ডেকে আনে, সোভিয়েত রাষ্ট্রও সে পথেই এগিয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নতুনত্ব এখানে যে তা উৎপাদন-অতিকথার উপর দাঁড়ানো রাষ্ট্রকে 'বিপ্লব ও

প্রগতি'-র মতবাদিক কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে এক সর্বাত্মকতাবাদী রূপ দিয়েছে। এই সর্বাত্মকতাবাদ ভিন্নতর সমস্ত কিছুকে নিকৃষ্ট, প্রতিক্রিয়াশীল, সুতরাং দমনীয় হিসেবে হাজির করে জীবনবিরোধী সমসত্বতা আরোপ করার প্রক্রিয়ায় মতবাদে বাঁধা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নয়া কার্যকারিতা সামনে নিয়ে এসেছে। জনসমাজের একটার পর একটা অংশকে 'শত্রু' বা 'সন্দেহভাজন' হিসেবে হাজির করার ক্রমবর্ধমান চক্রে নিরাপত্তাহীনতা-অবিশ্বাস-সন্দেহের চাপে মানুষ ক্রমশ সামাজিক সমস্ত মেলামেশা-বিনিময়ের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আপন কুঠুরিতে বন্দি হয়েছে, আর নজরদারি জাল বিছিয়ে নিপীড়ক রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে সর্বত্রস্থিত। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অধীনে ক্ষমতার এহেন কেন্দ্রীভবন ও জনসমাজের নিজস্ব সক্রিয়তার ক্ষেত্রগুলোকে এভাবে ভেঙে দেওয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৌলিক কীর্তি। বিভিন্ন অ-রুশ জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জীবনাচার চরম আক্রমণের মুখে তাই বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইউক্রেনের স্তালিনযুগের অভিজ্ঞতাকে আমরা বোধ হয় এভাবে সারসংকলন করতে পারি।

২৪

স্তালিনের মৃত্যু, অতঃপর

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যু হল। মৃত্যুর সময়েও সন্দেহ-অবিশ্বাসের ঘূর্ণিপাক শ্লথ হয়নি। গোপনে বিষ প্রয়োগ করে স্তালিনকে হত্যা করার চক্রান্ত হচ্ছে, এই ভ্রম-বাতুল অভিযোগে একদল ডাক্তারকে, যাদের মধ্যে প্রায় সবাই ইহুদি, কাঠগড়ায় তোলা হয়। এর মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে ইহুদিদের উপর আলাদাভাবে সন্ত্রাসও আরও তীব্র হতে থাকে স্তালিনের মৃত্যু অবধি।

স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষে ক্ষমতায় আরোহণের লক্ষ্যে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি সংঘর্ষ চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায়। সেই সংঘর্ষে জয়ী হন ইউক্রেন-শাখার কম্যুনিস্ট নেতা ক্রুশ্চেভ ও তাঁর গোষ্ঠী। যে ক্রুশ্চেভ ১৯৩৭ সালে স্তালিনের বিশ্বস্ততম অনুচর হিসেবে ইউক্রেনের পার্টি, সরকার ও সমাজ থেকে ইউক্রেনিয়করণের ভূত তাড়াতে লাগামহীন সন্ত্রাস নামানোর প্রধান ওঝা হিসেবে কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নারীগর্ভের উপর রাষ্ট্রীয় দখল কায়েম করে নারীদের রাষ্ট্রীয় সন্তান-খামারে পরিণত করায় যিনি ছিলেন স্তালিনের প্রধান পরামর্শদাতা, সেই নিকিতা ক্রুশ্চেভই ১৯৫৬ সালে স্তালিনের সমালোচনা করে নিস্তালিনীকরণের স্লোগান হাজির করলেন। ১৯৫৬ সালে পার্টি-নেতাদের এক গোপন বৈঠকে তিনি স্তালিনকে প্রচুর পার্টিকর্মী ও নেতাদের খুন করার, মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বা গুলাগে অন্তরীণ করে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। অভিযোগ করলেন যে এই সন্ত্রাসী শাসন কায়েম রাখার জন্য স্তালিন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অন্ধ ভক্তির ('পারসোনালিটি কাল্ট') সংস্কৃতিতে পার্টি-প্রশাসন-সমাজকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। এই ব্যক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা হল। গুলাগ থেকে বহুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল নির্দোষ ঘোষণা করে। গুলাগেই যারা প্রাণ হারিয়েছেন, এমন

বহুজনের পরিবারের হাতে তাঁদের নির্দোষিতার সরকারি শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে ইউক্রেনিয়করণে অভিযুক্ত হয়ে বন্দি হওয়া, মারা যাওয়া কিছুজনও এমন শংসাপত্র পেলেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভের এই 'গোপন ভাষণ' ও তার পরবর্তী নিস্তালিনীকরণে কয়েকটি বিষয় অনুপস্থিতই থাকল। অনুপস্থিত থাকল ইউক্রেনে ১৯৩৩ সালে রাষ্ট্রের তৈরি অনাহার-মহামারীর মাধ্যমে গণহত্যার কোনও উল্লেখ— যেন তা কখনও ঘটেই নি এই ভান বজায় থাকল। অনুপস্থিত থাকল ১৯৪৬ সালে দুর্ভিক্ষের মুখে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষদের খাওয়ার যোগানের কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে পুনর্বার কয়েক লাখ মানুষকে হত্যা করা— যেন তাও কখনও ঘটেনি। অনুচ্চারিত রইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নারীদের নিজদেহের উপর অধিকার, গর্ভধারণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া উর্বরতা বৃদ্ধির অমানবিক আইনের প্রসঙ্গ— কারণ তা বহাল তবিয়তে বজায় থাকল। 'শত্রুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন' সন্দেহে গোটা জনজাতির মানুষকে ভিটেমাটি উপড়ে স্থানান্তরকরণের সমালোচনা করা হল, কিন্তু তাতাররা ক্রিমিয়ায় ফেরার অনুমতি পেলনা। স্তালিনিয় সন্ত্রাসের রূপায়ন ও বাস্তবায়নে নিজের অগ্রগণ্য ভূমিকার কোনও আত্মসমালোচনাও ক্রুশ্চেভ করলেন না, যেনবা সেসব কথা এখন আর তাঁর মনেই নেই। বাস্তবত, সন্ত্রাস রূপায়ন ও বাস্তবায়নে পার্টি, পার্টির বিভিন্ন গণসংগঠন ও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে ভূমিকা নিয়েছিল, আলোচনা সেদিকেও গড়াল না, কেবল 'ব্যক্তিত্বের প্রতি অন্ধ ভক্তির' গর্তে পড়ার ও সেসম্পর্কে এখন থেকে সাবধান থাকার একটা ধোঁয়াশা তৈরি করা হল। সেই ধোঁয়াশার আড়ালে সমাজজুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঞ্চলনের যে কাঠামোগুলো তৈরি হয়েছিল তা কমবেশি অক্ষত থাকল।

সুতরাং ক্রুশ্চেভের সমালোচনা-অবতারণার উদ্দেশ্য আমূল কোনও বদল ঘটানো নয়, তা বোঝা যায়। তাহলে এই সমালোচনা-অবতারণা কেন? স্তালিনের ছায়া সরিয়ে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য? নাকি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরেরও একটা চাহিদা ছিল? বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন জনজাতি, এমনকি প্রশাসনকাঠামো ও পার্টির বিভিন্ন স্তরে থাকা মানুষদের ভ্রম-বাতুল নজরে সর্বক্ষণ নজরবন্দি রাখার প্রক্রিয়া কি হাঁফ ছাড়ার অবকাশ চাইছিল? ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষত কি প্রলেপ চাইছিল ?

ক্রুশ্চেভ তাঁর নব-মনোনীত পার্ষদবর্গের মধ্যে ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেশকিছু আধিকারিককে মস্কোতে তুলে এনে কাজ শুরু করলেন।

ক্ষমতার টানাপোড়েনে ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর সমর্থনকে নিজের পিছনে রাখার জন্য নানা উপায় করলেন। ১৯৩৭ সালে যাঁর হাতে ইউক্রেনিয় জাতির সদস্যরা কম্যুনিস্ট পার্টির সমস্ত দায়িত্বশীল পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন, ১৯৫৬ সালের পর সেই ক্রুশ্চেভের তাগিদেই বেশকিছু ইউক্রেনিয় জাতির সদস্য কম্যুনিস্ট পার্টির উপরের পদে উঠে এলেন। মস্কোর নিয়ন্ত্রণকে কিছুটা আলগা করে ইউক্রেনের পার্টি-প্রশাসনের হাতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করা হল। ইউক্রেনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ইউক্রেনের সরকার-প্রশাসনকে আগের থেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হল।

জনসাধারণের জীবনযাপনের মানের ক্রমাবনতি এবং গ্রামগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা যে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে, ক্রুশ্চেভ সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ইউক্রেনের কৃষিখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বাড়ালেন, খাদ্যের যোগানও বাড়ালেন। শহরে নতুন আবাসন তৈরির মাধ্যমে ভয়ঙ্কর আবাসন সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেন।

নির্দোষিতার রাষ্ট্রীয় শংসাপত্র নিয়ে গুলাগ থেকে বেশ কয়েকজন ইউক্রেনিয় জাতীয়তাপন্থী ফিরে আসার পর, প্রাণ হারানো বা নিষিদ্ধ বহু ইউক্রেনিয় ভাষার লেখক-গবেষক-শিক্ষাবিদদের লেখাপত্র-ভাবনা নিয়ে আবার সর্বসমক্ষে কথাবার্তা আইনি হওয়ার পর, ইউক্রেনিয় ভাষাকে ইউক্রেনিয়ার সরকারের অন্যতম ভাষা করার দাবি আবারও, পা মেপে হলেও, উঠতে শুরু করল। ১৯৫৯ সালে নতুন আইন করা হল যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ভাষামাধ্যম বেছে নিতে পারবেন। এর ফলে পশ্চিম ইউক্রেনে ইউক্রেন ভাষামাধ্যমে পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক বাড়ল। পশ্চিম ইউক্রেনে ইউক্রেনিয় ভাষা মাধ্যমের স্কুল সংখ্যায় বাড়তে লাগল। কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ইউক্রেনিয় ভাষার ক্ষেত্র এতটাই সংকুচিত হয়ে গিয়েছে যে রুশ ভাষার প্রচলন সেখানে প্রায় সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। রুশ জাতির মানুষদের ক্রমবর্ধমান অভিবাসন, গ্রামীণ ইউক্রেনের ধ্বংস এবং শহরে ইউক্রেনিয় থেকে রুশে ভাষা-সরণ এর কারণ।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরির ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের সময় নাজি দখল হঠিয়ে লাল ফৌজ হাঙ্গেরির দখল নেয় এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের বশংবদ একটি সরকার হাঙ্গেরির উপর চাপিয়ে দেয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুকরণে-অনুসরণে-পৃষ্ঠপোষণায় চলা এই সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সালে সশস্ত্র গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে। ক্রুশ্চেভ সরাসরি

সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ও লালফৌজের বাহিনী পাঠিয়ে নৃশংসভাবে সে বিদ্রোহ দমন করে সোভিয়েত বশংবদ সরকারকে রক্ষা করেন, হাঙ্গেরির গলায় সোভিয়েত আধিপত্যের ফাঁস আরও চেপে বসে। কম্যুনিস্ট প্রচারমাধ্যমে প্রচার করা হয় যে মার্কিনীরা হাঙ্গেরির 'বিপ্লবী' সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল, সে চক্রান্ত ব্যর্থ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হওয়া আধিপত্য-বলয়কে অটুট রাখতে সোভিয়েত রাষ্ট্র যে কতটা দাঁত-নখ বের করতে প্রস্তুত তার প্রমাণ যেমন পাওয়া গেল, রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে কোনও বিদ্রোহকে মার্কিনী (বা পশ্চিমী দেশগুলোর) মদতপুষ্ট চক্রান্ত বলে ষড়যন্ত্র-আতঙ্কের আবহাওয়াও নতুনভাবে জোরদার করা হল। এর মধ্যেই চলছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের মাথায় ক্ষমতাদখলের দড়ি-টানাটানি। ১৯৫৭ সালেই ক্রুশ্চেভকে অপসারণের একটা প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভ-বিরোধীদের প্রয়াস সফল হল। ক্রুশ্চেভ ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন লিওনিদ ব্রেজনেভ।

ক্রুশ্চেভের মতো ব্রেজনেভও একজন ইউক্রেনে জন্মগ্রহণকারী রুশ জাতিপরিচয়ের মানুষ, কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়ে যাঁর ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ঘটেছে ইউক্রেনে পার্টিকর্ম করার মধ্য দিয়েই। ব্রেজনেভের অভিষেকের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের প্রবণতা আবারও তীব্র হল। ক্ষমতাশীর্ষে অধিষ্ঠান বজায় রাখার জন্য সমর্থনভিত্তি হিসেবে ব্রেজনেভ ইউক্রেনে গড়ে তুলেছিলেন পার্টি-আমলাদের এক বিস্তৃত জাল। খনি, কারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার, সরবরাহ-রপ্তানি সমস্তক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান হতে হত এদের হাত ঘুরে। সুতরাং এদের হাতে যেমন কারও ক্ষতি করার আবার কাউকে দাক্ষিণ্য করার ক্ষমতা ছিল, তেমনই এদের হাতে এসে জমা হত সোজা-বাঁকা বিভিন্ন পথে সমাবেশিত প্রভূত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ। পূর্ব ইউক্রেনের নিপরোপেত্রোভস্ক অঞ্চল মূলত এদের খাস তালুক হওয়ায় লোকমুখে এদের নাম হয়ে উঠেছিল 'নিপরোপেত্রোভস্ক মাফিয়া'। ব্রেজনেভের ক্ষমতার স্তম্ভ ছিল এরাই। বহির্বিশ্বের সমস্ত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও তার অংশ দেশের মধ্যের শত্রুদের কড়া হাতে দমন করে রাষ্ট্রের সুস্থিতি ছিল ব্রেজনেভ-শাসনের মন্ত্র। এই অতি-কেন্দ্রিকতার টান ভাষিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হল। 'রুশ বিপ্লবের ভাষা, মহান নেতা লেনিনের ভাষা' হিসেবে রুশ ভাষাকে গরিমান্বিত করে তাকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের আধিপত্য-বলয়ের সর্বত্র ক্ষমতার ভাষা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বাধ্যতা আরও জোরালো করা হল। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত

প্রকাশনামাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে রুশ ভাষার একাধিপত্যও আরও জোরালো হল। রাষ্ট্রীয় নজরদারি এড়িয়ে পশ্চিম ইউক্রেনে সংগঠিত আন্ডারগ্রাউন্ড প্রকাশনা ক্ষেত্রই ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির স্বাধিকার চর্চার পরিসরটাকে বাঁচিয়ে রাখল। (এই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রকাশনা ক্ষেত্রের বিভিন্ন লেখা ও আলোচনা সংগৃহীত আছে এই বৈদ্যুতিন ভাণ্ডারে: Open Society Archives, http://www.osa.ceu.hu/db/fa/300.htm.)

ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির স্বাধিকারের দাবি কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতা-অধিষ্ঠানের টানাপোড়েনে তৈরি ফাটলেও আত্মপ্রকাশ করল ব্রেজনেভ ও পেত্রো সেলেস্ত-য়ের বিরোধের মধ্য দিয়ে। পেত্রো সেলেস্ত একজন ইউক্রেনিয় জাতিপরিচয়ের মানুষ, ইউক্রেনের সোভিয়েত শিল্প-কারখানার ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উঠে আসেন। তখন ক্রুশ্চেভের অপসারণ সমর্থন করে ব্রেজনেভের পক্ষ নিলেও ক্রমশ ব্রেজনেভের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাড়তে থাকে যখন তিনি ভাষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইউক্রেনিয়ার জন্য স্বাধিকারের কথা বলতে শুরু করেন। সেলেস্ত অভিযোগ তোলেন, যে পরিমাণে ইউক্রেন থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র কাঁচামাল (কয়লা ও ধাতু) নিষ্কাশন করে নেয়, তার অনুপাতে ইউক্রেনের শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে অনেক কম। এমনকি ইউক্রেনের কয়লা ও ধাতু শিল্প থেকেও পুঁজি তুলে নিয়ে সাইবেরিয়ায় তেল ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে তাঁর দাবি ছিল ইউক্রেনিয়ায় শিল্পবিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সোভিয়েত অর্থদপ্তরকে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কিন্তু ক্রমে, এই দাবি অপূর্ণ থাকার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাপিয়ে আরও বিস্তার লাভ করে। সেলেস্ত কথোপকথনে তাঁর মাতৃভাষা ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করা লাগু রেখেছিলেন, জনসমক্ষে ভাষণে তিনি ইউক্রেনিয় ভাষার ঐশ্বর্যের ও ঐতিহ্যের কথা বলতে শুরু করেন। ইউক্রেনিয় ভাষা-জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কথা বলা অকুতোভয় ইউক্রেনিয় শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানচর্চাকারীদের গ্রেফতার করার ব্রেজনেভের নির্দেশ কার্যকর করতে তিনি অস্বীকার করেন। বরং স্লোগান হাজির করেন যে, 'সোভিয়েত ইউক্রেন মানে পূর্ণবিকশিত অর্থনীতি এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ শক্তিশালী ইউক্রেন'। ব্রেজনেভ ক্রমশ অন্তঃপার্টি ক্ষমতার ঘুঁটি সাজিয়ে সেলেস্তকে একঘরে করে তোলেন এবং ১৯৭২ সালে সেলেস্ত-য়ের পার্টি-পদ কেড়ে নেওয়া হয়, ১৯৭৩ সালে বাধ্য করা হয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সরিয়ে

নেওয়ার জন্য। সোভিয়েত প্রচারমাধ্যমে সেলেস্ত-কে কেন্দ্র করে ডাইনি-বিচার ও ডাইনি-পোড়ানো যজ্ঞ পালন হয়। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে 'ইউক্রেনিয় অতীতকে আদর্শায়িত করা ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিতে ইন্ধন যোগানো'-র মতো 'বিপজ্জনক ভুল' সেলেস্ত করেছেন!

সেলেস্তকে পার্টি-রাষ্ট্রের সাংগঠনিক চক্রব্যূহে ঘিরে নিষ্ক্রিয় করলেও ইউক্রেনিয় ভাষা-জাতীয়তার স্বাধিকারের দাবিতে জেগে ওঠা সমস্ত কণ্ঠকে স্তব্ধ করা গেল না। বরং রুশ ভাষা-জাতীয়তার আধিপত্যকামীতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কম্যুনিস্ট মহলের মধ্যেই একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। আইভান দ্রাখ, লিনা কোস্টেঙ্কো, দিমিত্রো পাভলিচকো-র মতো কবি; ভোলোদিমিন দ্রোজদ, ভালেরি স্লেভচুক-য়ের মতো গদ্যলেখক; লেস তানিয়ুক-য়ের মতো নাট্যনির্দেশক; আইভান জিউবা-র মতো সাহিত্য-সমালোচকরা প্রকাশনা মাধ্যমের উপর পার্টি-নিয়ন্ত্রণ কমানো, শিল্পপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ইউক্রেনিয় সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি সম্মান প্রকাশ্যে দাবি করতে লাগলেন। এঁরা পরিচিত হয়ে উঠলেন 'শিস্তদেসিয়াতনিকি' গোষ্ঠীনামে। 'শিস্তদেসিয়াতনিকি' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'ষাটের প্রজন্ম'। ১৯৬০ দশকের ইউক্রেনিয় নব প্রজন্মের শিল্পীদের মেজাজ-মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁরা। সাহিত্য-সমালোচক আইভান জিউবা ১৯৬৫ সালে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার শিরোনাম: 'আন্তর্জাতিকতাবাদ নাকি রুশিকরণ?' এই প্রবন্ধটি তিনি পাণ্ডুলিপি আকারে ১৯৬৫ সালেই ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হিসেবে সেলেস্তের কাছে জমা দেন প্রকাশনার ছাড়পত্রের জন্য। রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ব্যবস্থায় প্রকাশের ছাড়পত্র তা পায়নি। কিন্তু আণ্ডারগ্রাউন্ড প্রকাশনা ব্যবস্থায় (ইউক্রেনিয় ভাষায় 'সামভিদাভ' প্রকাশনা, রুশ ভাষায় 'সামিজদাত' প্রকাশনা) প্রকাশিত হয়ে ও বিভিন্ন জনের হাতে-লেখা প্রতিলিপি রূপে তা হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউক্রেনিয় বিক্ষুব্ধ লেখালেখির সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হয়ে ওঠে। এই লেখায় আইভান জিউবা লেখেন: লেনিন জাতিসমস্যা সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের সময় বলেছিলেন যে প্রতিটি জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে, অথচ কার্যক্ষেত্রে জার আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিটা অ-রুশ জাতির রুশীকরণ করে তাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার আগ্রাসন চালানো হচ্ছে; আন্তর্জাতিকতা একটি অর্থহীন শব্দবন্ধে পরিণত হয়েছে আর রুশ আধিপত্যবাদই আরও প্রসারিত হচ্ছে। জিউবা অবশ্য এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন যে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার উৎপাটন দাবি করেননি, তার সংস্কার দাবি

করেছিলেন। এই সতর্কতার কথা উল্লেখ করেই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন যখন সোভিয়েত রাষ্ট্র তাঁকে ১৯৭২ সালে বন্দি করে। কিন্তু কেবল তাই-ই যথেষ্ট হয়নি। জিউবাকে বাধ্য করা হয় তাঁর সমস্ত সমালোচনা ভুল স্বীকার করে তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করছেন। তাঁর সই করা এই বিবৃতি সোভিয়েত গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়, তারপর কারাগারের থেকে জিউবাকে ছাড়া হয়। এমন সৌভাগ্য অবশ্য সবার হয়নি। সামভিদাভ-য়ের অন্য বহু লেখককে বন্দি করে সোভিয়েত রাষ্ট্র কাঠগড়ায় তুলেছিল, কারাগারে অন্তরীণ করেছিল। তারপর গুপ্তপুলিশ তাদের হত্যা করেছে, তাঁরা 'নিখোঁজ' হয়ে গেছেন। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় এসে সোভিয়েত লেখ্যাগারে সংরক্ষিত গুপ্তপুলিশের নথি থেকেই জানা যায় যে সেই সময় সোভিয়েত কারাগারে অন্তরীণ রাজনৈতিক বন্দিদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হল ইউক্রেনিয়রা। এমন বন্দিদের 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়া আটকাতে, সাজানো অপরাধের আরোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার লড়াই করতে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াইয়ের আন্দোলন গড়ে ওঠে। সাংবাদিক ভিয়াচেস্লাভ চোরনোভিল সেই আন্দোলনের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।

রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা মাধ্যমের লেখকদের লেখাতেও ইউক্রেনিয় স্বাতন্ত্র্যবোধের ছাপ পড়তে থাকে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ১৯৬০ দশকের বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রধান গির্জা' (দি ক্যাথিড্রাল)। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের লেখক ওলেস হোনচার ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্র অনুমোদিত ইউক্রেনিয়ার লেখকসঙ্ঘের 'চেয়ারম্যান' হিসেবে কাজ করা এক বর্ষীয়ান ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটির পটভূমি পূর্ব ইউক্রেনের একটি আধা-শহর। বহু পুরানো একটি কসাকদের গির্জা সেই আধা-শহরের পুরানো দিনের স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে। আধুনিক নগরোন্নয়নের প্রকল্পকরা সেই গির্জা ভেঙে আধুনিক নির্মাণের পরিকল্পনা করলে সেখানকার বাসিন্দারা সেই গির্জাটিকে রক্ষা করতে নানাভাবে নানারকম উদ্যোগ নিতে শুরু করে। সেসব নিয়েই এই উপন্যাস। প্রত্যক্ষভাবেই এখানে ইউক্রেনিয়ার পুরানো ইতিহাসকে রক্ষা করার পক্ষে কথা বলা হয়েছে। কম্যুনিস্টদের দপ্তরি প্রথায় যেখানে ইউক্রেনিয়ার পুরানো ইতিহাসকে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের বানানো কথা হিসেবে বর্জ্য হিসেবে দেখাই দস্তুর, সেখানে এই উপন্যাসে তাকে দেখা হয়েছে লোকমানসের স্মৃতিতে-প্রজ্ঞায় ভাস্বর পরম্পরার সোনালি তন্তু হিসেবে, গোষ্ঠী-অস্তিত্বের প্রাণরস-সরবরাহকারী শিকড় হিসেবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্রুতই বইটিকে

নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। তাতে যেন বইটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারি প্রকাশনা থেকে সরে সামভিদাভ যোগাযোগজালের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহু পাঠকের মধ্যে।

ইতিহাসবিদ ভালেনতিন মোরোজ এবং সাংবাদিক স্তেপান ক্ষমেরা-র মতো কেউ কেউ ছিলেন আরও স্পষ্টবক্তা। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক অবদমনমূলক চরিত্রের সমালোচনা করে তাঁরা স্পষ্টভাবে সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন। ইউক্রেনিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি ও লোকসমাজের যে ভয়ংকর ধ্বংসসাধন সোভিয়েত রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই করেছে তার উল্লেখ করে তাঁরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন ইউক্রেন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

১৯৭০ দশকের শেষদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে 'হেলসিঙ্কি বোঝাপড়া'-য় সই করে। সেই বোঝাপড়ার অন্যতম প্রস্তাব ছিল নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দিতে নির্বাধ আত্মপ্রকাশের সমস্ত অধিকার সহ সব মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি। ইউক্রেনে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন এর ফলে আরও দানা বেঁধে ওঠে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাতে থাকে যাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি মতো সত্যি সত্যিই অধিকারহরণের কিসসা এবার শেষ হয়। 'ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি গোষ্ঠীদল' নামে পরিচিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে যোগসাজস-সহযোগিতা রক্ষা করে কাজ করতে থাকে। মিকোলা রুদেঙ্কো ছিলেন এই হেলসিঙ্কি গোষ্ঠীদলের অন্যতম প্রধান সংগঠক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনা হিসেবে রুদেঙ্কো রাষ্ট্রীয় পদক ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তারপর ক্রমশ সোভিয়েত ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিকতার সমালোচক হয়ে ওঠেন।

১৯৭৮ সালে পূর্ব ইউক্রেনের কিছু শ্রমিক-সংগঠক রাষ্ট্রীয় শ্রমিকসঙ্ঘের বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হননি, রাষ্ট্র তৎপরভাবে তাঁদের দমন করেছিল।

সোভিয়েত সার্বিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লোকজীবনে প্রতিরোধের পরিসর ধর্মীয় চেহারা নিয়েও গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম ইউক্রেনে গ্রিক ক্যাথলিক গির্জার বিভিন্ন গুপ্ত উপাসকগোষ্ঠী ছিল তার একটি উদাহরণ। তবে তার চেয়েও কৌতুহলপ্রদ হল পূর্ব ইউক্রেনে জন্ম নিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এক পুনরাবর্তনমূলক প্রবণতা। প্রাচীন কিয়েভিয় রুস-য়ে ভোলোদিমিরের আমলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তনের আগে থেকে লোকসমাজে প্রচলিত ধর্মে সূর্যদেবতা

'দাঝবোহ'-কে উপাসনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই রীতি কেন্দ্র করে বহুশ্বরবাদী এক বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রের তৈরি অনাহার-দুর্ভিক্ষে পূর্ব ইউক্রেন যখন শ্মশানভূমি, তখন ভোলোদিমির শাইয়ান নামক একজন ইউক্রেনিয় জাতিপরিচয়ের মানুষ, বৃত্তিতে অধ্যাপক, এই ভাবনার সূচনা করেন। সেই সূচনাতেই সম্পৃক্ত ছিল ইউক্রেনিয় জাতি-পরিচয়ের জীবন-অভিজ্ঞতাগত ভিত্তির পুনরাবিষ্কারের আকাঙ্খা। তাই খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রবর্তনেরও আগে ফিরে গিয়ে ইউক্রেনিয় স্বতন্ত্রতার শিকড়টিকে খুঁড়ে বের করার চেষ্টা। বিভিন্ন প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান পুনরাবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে পরম্পরা-সচেতন এক যৌথজীবন নির্মাণও ছিল এর উদ্দেশ্য। আধুনিকতা-প্রগতির খরদহনে সমস্ত আশাকে শুকিয়ে মরতে দেখা মানুষ যে সজল ছায়া খোঁজে তা বুঝি এর করতলে আছে। শুরুতে খুব কম লোকই এর চর্চায় সামিল হলেও, ধীরে ধীরে আকৃষ্টের সংখ্যা বাড়তে থাকে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠানেও এর প্রভাবে খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রবর্তনের আগের কালের নানা প্রাচীন রীতি ও প্রভাব যেন লোকস্মৃতির গভীর থেকে উঠে এসে জায়গা করে নিতে থাকে, প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে জীবনে-জীবনে বন্ধনের কিছু টানাপোড়েন বোনা হতে থাকে। গ্রামে এর প্রভাব ছড়ায় বেশি। পৃথক একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেক জাহির না করেও অন্তর্লীন ধর্মভাবনা হিসেবে তা ছেয়ে বসতে থাকে, নিজ ভাষা-জাতীয়তা-সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে থাকে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে পালাবদল ঘটল। মিখাইল গোর্বাচেভ শীর্ষনেতা হলেন। লিওনিদ ব্রেজনেভের আমলকে 'নিশ্চলতার সময়' আখ্যা দিয়ে সোভিয়েত দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে গতি আনার জন্য আশু সংস্কার প্রয়োজনীয় বলে তিনি ঘোষণা করলেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে তিনি তিনটি বড়সড় সংস্কার কর্মসূচী শুরু করলেন:

- গ্লাসনস্ত (উন্মুক্ততা): গণমাধ্যমের উপর নজরদারি বা সেনশরশিপ কমানো, বিভিন্ন নতুন ধারণার খোলামেলা আলোচনা উৎসাহিত করা;
- পেরেসত্রোইকা (অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস): রাষ্ট্রের উপরের মহলের কেন্দ্রীয় পরিকল্পকদের ক্ষমতা কিছুটা কাটছাঁট করে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্তরে থাকা ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনার কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া;

- ডেমোক্রাটিজাতসিয়া (গণতান্ত্রিকিকরণ): বিভিন্ন পদে উপর থেকে মনোনয়নের বদলে একাধিক মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন।

এই সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধ্য দিয়ে গোর্বাচেভ সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোটিকে টিকিয়ে রেখেই তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধাপগুলোয় দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-রক্ষণশীলতার যে ঘুঘুর বাসা জমাট বেঁধেছিল, তাকে বিস্রস্ত করার জন্য এই সংস্কারগুলোর মধ্য দিয়ে তাজা নতুন উদ্যোগ জাগিয়ে তোলা যাবে, এমনটাই গোর্বাচেভ ভেবেছিলেন। কিন্তু গোর্বাচেভের অভিপ্রায় বা গোর্বাচেভের বেঁধে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে সংস্কার আটকে থাকেনি। গ্লাসনস্ত-য়ের সূত্র ধরে স্বয়ং গোর্বাচেভ ও সামগ্রিক কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার সমালোচনা এবং কম্যুনিজমের অবসানের দাবি প্রকাশ্যে দানা বাঁধতে থাকে। পেরেসত্রোইকা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রোথিত বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতকে উসকে দিয়ে পরিস্থিতি আরও বেসামাল করে তোলে। তবে সবচেয়ে বেসামাল পরিস্থিতির তৈরি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত জবরদখলে আনা অঞ্চলগুলোয়।

এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাতভিয়া— একযোগে এই তিনটি দেশকে বাল্টিক দেশসমূহ বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মানচিত্রে উঠে এসেছিল। হিটলার-স্তালিন বোঝাপড়ার কুখ্যাত মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৪০ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্র এদের দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর সেই দখলদারি আরও পাকাপোক্ত হয়। রুশ জনজাতি পরিচয়ের বহু মানুষকে এখানে অভিবাসন করানো হয়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমস্ত ধাপগুলোয় রুশ কম্যুনিস্ট পার্টি বা গুপ্ত পুলিশের সদস্যদের বসানো হয়, দেশগুলোর নিজস্ব ভাষাকে অস্বীকার করে রুশ ভাষাকেই কাজেকর্মে-প্রশাসনে-বিদ্যালয়ে একমাত্র ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ফরমান জারি হয়। গোর্বাচেভের গ্লাসনস্ত ঘোষণার পরেই বাল্টিক দেশগুলো সোভিয়েত দখলদারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। তিনটি দেশেই আওয়াজ ওঠে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বেআইনি দখলদারি চাপিয়ে কারাগারবন্দি করে রেখেছে বাল্টিক জনজাতিদের, ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে রুশ ভাষা ও কম্যুনিজম চাপিয়ে দিতে চাইছে। গ্লাসনস্তের খোলা হাওয়ায় কেবল অভিযোগ জানিয়েই তাদের মন জুড়ানোর নয়, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ধাপে ধাপে গড়ে উঠল দ্রুত। প্রথম ধাপে ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যেই সার্বভৌম অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতির দাবি, ক্রমশ তা সোভিয়েত রাষ্ট্রের থেকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের

দাবিতে পরিণত হয়। পেরেসত্রোইকার স্লোগানও তাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তাদের ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদ সোভিয়েত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পরিকল্পকদের সম্পত্তি নয়, তা সেই দেশের জনজাতির সম্পত্তি, এই স্লোগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদেরও এখন এই ডেমোক্রাটিজাতসিয়ার প্রচলনের পর ক্ষমতার পদ ধরে রাখার জন্য কিছুটা হলেও অধস্তনদের ভোটের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল, ফলে তারা সেইদিকে তাকিয়েই বাল্টিকদের জাতীয় স্বাধিকারের আকাঙ্খার সর্বাত্মক বিরোধিতা ও দমনের পথে হাঁটতে পারছিল না।

বাল্টিক দেশগুলোয় জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলন গড়ে ওঠা সোভিয়েত দেশের অন্যান্য নিপীড়িত অ-রুশ জাতিগুলোর মধ্যেও আলোড়ন তুলল, নিজ নিজ জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলন নতুনভাবে শুরু করার প্রেরণা যোগাল। এই প্রভাব বিশেষভাবে দেখা গেল ইউক্রেনিয়ায়, ইউক্রেনিয় জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে। এই পুনরুজ্জীবনে অবশ্য আকস্মিক একটি দুর্ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল: চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা।

২৫

ভয়ংকর চেরনোবিল

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে উত্তর-পশ্চিম বরাবর ১৪৬ কিলোমিটার দূরে চেরনোবিল। কাছেই বেলারুশ-ইউক্রেন সীমান্ত। এখানেই সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে বসিয়েছিল পরমাণু চুল্লি। প্রথম চুল্লিটি বসানো হয় ১৯৭০ সালে, চতুর্থটি বসানো শেষ হয় ১৯৮৩ সালে। ১৯৭৯-১৯৮০ সালেই পৃথিবী দেখেছিল উত্তর আমেরিকার 'থ্রি মাইল' দ্বীপে পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ঘটা দুর্ঘটনার বিভীষিকা। একগুচ্ছ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সামিল ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক হতে পারে যে এমন যে কোনও দুর্ঘটনা তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখনই। অথচ চেরনোবিলে পরমাণু চুল্লি বসানোর সময় ন্যূনতম সাবধানতাগুলোও উপেক্ষা করা হয়েছিল। গ্রাফাইট-প্রশমিত চুল্লির চারদিকে তেজস্ক্রিয়তারোধী বিশেষ ধারক-কাঠামো গঠন করা হয়নি 'বাড়তি' খরচ এড়ানোর জন্য। গ্লাসনস্ত চালু হওয়ার পর বহু বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ চেরনোবিল পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের অপর্যাপ্ত সাবধানতা ব্যবস্থা, গঠনের ত্রুটি ও ঢিলেঢালা চাল নিয়ে বহু লেখাপত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তাও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের টনক নড়াতে পারেনি। এভাবেই এসে হাজির হল ১৯৮৬-র অভিশপ্ত ২৬শে এপ্রিল। সাধারণ নিরাপত্তাবীধিতে অনুমোদনীয় নয় এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা করা হচ্ছিল চতুর্থ চুল্লিতে, তার স্বয়ংক্রিয় নির্বাপন ব্যবস্থাকে অকেজো করে রেখে। সেই চুল্লি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। এই বিস্ফোরণ পরিবেশে তৎক্ষণাৎ ১২ কোটি কুরি তেজস্ক্রিয় পদার্থ উগরে দেয়। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা পরমাণু বোমা দুটো যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ উগরেছিল, এই পরিমাণ তার প্রায় ১০০ গুণ! বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কায় ২ জন শ্রমিক তখনই প্রাণ হারায়। প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সজাগ না করে ও যথেষ্ট নিরাপত্তাবর্ম না দিয়ে দমকলের কর্মীদের ও শ্রমিকদের পরিস্থিতি সামলাতে পাঠানো হয়। ২৫

জনের উপর শ্রমিক ও দমকল কর্মী ১ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। সোভিয়েত রাষ্ট্র গোটা দুর্ঘটনার ঘটনাই অস্বীকার করার কৌশল নেয়। তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ বিপদের মুখে থাকা অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদেরও কোনওভাবে সতর্ক করা বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়নি সেই কৌশলের অংশ হিসেবে। মোট কতজন যে এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল তার হিসাব নেই। বিভিন্ন অনুমান বলে যে প্রায় ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার মানুষ কেবল চেরনোবিলে প্রাণ হারিয়েছিল তেজস্ক্রিয়তার বলি হয়ে, আরও হাজার হাজার মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয়তায় উন্মোচিত হওয়ার কারণে মারণব্যাধি কর্কটরোগ বাসা বেঁধেছিল, বছরের পর বছর বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছিল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র নিজস্বার্থে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য তথাকথিত গ্লাসনস্তের আমলেও কতটা রুদ্ধকপাট হতে পারে, কতটা হেলাফেলার চোখে দেখতে পারে সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে, তার নিদর্শন হয়ে উঠল চেরনোবিল বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয়তার বিপদ রাষ্ট্র গোপন করে যাওয়ায় ঘটনার পরের দিন পরিবেশে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা তখন তুঙ্গে, তখন পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের কাছে ফুটবল মাঠে পূর্ণ দর্শক সমাগমে ফুটবল লিগের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল, পূর্বপরিকল্পনা মতো বেশ কিছু বিবাহ অনুষ্ঠান খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হল। নাগরিকরা জানতেও পারলেন না এভাবে তাঁরা বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়তার কাছে নিজেদের দেহকে অবারিতভাবে সমর্পণ করলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয়দের কাছে বিস্ফোরণ ও তার বিপদের খবর ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থে তাঁরাও নাগরিকদের কিছু জানাননি। ভোলোদিমির সেচেরবিতস্কি তখন ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা। তিনি গোর্বাচেভকে দূরভাষে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার কারণে কিয়েভ শহরে মেদিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হবে কিনা। গোর্বাচেভ পত্রপাঠ না বলে দেন, তারপর সেচেরবিতস্কিকে শাসিয়ে বলেন যে কিয়েভের মেদিবসের অনুষ্ঠান যদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতির মতো পালিত না হয় তাহলে সেচেরবিতস্কিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। ১লা মে কিয়েভ শহরে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ছিল নিরাপদসীমার অনেক উপরে, সোভিয়েত নথিতে তা নথিবদ্ধও আছে, অথচ তা কোনওকিছু না জানিয়ে কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই হাজার হাজার মানুষকে সমবেত করে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতির মতো' মেদিবস পালন করা হয়। সেচেরবিতস্কি সেই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। সর্বোচ্চ পার্টিনেতারা গোপনে তাঁদের পরিবারের

লোকজনকে তেজস্ক্রিয়তার বলি হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য কিয়েভ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিতে থাকেন। সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁরা তেমন কোনও তৎপরতা দেখাননি।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষেও অবশ্য দুর্ঘটনা পুরোপুরি অস্বীকার করে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। চেরনোবিল বিস্ফোরণের উগরানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মেঘ হাওয়ায় ভেসে সুইডেনের সীমান্তে হাজির হতেই তা সুইডেনের পরমাণুবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে। তারা আন্তর্জাতিকভাবে বিপদ সংকেত ছড়িয়ে দিয়ে বারবার সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা নিয়ে খোঁজ নিতে থাকে। সীমান্তবর্তী পড়শি দেশগুলো তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণের বিপদ আঁচ করে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। কোনও দেশের সরকার সেই দেশের নাগরিকদের মধ্যে সংক্রমণ রোধী আয়োডিন ট্যাবলেট বিতরণ করে, কোনও দেশের সরকার সংক্রামিত সন্দেহে ইউক্রেন থেকে আমদানি করা খাদ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে। সোভিয়েত রাষ্ট্র অবশ্য কোনও দুর্ঘটনা না হওয়ার তত্ত্বে তখনও অনড় থাকে।

অবশেষে দুর্ঘটনার ১০ দিন পর, ৬-ই মে ইউক্রেনিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটি সতর্কীকরণ জারি করেন এবং কিয়েভ থেকে আড়াই লাখ মানুষকে সাময়িকভাবে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তখনও লুকোছাপার শেষ হয়নি। চেরনোবিলের সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে হঠাৎই বিভিন্ন ধরনের কর্কটরোগ ও বিকৃত নবজাতকের সংখ্যা প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ার পরিসংখ্যান সামনে এলে কিয়েভের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'বিকিরণ ঔষধ কেন্দ্র' প্রকৃত কারণ ও উপশমের আলোচনা না করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ব্যস্ত হয়। তারা বলে যে মুখগহ্বরের কর্কটরোগ দাঁত তোলা ও দাঁত বাঁধানোর ত্রুটির জন্য বেড়ে গেছে আর বিকৃত নবজাতকদের জন্ম নাকি ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কীয়-প্রজননের ফল! দুর্ঘটনার দুই সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর ১৪ই মে গোর্বাচেভ প্রথম এই নিয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন, সেই বিবৃতিতেও তিনি কেবল চেরনোবিল নিয়ে পশ্চিমী প্রচারমাধ্যমের 'মিথ্যা প্রচার'-য়ের সমালোচনা করেন।

চেরনোবিলে কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে সোভিয়েত রাষ্ট্র একটি আয়োগ গঠন করেছিল। ভালেরি লিগাসভ ছিলেন সেই আয়োগের অন্যতম সদস্য। চেরনোবিল পরিদর্শনের পর লিগাসভ অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। দুর্ঘটনার আশু কারণ ও বিপদের মাত্রা বিশদে বর্ণনা করার পাশাপাশি তিনি গভীরতর ও দীর্ঘমেয়াদি কারণগুলোও উন্মুক্ত করার চেষ্টা

করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পরমাণু চুল্লী দেখভাল-নজরদারি করা ও নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের মান্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে বা নিজেদের মতো করে উদ্ভাবন করতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীসমাজ চূড়ান্ত অবহেলা-অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে চলেছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এ ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব দেয়নি, উচ্চপদস্থ পরমাণু-ব্যবস্থাপকরাও গণনিরাপত্তার বিষয়টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। তাঁর স্পষ্টভাষণের জন্য লিগাসভকে চরম মূল্য দিতে হয়। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও পেশাচর্চার সুযোগ তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। দুই বছর সেই যন্ত্রণা সয়ে ১৯৮৮ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ইয়ুরি স্খেরবাক একজন চিকিৎসক, চেরনোবিলের অভিজ্ঞতার পর তিনি পরমাণু-প্রযুক্তি বিরোধী পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'চেরনোবিল ও কম্যুনিস্ট ব্যবস্থা একে অপরের মতো নয়, তারা এক ও অভিন্ন।' স্খেরবাকের এই বক্তব্য ইউক্রেনে ক্রমপ্রসারমান জনমতের প্রতিফলন। জননিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে পরমাণুশক্তিকেন্দ্র চালানো এবং ভয়ানক দুর্ঘটনার পরও তা অস্বীকার করে গোটা জনপদের মানুষকে তেজস্ক্রিয়তার প্রাণঘাতী প্রকোপের মুখে জেনেশুনে ঠেলে দেওয়া অবশ্যম্ভাবীভাবে এই প্রশ্নকে প্রকট করে দিল যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছে ইউক্রেনিয়দের জীবনের কোনও মূল্য কি আদৌ আছে? নাকি কম্যুনিস্ট শাসকদের চোখে ইউক্রেন কেবলই একটি উপনিবেশ? উপনিবেশ নিঙড়ে সম্পদ দোহন করে নেওয়ার পর উচ্ছিষ্ট ছিবড়ে হিসেবে পড়ে থাকে সেখানকার প্রকৃতি ও প্রাণীকূল, যাদের কোনও গুরুত্ব নেই? ইউরি কোস্তেঙ্কো পরবর্তীকালে সোভিয়েত-উত্তর ইউক্রেনের পরিবেশমন্ত্রী হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি বলেছিলেন যে চেরনোবিল 'সোভিয়েত সর্বাত্মকতাবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার শেষ বিভ্রমটুকুও নির্মূল করে দিয়েছে।' চেরনোবিলের পর ইউক্রেনিয় লেখক ও সাংবাদিকদের কলমে 'ভাষিক চেরনোবিল', 'আত্মিক চেরনোবিল'-য়ের মতো শব্দবন্ধ জন্ম নেয় যার মধ্য দিয়ে তাঁরা সত্তর বছরোর্ধ সোভিয়েত শাসনকালে ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের ইতিবৃত্তকে ইউক্রেনিয় প্রাণ সম্পর্কে সোভিয়েত রাষ্ট্রের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকরনের সঙ্গে যুক্ত করে হাজির করতে থাকেন।

১৯৮৬-র জুনে ইউক্রেনিয়ার রাষ্ট্র-অনুমোদিত লেখক সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। এমনকি এই অধিবেশনেও চেরনোবিল-পরবর্তী জনমতের ছাপ পড়ে। ভোলোদিমির সেচেরবিতস্কি সহ কম্যুনিস্ট কর্তাব্যক্তিদের পরোক্ষ

সমালোচনা এবং রুশ-আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে ইউক্রেনের জাতীয় স্বাধিকার অর্জনের দাবি নজিরবিহীনভাবে উঠে আসে। এই সংগঠনের বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ওলেস হোনচার গোর্বাচেভের সংস্কার কর্মসূচীকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেনিয় ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে রক্ষা করার ডাক দেন। কবি আইভান দ্রাখ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও হোনচারের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আরও এগিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি চেরনোবিলের সাম্প্রতিক ঘটনা, ১৯৩৩ সালের খাদ্য কেড়ে নিয়ে গণহত্যা এবং ইউক্রেনিয় ভাষায় স্কুল গণমাধ্যম ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাগুলোকে পাশাপাশি রেখে বলেন যে ইউক্রেনিয়দের জাতি-গণহত্যার শিকার হতে হচ্ছে। ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেলেস্তকে বিদায় নিতে হওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইউক্রেনিয়ার পার্টি-প্রধান সেচেরবিতস্কি অতি-তৎপরতার সঙ্গে ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতিকে সর্বত হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইতেন— অধিবেশনের বক্তারা তাই সেচেরবিতস্কির সমালোচনায় অত্যন্ত প্রখর ছিলেন। রাষ্ট্রের পেতে রাখা 'উন্নতির সোপান' আরোহণে উৎসুক ইউক্রেনিয়রা যেভাবে তার জন্য নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দেয়, তাও বিদ্রূপ ও নিন্দার বস্তু হয়েছিল। একজন বক্তা শ্লেষাত্মকভাবে একটি কৌতুক উল্লেখ করেছিলেন: 'ইউক্রেনিয়াবাসী কোনও ইহুদির ইউক্রেনিয় ভাষা শিখতে প্রায় কোনও সময়ই লাগেনা, একজন রুশের লাগে ২ বা ৩ বছর, কিন্তু একজন উচ্চাকাঙ্খী ইউক্রেনিয় অনন্ত কাল পেলেও তা শিখে উঠতে পারেনা।' আইভান দ্রাখের এই ১৯৮৬ সালের ভাষণ সেই গ্লাসনস্তের আমলেও রাষ্ট্রীয় সেনসরদের হাতে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হয়ে তবে মুদ্রণের ছাড়পত্র পেয়েছিল। তার হাতে লেখা বা বেআইনি 'সামভিদাভ' সংস্করণ অবশ্য প্রচুর ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকের কাছে তা হয়ে উঠেছিল ইউক্রেনিয় জাতীয় বিপ্লবের প্রথম ফুকার।

২৬

জাতীয় আন্দোলনে জোয়ারের টান

ইউক্রেনিয়ার সমাজে চেরনোবিল-পরবর্তী আলোড়ন-মন্থনে ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকার এবং আত্মনির্ধারণের অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে একাধিক সক্রিয়তা ও সংগঠন দানা বাঁধল, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাববলয়ের বাইরে সক্রিয়তার পরিসর তৈরি হল। ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকের বিক্ষুব্ধরা ভূমিকা নিলেন, ভূমিকা নিলেন গোর্বাচেভের সংস্কার-প্রক্রিয়ার ফলে সোভিয়েত জেলখানা থেকে ১৯৮৬-১৯৮৭ সালে ছাড়া পাওয়া ইউক্রেনিয় জাতীয়তাপন্থীরা। 'ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘ' এই আবহে গড়ে উঠল ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে। ১৯৭০-য়ের দশকে সক্রিয় মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করল। ২৬ বছর ধরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে বন্দি বা নজরবন্দি হয়ে থাকতে হওয়া লেভকো লুকিয়ানেঙ্কো তার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ১৯৮৮ সালে লেখা প্রবন্ধ 'এরপর কী?'-তে লুকিয়ানেঙ্কো যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছিলেন যে দীর্ঘ রুশ-আধিপত্যে ইউক্রেনিয়াকে 'ক্রুশবিদ্ধ করে, লুণ্ঠন করে, রুশীকরণ করে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে, স্বশাসনের প্রশ্ন এখন জাতির কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।' ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘে সমবেত অধিকাংশই স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনকে গঠনের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু এই দাবি পূর্ব ইউক্রেনের রুশ অধিবাসীদের সমর্থন পাবেনা, বরং বিরোধিতায় ঠেলে দেবে, এই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের সংগঠনের মূল দাবি হিসেবে তা রাখেননি। বরং, ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘের ১৯৮৮ সালের নীতি সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা, গণতান্ত্রিকীকরণ, ইউক্রেনিয় ভাষা রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রশাসনের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘের প্রতিষ্ঠাতারা আরো কয়েকটি স্বতন্ত্র মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন। যাদের মধ্যে একটি ছিল 'ইউক্রেনিয় সংস্কৃতি ও ইকোলজি সংঘ', যেখানে সাংস্কৃতিক পরম্পরা পুনরুদ্ধার এবং প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার ভাবনাকে পরস্পর-সংযুক্ত হিসেবে চর্চা করতে চাওয়া হয়েছিল। আর একটি ছিল 'ইউক্রেনিয় স্বাধীন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীদের সংঘ', যা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত লেখক সংঘের সমান্তরাল একটা স্বাধীন মঞ্চ হয়ে ওঠার প্রত্যাশী ছিল। এই দুটি মঞ্চই রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত একাধিক আন্দোলনের সূচনা করে। মঞ্চদুটো একযোগে দাবি তুলেছিল যে ব্রেজনেভ আমলে সোভিয়েত কারাগারে বন্দি অবস্থায় প্রাণ হারানো ইউক্রেনিয় ভাষার লেখক ও জ্ঞানচর্চাকারীদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে পুনর্বার কবর দিতে হবে এবং তাদের লেখা রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ব্যবস্থায় প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও তারা দাবি তুলেছিল যে খাদ্য কেড়ে নিয়ে গণহত্যার ১৯৩৩ সালের ট্র্যাজেডিকে অস্বীকার করে ইউক্রেনের ইতিহাসে একটি অন্ধকার গর্ত তৈরি করে রাখা চলবে না, সে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সরকারকে প্রকাশ করতে হবে। কিয়েভিয় রুস-য়ে খৃস্টধর্ম প্রবর্তনের সহস্র বছর উদযাপনের সরকারি অনুষ্ঠান ঘিরেও তারা রুশ প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসবিদদের ইতিহাসের রুশীকরণের বিরুদ্ধে হ্রুসেভস্কির ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে তুলে ধরে প্রতিবাদে মুখর হয়।

তাই, গোর্বাচেভের সরকারি সংস্কারের লাইনের সমর্থক হিসেবে নিজেদের হাজির করলেও এই সংগঠনগুলো প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রাধিকারের ভিতকে নানাদিক থেকে আক্রমণ করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র হয়, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দমনমূলক ব্যবস্থা জোরদার হয়। ১৯৮৮ সালে চেরনোবিলের দুর্ঘটনার ২ বছর পূর্ণ হওয়ার দিন কিয়েভ শহরে ইউক্রেনিয় সংস্কৃতি ও ইকোলজি সংঘ একটি প্রতিবাদ-পথসভার আয়োজন করেছিল। শহরের সোভিয়েত প্রশাসন উচ্চস্বরে লাউডস্পিকার বাজিয়ে সেই সভাকে পণ্ড করে দেয় এবং সভার ১৭ জন সংগঠককে সেখান থেকেই গ্রেফতার করে। পরেরদিন প্রচারমাধ্যমে বলা হয় যে গ্রেফতার হওয়া ১৭ জন হল ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী, যারা রাস্তার মেরামতকার্যে বাধা দিয়ে যানচলাচল আটকে দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে চরম সন্ত্রাস হানার ফন্দি করছিল!

পশ্চিম ইউক্রেনে ল্‌ভিভ শহরে ১৯৮৭ সালে 'তোভারিস্তভো লেভা' (সিংহ সমাজ) নামে ছাত্র-যুব সংগঠন তৈরি হয়। প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য, ঘোষণা করেছিল যে 'সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞার

মাধ্যমে ইউক্রেনিয় সার্বভৌম রাষ্ট্র পুনর্গঠনের' জন্য তা কাজ করবে। ই সংগঠন সক্রিয়তার বহুমুখী পরিসর তৈরি করেছিল, যেমন: ইউক্রেনের পুরানো গির্জা ও সমাধিক্ষেত্রগুলোর সংস্কার, পরম্পরাগত মৃৎশিল্প ও কুম্ভকারশিল্প বহমান রাখার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন, প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা ও প্রকৃতিবান্ধব জীবনাচার সম্পর্কিত আলোচনা, ইউক্রেনিয় ভাষার লেখক-কবি-সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন, ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তা নিজেকে যুক্ত করেনি, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত প্রশাসন এর সরকারি নিবন্ধীকরণ দীর্ঘ ২ বছর আটকে রেখেছিল।

কিয়েভ শহরে গড়ে উঠেছিল আর একটি ইউক্রেনিয় ছাত্রসংগঠন। উনিশ শতকের ইউক্রেনিয় গ্রামে 'হ্রোমাদা' নামে সাংস্কৃতিক সংসর্গের প্রচলন ছিল। 'হ্রোমাদা' শব্দের অর্থ 'জনসমাজ'। কিয়েভের ছাত্রসংগঠন 'হ্রোমাদা' শব্দটিকেই নিজের নাম হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এই সংগঠন আন্ডাগ্রাউন্ড 'সামভিদাভ' প্রকাশনা ও বিতরণ ব্যবস্থা সংগঠিত করে নিয়মিতভাবে নিজস্ব পত্রিকা ও ইউক্রেনিয় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন লেখাপত্র প্রকাশ করে বহুজনের কাছে পৌঁছে দিত। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ফৌজী প্রশিক্ষণের বিধি ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। হ্রোমাদার নেতৃত্বে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই ফৌজী প্রশিক্ষণ বয়কট করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এরপর 'কিয়েভ-মোহিলা আকাদেমি' পুনঃস্থাপনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই কিয়েভ-মোহিলা আকাদেমি ছিল ইউক্রেনিয় ভাষায় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিয়ে সেই ভবনে ফৌজী স্কুল বসিয়েছিল। ১৯৮৮ সালের শরৎকালে হ্রোমাদা-র আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করল। পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠন 'সবুজ বিশ্ব সমিতি'-র সঙ্গে যৌথভাবে হ্রোমাদা কিয়েভ শহরে ১০,০০০ মানুষের জমায়েত করে। 'ইউক্রেনিয় পপুলার ফ্রন্ট' গঠন ছিল সেই জমায়েতের উদ্দেশ্য। সেখানে পরমাণুশক্তি উৎপাদন বন্ধের দাবি করা হয়। জমায়েতের পক্ষ থেকে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়। সেই খোলা চিঠিতে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সেচেরবিতস্কি ও তাঁর পার্ষদবর্গকে ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হয় এবং দাবি তোলা হয় যে ইউক্রেনে কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁদের রাখা চলবে না। কিয়েভের সীমা ছাড়িয়ে গোটা ইউক্রেনেই এই জমায়েত আলোড়ন তৈরি করে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক দমনের পথ নেয়। হ্রোমাদার বেশকিছু

সংগঠক-ছাত্রকে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং সোভিয়েত দেশে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁরা আর ভর্তি হতে পারবেন না বলে ফতোয়া জারি হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউক্রেনের গ্রিক ক্যাথলিক গির্জা ও ইউক্রেনিয় অটোসেফালাস অর্থোডক্স গির্জাকে বেআইনি ঘোষণা করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রুশ অর্থোডক্স গির্জার হাতে তুলে দিয়েছিল। এখন ইউক্রেনিয় স্বাধিকারের আন্দোলনের অংশ হিসেবে ওই দুই ইউক্রেনিয় গির্জাকে আইনিভাবে উপাসনার অধিকার দেওয়া ও তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পদ ফেরত দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠল। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ গির্জাদুটোকে আইনি স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে পশ্চিম ইউক্রেনের ল্‌ভিভ শহরের ল্‌ভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানুষের জমায়েত হতে থাকে। এই জমায়েত থেকে 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভবনের (পেরেসত্রোইকা-র) সমর্থনে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' তৈরি হয়। সোভিয়েত সরকার সেনা পাঠিয়ে এই জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে ও পুনর্বার জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমন জমায়েত, ছোট আকারে হলেও পশ্চিম ইউক্রেনের আরও বহু শহরে ছড়িয়ে যায়।

১৯৮৯ সালে কম্যুনিস্ট শাসকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভাষিক-সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের লড়াই ইউক্রেনিয়ার জনসমাজের ব্যাপক অংশকে জড়িয়ে নেয়। তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। সেই তিনটি ঘটনার দিকে নজর ফেলা যাক।

প্রথম ঘটনাটি ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটে। 'ইউক্রেনের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের জন্য গণআন্দোলন' তার খসড়া কর্মসূচী ঘোষণার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৮ সাল থেকেই লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া ও লাতভিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণকামী আন্দোলনের গণমঞ্চগুলোর আদলে ইউক্রেনিয়াতেও একটি গণমঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। এই খসড়া কর্মসূচী ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হল। 'রুখ' নামে এই আন্দোলনের গণমঞ্চ পরিচিত হয়ে ওঠে। ইউক্রেনিয় ভাষায় 'রুখ' শব্দের অর্থও 'আন্দোলন'। মতবাদভিত্তিক কোনও পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে গণসমাবেশের শক্তিতে ভর করে স্বাধিকার অর্জন ছিল এই মঞ্চের মূল ভাবনা। 'ইউক্রেনিয় লেখক সংঘ' এবং 'তারাস শেভচেঙ্কো ইউক্রেনিয় ভাষা সমাজ' এই মঞ্চগঠনে মূল উদ্যোগীর ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নিয়েছিল 'ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘ', 'গ্রিন ওয়ার্ল্ড'-য়ের মতো নাগরিক অধিকার ও পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠন, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন। এই মঞ্চ গোর্বাচেভ-ঘোষিত গ্লাসনস্ত ও গণতান্ত্রিকীকরণের স্লোগানকে সামনে রাখলেও কম্যুনিস্ট শাসকরা তাঁদের কিয়েভের দপ্তর থেকে বেশ সন্দেহের চোখে এর উপর নজর রাখতে শুরু করেছিল। এর পর 'ইউক্রেনিয় লেখক সংঘ' আরও এগিয়ে দাবি তোলে। তারা দাবি করে যে ইউক্রেনিয় ভাষাকে ইউক্রেনিয়ার সরকারি ভাষা করতে হবে, স্তালিনের জমানায় ঘটা সমস্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণহত্যার তদন্ত করে সত্য প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকৃতি-পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আশু জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। রুখ-য়ের খসড়া কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয় যে সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের সাপেক্ষে ইউক্রেনের অবস্থান পুনঃসংজ্ঞায়িত করে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ইউক্রেনকে গঠন করা তাদের অভিপ্রায়। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা প্রত্যক্ষভাবে না বললেও রুখ ঘোষণা করেছিল যে নিজ অঞ্চলের সম্পদ ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ইউক্রেনের নিজের হাতে থাকা উচিত এবং ইউক্রেনের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। প্রশাসনের উপর কম্যুনিস্ট পার্টির একাধিপত্যকে প্রশ্ন করে রুখ ঘোষণা করেছিল যে প্রশাসনিক পদের নির্বাচনে সে তার নিজের প্রার্থী দেবে ও সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রচার করবে।

১৯৮৯-য়ের মার্চে সোভিয়েত ইউনিয়নের গণপ্রতিনিধিদের (people's deputies) কংগ্রেস নির্বাচন হয়। তার মোট পদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার শাখাসংগঠনের সদস্যদের জন্য। গর্বাচেভের নয়া 'গণতান্ত্রিকীকরণ' নীতি অনুযায়ী বাকি পদের জন্য অ-কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল কাগজে-কলমে। কার্যক্ষেত্রে সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠন ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে অ-কম্যুনিস্টদের প্রার্থী হওয়া আটকাতে চেয়েছিল। গুটিকয় জেলাতেই মাত্র অ-কম্যুনিস্টরা সে বাধা অতিক্রম করে ব্যালটে নিজেদের নাম তুলতে পেরেছিল। কিয়েভে কম্যুনিস্টরা প্রথম থেকেই রুখ-য়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু করেছিল এবং রুখ থেকে প্রার্থী যাতে হতে না পারে তার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু রুখ-য়ের পক্ষ নিয়ে বিশাল জমায়েত ও গণপ্রতিবাদ হয় কিয়েভ ল্‌ভিভ শহরে, যার জোরে রুখ কংগ্রেসের জন্য একাধিক প্রার্থীর মনোনয়ন সফলভাবে পেশ করতে পারে। কিয়েভ ও পশ্চিম ইউক্রেনে সেই প্রার্থীদের অধিকাংশই জয়লাভ করে। বহু কম্যুনিস্ট

প্রার্থী, যাদের বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীদের দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি, ভোটদাতারা তাদের নাম ব্যালটপেপার থেকে কেটে দেয়, যার ফলে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয় যে 'বিরোধিতাহীনভাবে' ভোটে দাঁড়িয়েও বহু কম্যুনিস্ট প্রার্থী মনোনীত হওয়ার ন্যূনতম গণ্ডি ৫০ শতাংশ ভোটও পেরোতে পারেনি।

১৯৮৯-য়ের এপ্রিলে রুখ ও তার সহগামীরা ল্‌ভিভ শহরে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূতকরণ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিকীকরণের দাবি নিয়ে বিশাল আকারের গণজমায়েত ও প্রতিবাদ সংগঠিত করতে থাকে। কম্যুনিস্ট শাসনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলুদ-নীল রঙের ইউক্রেনের জাতীয় পতাকা বহু দশক পর আবার সেই জমায়েতগুলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় মানুষের হাতে উড়তে দেখা যায়। তখন ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত দপ্তরের প্রধান ছিলেন লিওনিদ ক্রাভচুক। তিনি ক্রুদ্ধ ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে 'ইউক্রেনিয় হলুদ-নীল পতাকার নোংরা রক্তমাখা প্রতীক নিষিদ্ধই থাকবে এবং তার আড়াল নিয়ে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিদের কখনই মাথা তুলতে দেওয়া হবেনা'। ইতিহাসের কী পরিহাস— কয়েক বছর যেতে না যেতেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভেঙে পড়ার পর এই ক্রাভচুককেই ইউক্রেনের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা হিসেবে এই হলুদ-নীল পতাকাকে সমাদর করতে হয়েছিল— সে কথায় অবশ্য আমরা পরে আসব।

১৯৮৯ সালের জুন ও জুলাই মাসে নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের গণপ্রতিনিধিদের কংগ্রেসের অভিবেশন বসে মস্কোতে। এই অধিবেশনেই গর্বাচেভ বিক্ষুব্ধ নেতা ও মানবাধিকারের পক্ষে আওয়াজ তোলা আন্দ্রেই শাখারভের কণ্ঠরোধ করার জন্য অধিবেশন কক্ষে তাঁর আসনের সামনের মাইক থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেনিয় স্বাধিকারের আন্দোলনের যে প্রতিনিধিরা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন, অধিবেশনের বাইরে তাঁদের সঙ্গে বাল্টিক দেশসমূহ ও জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, অঘোষিত সমন্বয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কিয়েভে রুখ-য়ের প্রথম সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়। গোটা ইউক্রেন থেকে নির্বাচিত ১,১৫৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১,১০০ জন সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। রুখ-য়ের সদস্যসংখ্যা তখন প্রায় ২লাখ ৮০ হাজার। অধিবেশনস্থল ছিল কিয়েভের পলিটেকনিকাল ইনস্টিটিউট, যা ইউক্রেনের হলুদ-নীল জাতীয় পতাকা কিয়েভিয়-রুস আমলের শাসন-প্রতীক

ত্রিশূল দিয়ে সজ্জিত হয়েছিল, ছিল বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব প্রতীকও। ইউক্রেনিয় কসাকদের পরম্পরাগত কুচকাওয়াজ-গানকে অধিবেশনের মূলভাব-প্রকাশক গান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘের লেভকো লুকিয়ানেঙ্কো তাঁর বক্তব্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে 'আধুনিক কালের নিকৃষ্টতম পাপের আধার' হিসেবে আখ্যায়িত করে সোভিয়েত সাম্রাজ্য ধ্বংস করার ডাক দেন। আরও কয়েকজন বক্তা সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে পৃথক স্বাধীন ইউক্রেন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন তাঁদের বক্তব্যে। অধিকাংশ বক্তা অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ধারণের অধিকারসম্পন্ন অঙ্গরাজ্যের সমষ্টি হিসেবে তা পুনর্গঠনের দাবি জানান এবং ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের পরিসর তৈরির উপর জোর দেন। বহু বক্তা ইউক্রেনিয় ব্যতিরেকে ইউক্রেনের অন্যান্য জনজাতির মানুষ, অর্থাৎ রুশ, পোল, ইহুদি ও তাতারদের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক ইউক্রেন গঠনের লড়াইয়ে শরিক হওয়ার আবেদন করেন এবং নতুন ইউক্রেনে সমস্ত জনজাতির সমমর্যাদার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প প্রকাশ করেন। অধিবেশনের বিবরণী থেকে দেখা যায় যে সমবেত প্রতিনিধিদের ৭২ শতাংশ উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন, ১০ শতাংশ শ্রমিক এবং ২.৫ শতাংশ খামার-শ্রমিক। ৫০ শতাংশ প্রতিনিধি এসেছিলেন পশ্চিম ইউক্রেন থেকে আর প্রায় ২০ শতাংশ কিয়েভ প্রদেশ থেকে। অধিবেশনের পর পূর্ব ইউক্রেনের রুশ-প্রধান খারকিভ থেকে আসা কয়েকজন প্রতিনিধি অধিবেশনে 'চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী' মনোভাবকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে রুখ থেকে ইস্তফা দেন। সোভিয়েত প্রশাসন অবশ্য সর্বত্রই রুখ-য়ের সদস্যদের উপর ইস্তফা দেওয়ার ও রুখ-য়ের অবস্থানকে নিন্দা করে বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করে। রুখ-য়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও জনপ্রিয়তা তাতে টোল খায়নি।

১৯৮৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ঘটনাটির ঘটনাস্থল পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চল। গ্রীষ্ম এখানে খনিশ্রমিকদের ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ওঠে। পূর্ব ইউক্রেন ছিল সোভিয়েত ভারী শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, খনি ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূর্ব ইউক্রেন। সবচেয়ে দীর্ঘসময় সোভিয়েত দখলে থাকার কারণে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে সবচেয়ে বেশি পড়ার কারণে পূর্ব ইউক্রেনে রুশ জনজাতির বা রুশীভূত হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশি। রুশ ভাষা এখানে সমাজ-ব্যবহারের সবকটা পরিসরকেই দখল করেছে। ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদের

প্রভাব এখানে খুবই দুর্বল। রুখ বা ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘের গুটিকয় আঞ্চলিক প্রতিনিধিকে সাধারণত সন্দেহ-অবিশ্বাসের চোখেই দেখা হয়। ডনবাসও এর ব্যতিক্রম নয়। কয়লাখনি-প্রধান এই অঞ্চলে ৪০শতাংশেরও বেশি মানুষ রুশ জনজাতির, ইউক্রেনিয়রাও এখানে ঘরে-বাইরে রুশ ভাষা ব্যবহার করে। এহেন অঞ্চলে 'ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী'-দের উসকানি অস্তিত্বহীন, ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখানে গণআন্দোলন গড়ে ওঠা কম্যুনিস্ট শাসকদের কাছে বিশেষ দুশ্চিন্তার বিষয় বৈ কি!

ডনবাস শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়েছিল কয়েকটি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে ঘিরে, যেমন— মজুরিবৃদ্ধি, কাজের পরিবেশের উন্নতি, শ্রমিকবসতির বিপণিগুলোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের (বিশেষত, সাবানের) ভয়ংকর অভাব ঘোচানো। শ্রমিকদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশও তৈরি হয়েছিল কারণ সোভিয়েত শিল্প-ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণধারী আমলাতান্ত্রিক স্বার্থগোষ্ঠীর ব্যাপক দুর্নীতি-স্বজনপোষণ শিল্পগুলোর কার্যকরী পুঁজিতে থাবা বসিয়ে বিনিয়োগ-সংকট ঘনীভূত করে তুলেছিল। পেরেস্ত্রোইকার টানাপোড়েন তা আরও তীব্র করেছিল। ধর্মঘটের পথে নামা শ্রমিকরা পার্টি-প্রভাবিত শ্রমিকসংঘের বাইরে শ্রমিকদের স্বাধীন ধর্মঘট পরিচালনা কমিটি গড়ে তুলে সরকারের নীতি ও কারখানান্তরের ব্যবস্থাপকদের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল। মস্কোর সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা উঠে এসেছিল তাদের মুখে। তারা বলছিল যে মস্কোর সরকার কার্যত ইউক্রেনের গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমস্ত কর বসানো ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের হাতে, ফলে ইউক্রেনের সমস্ত বিদেশি মুদ্রায় উৎপাদন মস্কো চেঁছেপুঁছে নিয়ে নেয়, অথচ ইউক্রেনের জন্য সাংস্কৃতিক বিকাশ, আবাসন নির্মাণ বা বিজ্ঞান-গবেষণায় কোনও খরচই করে না। ফলে শ্রমিক মহল্লায় জনস্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হতে হতে তলানিতে এসে ঠেকেছে, গড় আয়ু ক্রমশ কমছে, প্রসূতিমৃত্যু ও গর্ভনষ্টের সংখ্যা ৪০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, পানীয় জলে দূষণ মারাত্মক, বায়ুদূষণ অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা ব্যক্ত করে দাবি করে যে কয়লা খনিগুলোর পরিচালনায় শ্রমিকদের স্বব্যবস্থাপনার অধিকার দিতে হবে। কিছু শ্রমিক আবার এমন বক্তব্য হাজির করেন যে মস্কোর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে ইউক্রেন যদি তার নিজের সম্পদ ও অর্থের ব্যবহার ও বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারে, তবেই অবস্থা বদলাবে। অর্থাৎ, সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার

কথা না হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবি উঠে আসে। এমনকি এই জনমতের চাপে ইউক্রেনিয় প্রধানমন্ত্রী ভিটোল্ড ফোকিন অবধি ১৯৯০ সালে বলতে বাধ্য হন, 'আমাদের একমাত্র আশা, পরিস্থিতি উন্নয়নের একমাত্র সম্ভাবনা আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে'। শ্রমিক ধর্মঘটের বিক্ষোভ আরও প্রসারিত হওয়া রুখতে মস্কোর সরকার ১৯৮৯-য়ের জুলাই মাসের শেষে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের কাজে ফেরায়। কিন্তু আগুন পুরো চাপা পড়েনি। ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে ডনবাস শ্রমিকরা আবারও ধর্মঘটে নেমেছিল।

১৯৮৯ সালের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির সূত্রপাত খোদ কম্যুনিস্ট পার্টির অন্দরে। রুখ-য়ের প্রারম্ভিক অধিবেশনের পর সেচেরবিতস্কির নেতৃত্বে ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি রুখ-য়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বষমূলক প্রচার ও কড়া দমনমূলক ব্যবস্থা শুরু করলেও কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেই তা নিয়ে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। গর্বাচেভিয় সংস্কারের যুক্তি তুলেই কম্যুনিস্ট পার্টির এই একরোখা আধিপত্যবাদী অবস্থানের সমালোচনা উঠছিল পার্টির ভিতরে এবং বহু পার্টি সদস্য ইউক্রেনিয় ভাষা-জাতীয়তার স্বাধিকারের পক্ষে খোলাখুলি মত ব্যক্ত করতে শুরু করেছিলনে। সমাজ-প্রশাসনের বিভিন্ন ধাপে নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখা নিয়ে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের চিন্তা বাড়ছিল। চেরনোবিলের পর জননিরাপত্তা বিষয়ে চরম উদাসিনতা ও ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে চরম বিদ্বেষমূলক মনোভাবের দায় সেচেরবিতস্কির উপর চাপিয়ে তাঁকে বলি দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল। ১৯৮৯-য়ের গোড়াতেই ভোলোদিমির ইভাশকো নামের এক মধ্যপন্থী নেতাকে ইউক্রেনিয়ার পার্টিতে সেচেরবিতস্কির পরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে তুলে আনা হল আর সেই বছরের শরতেই সেচেরবিতস্কিকে পার্টির সর্বোচ্চ পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল মস্কোর নেতারা। সোভিয়েত প্রচারমাধ্যমে সেচেরবিতস্কি-অপসারণকে স্বেচ্ছাবসর হিসেবে দেখানো হল, তাঁকে রাজনৈতিক নির্বাসনে পাঠানো হল, ১ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। মস্কোর নেতৃত্বের আস্থাভাজন ইভাশকো সর্বোচ্চ পদে বসেও টালমাটাল অবস্থা সামাল দিয়ে পার্টির শক্ত বাঁধুনি ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। ইউক্রেনিয় ভাষা-জাতীয়তার স্বাধিকারের দাবি ও গণতান্ত্রিকীকরণের দাবিতে জনমতের চাপ কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনের মতবাদে-গাঁথা কাঠামোয় ফাটলগুলোকে ক্রমশ চওড়া করছিল। ইভাশকোর ক্ষমতাভিষিক্ত হওয়ার এক মাস পরেই ভিতরে-বাইরে ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে

নতিস্বীকার করে ইউক্রেনিয় সুপ্রিম সোভিয়েত নতুন ভাষা-আইন প্রবর্তন করল যেখানে ইউক্রেনিয় ভাষাকে ইউক্রেনিয়ার সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হল এবং সরকারি ক্ষেত্রে, গণপ্রচারমাধ্যমে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ধাপে ধাপে ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। একইসঙ্গে অবশ্য রুশ ভাষাকে গণজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে রেখে দেওয়ার কথাও বলা হল। অর্ধ শতকেরও বেশি সময় জুড়ে ইউক্রেনিয় ভাষাকে ব্যবহারের অযোগ্য বলে নস্যাৎ করার চেষ্টার পর অবশেষে এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল সোভিয়েত প্রশাসন। ইউক্রেনে শাসন টিকিয়ে রাখতে হলে ভাষা-জাতীয়তার প্রশ্নে এই আপস-রফা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তখন। গণতান্ত্রিকীকরণের প্রশ্নে পার্টির মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে শিবিরে ভাগ হয়ে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছিল। কোন কৌশলে হাত থেকে পিছলে যেতে থাকা ক্ষমতার রশি আবারও আঁটো করে ধরা যাবে বিরোধ আসলে তাই নিয়েই। মধ্যপন্থী ইভাশকো তাঁর কার্যকারিতা খুইয়ে মস্কোয় কেন্দ্রীয় পার্টি-আমলার পদে বদলি হলেন। ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির উপরমহলের নেতারা পোষাক পাল্টে 'জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট' অবতার ধারণ করলেন। যে লিওনিদ ক্রাভচুক আগের বছরই ইউক্রেনিয় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীককে 'নোংরা, রক্তমাখা, ফ্যাসিস্ট' বলে গাল দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীল বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে নস্যাৎ করেছিলেন, তিনি এখন ইউক্রেনের 'জাতীয় স্বাধীনতা' অর্জনকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষমতাশীর্ষে উঠে এলেন।

২৭

পাড় ভাঙার শব্দ

ইউক্রেনের পড়শি বাল্টিক দেশগুলোতেও ১৯৮৯ সালের শুরু থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও রুশ আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠছিল, যার প্রভাব পড়ছিল ইউক্রেনে। বাল্টিক দেশগুলোর পপুলার ফ্রন্ট সংগঠনগুলো ১৯৮৯ সালে একের পর এক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জনকেই আশু লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করছিল। ১৯৮৯-য়ের ফেব্রুয়ারিতে লিথুয়ানিয়ার পপুলার ফ্রন্ট সাজুদিস এই ঘোষণা করে। এপ্রিল মাসে এস্তোনিয়ার পপুলার ফ্রন্ট এবং মে মাসে লাতভিয়ার পপুলার ফ্রন্ট একই ঘোষণা করে। পপুলার ফ্রন্টগুলি বিপুল গণসক্রিয়তার পরিসর তৈরি করে। সেই চাপে লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া ও লাতভিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া রুশ ভাষার বদলে যথাক্রমে লিথুয়ানিয়, এস্তোনিয় ও লাতভিয় ভাষার সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের আইন হয়। এই ভাষা আইনের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আবার সেই সমস্ত দেশের সংখ্যালঘু কিন্তু ক্ষমতাশালী রুশভাষী মানুষ পাল্টা জোট বাঁধতে উদ্যোগী হয়। পপুলার ফ্রন্টগুলি স্বাধীনতার দাবি সামনে আনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশের উপর সোভিয়েত দখলদারিকে অবৈধ বলে দাবি করে। এই দখলদারির সূত্রপাত হিটলার-স্তালিন এলাকাদখল সংক্রান্ত ভাগবাটোয়ারার যে মলোটভ-রিবেনট্রপ গোপন চুক্তির মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর তারা চাপ তৈরি করতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েত শাসকদের গ্লাসনস্ত তখনও অতটা উন্মুক্ত হয়নি। তাই সোভিয়েত শাসকরা তখনও তেমন কোনও চুক্তি অস্বীকার করে যেতে থাকে। সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাল্টিক জাতীয় স্বাধিকারপন্থীদের সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা সোভিয়েত দেশের অন্যত্রও বিদ্রোহ উসকে দেয়। ককেশাস,

ইউক্রেন মোলদোভায় জাতীয় স্বাধিকারের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতা পায়। কারাবাখ, আবখাজিয়া ও মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিরোধ দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৯ সালের ২৩শে আগস্ট মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির ৫০ বর্ষপূর্তি হাজির হয়। সেইদিন এক অভূতপূর্ব অহিংস কার্যক্রম সোভিয়েত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গণভিত্তির ব্যাপকতাকে সামনে এনে দেয়। সেই কার্যক্রম 'বাল্টিক শৃঙ্খল' নামে পরিচিত। তালিন থেকে ভিলনিয়াস অবধি এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া বিখ্যাত বাল্টিক সরণির দুইদিকে ৫২০ কিলোমিটার লম্বা মানবশৃঙ্খলে সামিল হন ২০ লাখ মানুষ। তিনটি দেশ জোড়া এমন মানবশৃঙ্খল নজিরবিহীন। ২০ লাখ মানুষ তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় মলোটভ-রিবেনট্রপ গোপন চুক্তিকে ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধগুলোর একটি বলে চিহ্নিত করে সেই অপরাধের উপর গড়ে ওঠা সোভিয়েত দখলদারির অবসান দাবি করে। এই কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল যে ওই তিন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিও এর বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। এর প্রতিক্রিয়ায় গোর্বাচেভের উপদেষ্টামণ্ডলীর জনৈক সদস্য জনান্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে বাল্টিক দেশগুলোর সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা (এ এস চেরনিয়ায়েভ, শেস্ত লেত স গর্বাচেভিম, মস্কো:কালচুরা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৯৬)

বাল্টিক শৃঙ্খল যদি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙনের অনিবার্যতা বোধ সামনে নিয়ে এসে থাকে আগস্ট মাসে, তবে নভেম্বরে পূর্ব জার্মানির কম্যুনিস্ট শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত আধিপত্য বলয়ের ভেঙে পড়া মূর্ত ঘটনা হয়ে উঠল। দ্রুত একের পর এক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় ব্যাপক জনরোষের মুখে কম্যুনিস্ট শাসন ভেঙে পড়ল, কম্যুনিস্ট শাসক ও কম্যুনিস্ট পার্টিদের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই ঘটনাপ্রবাহ ইউক্রেনেও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনশীলতা সম্পর্কে বিশ্বাস জাগাল, জাতীয় স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনকে আরও সাহসী করে তুলল। 'বাল্টিক শৃঙ্খল'-য়ের দিনটিতে ইউক্রেনেও পশ্চিম ইউক্রেনের ল্‌ভিভ থেকে কিয়েভ অবধি ৪.৫ লাখ মানুষের মানবশৃঙ্খল তৈরি হয়েছিল। সেখানেও মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সোভিয়েত দখলদারির অবসান চাওয়া হয়েছিল। এরপর ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্বাচন এসে পড়ল। ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন,

নাগরিক অধিকার ও প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কাজ করা ৪০টি স্বাধীন গোষ্ঠী একসঙ্গে মিলিত হয়ে 'গণতান্ত্রিক ব্লক' নামে মঞ্চ তৈরি করল। তারা দাবি করল, ইউক্রেনিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই লক্ষ্যে নতুন সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, গণতান্ত্রিকীকরণ প্রকৃত অর্থে করতে হবে, জাতীয় জীবনের পুনর্জন্ম ঘটাতে হবে এবং পরমাণুশক্তির অবসান ঘটাতে হবে। গোটা ইউক্রেন জুড়েই গণতান্ত্রিক ব্লক তার দাবিসমূহের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালাল। পশ্চিম ইউক্রেনে তা বিপুল সমর্থন পেল। এমনকি পূর্ব ইউক্রেনেও তা সাড়া ফেলল, বোঝা গেল যে সেখানেও কম্যুনিস্ট শাসনের সম্পর্কে মোহভঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই নির্বাচনেও বিরোধীদের নির্বাচিত হওয়া আটকাতে নানা কৌশল নিয়েছিল, যেমন, প্রার্থী মনোনয়নের দিন পার হয়ে যাওয়া অবধি বৈধ সংগঠন হিসেবে রুখ-য়ের নিবন্ধীকরণ আটকে রাখা হয়েছিল যাতে তার পক্ষ থেকে কেউ প্রার্থী না হতে পারে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকের সংখ্যা অতি সীমিত রেখে ক্ষমতাসীনদের জন্য কারচুপির সুযোগও করে দেওয়া হয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ব্লক নজরকাড়া সাফল্য পেল। ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রায় ২৫ শতাংশ আসন জিতে নিল গণতান্ত্রিক ব্লক। পশ্চিম ইউক্রেনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হল তারা— গালিসিয়া প্রদেশে ৪৭টির মধ্যে ৪৩টি আসন পেল তারা, কিয়েভ প্রদেশে পেল ২২টির মধ্যে ১৬টি আসন। এমনকি পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ ও ডোনেতস্ক প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও বেশ কিছু আসনে তারা জিতল। কম্যুনিস্ট পার্টি সামগ্রিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেও পার্টির মধ্যে ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা আরও জোরদার হল।

সুপ্রিম সোভিয়েত নির্বাচনের সাথে একই সময়ে আঞ্চলিক প্রশাসনসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গালিসিয়ার আঞ্চলিক প্রশাসনসভা কম্যুনিস্টদের হাতছাড়া হয়ে গণতান্ত্রিক ব্লকের দখলে গেল। আঞ্চলিক স্তরে হলেও এই প্রথম প্রশাসনিক ক্ষমতায় কম্যুনিস্টদের একাধিপত্যে ফাটল দেখা দিল। সোভিয়েত কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি থাকা ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘ ও রুখ-য়ের সামনের সারির সংগঠক ভিয়াদচেস্লাভ চোরনোভিল গালিসিয়া আঞ্চলিক প্রশাসনসভার প্রধান নির্বাচিত হলেন। ল্ভিভ শহরে নয়া প্রশাসনসভার প্রথম বৈঠকে এই প্রশাসনসভা নিজেকে 'স্বাধীনতার দ্বীপ' হিসেবে আখ্যায়িত করে ঘোষণা করল যে 'সর্বাত্মকতাবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে' সে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তার লক্ষ্য হল 'একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ইউক্রেনিয় রাষ্ট্র গঠনের আমাদের জাতির

চিরায়ত অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত করা'। ল্‌ভিভ প্রশাসনসভা নতুন ডিক্রি জারি করে প্রশাসনিক স্তরে সোভিয়েত প্রতীকের বদলে ইউক্রেনিয়ার জাতীয় প্রতীক ব্যবহার শুরু করল, ইউক্রেনিয়ার গ্রিক ক্যাথলিক গির্জাকে সোভিয়েত আমলের নিষিদ্ধকরণ থেকে মুক্ত করে বৈধ ঘোষণা করল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় বহু স্বাধীন অ-কম্যুনিস্ট সংগঠনের আটকে থাকা নথিভুক্তকরণকে সম্পূর্ণ করল এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে 'কম্যুনিস্ট সেল' বন্ধ করে দিল। কিয়েভের কম্যুনিস্ট অধিকারীরা তীব্র ভাষায় এই সমস্ত ডিক্রির নিন্দা করে বলল যে পশ্চিম ইউক্রেনে 'ধ্বংসাত্মক শক্তি ক্ষমতা দখল করেছে'। কিন্তু কম্যুনিস্টদের কথায় কান দেওয়ার লোক ক্রমশ কমছিল। হাজার হাজার সদস্য ইস্তফা দিয়ে পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে পার্টিসদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছিল ৬,২০০ জন, আর ১৯৯০ সালের শেষে ২,৫০,০০০ জনেরও বেশি ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কম্যুনিস্ট যুব শাখা কোমসোমলের ল্‌ভিভ শাখা গোটাটাই ইস্তফা দিয়ে কম্যুনিস্ট-বিরোধী 'ল্‌ভিভ গণতান্ত্রিক যুব সংঘ'-য়ে যোগ দিয়েছিল। রুখ-য়ের সদস্যসংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ছাড়িয়েছিল। ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের মোট ৪৫০ টি আসনের মধ্যে ৩৮৫টি আসনে কম্যুনিস্টরা তাদের প্রার্থীদের জেতাতে পেরেছিল। কিন্তু সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশন বসার সময় দেখা যায় প্রায় কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়া প্রায় ১৫০ জন কম্যুনিস্ট পক্ষ ত্যাগ করেছে, মাত্র ২৩৯ জন সমর্থক নিয়ে কম্যুনিস্টরা দুর্বল ও ভঙ্গুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। উল্টোদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিকরা সুপ্রিম সোভিয়েতের মধ্যেও নিজেদের আরও সংগঠিত ও সংহত করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়া কম্যুনিস্ট আধিকারিক ইভাশকো হঠাৎই ইস্তফা দিলে কম্যুনিস্টরা আরও বিপাকে পড়ে যায়। দেখা যায় যে কম্যুনিস্টদের মধ্য থেকে বড় অংশ পরিস্থিতি সামাল দিতে সুপ্রিম সোভিয়েতের মধ্যে বিরোধীদের সঙ্গে আপসরফা করে চলতে চায়। এই কম্যুনিস্টরা গণতান্ত্রিকীকরণ ও অর্থনৈতিক সংস্কারের স্লোগান তুলে 'গণতান্ত্রিক মঞ্চ' নামে একটা আলাদা মঞ্চ তৈরি করে কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইল। রুখ-য়ের তোলা ইউক্রেনিয়ার সার্বভৌমত্বের স্লোগানও এরা আয়ত্ত করে নিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভে। আগের বছর মস্কোর নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত

হয়নি। ফলে খনিশ্রমিকরা এবার আরও বেপরোয়া, আরও বীতশ্রদ্ধ। ধর্মঘটী শ্রমিকরা এবার দাবি তুলেছে যে ইউক্রেনিয়ার গোটা সরকারকে ইস্তফা দিতে হবে, সমস্ত আঞ্চলিক কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনকে ভেঙে দিতে হবে, কম্যুনিস্ট পার্টির দখলে থাকা সমস্ত সম্পত্তির জাতীয়করণ করতে হবে। কিছু কিছু শ্রমিকগোষ্ঠী ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার দাবিও সমর্থন করছে।

প্রশাসন-আইনসভার গণ্ডির বাইরে সমাজের বিভিন্ন পরিসরে জাতীয় স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সক্রিয়তা বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে রুখ-য়ের উদ্যোগে পশ্চিম ইউক্রেনের চেরনিভতসি গ্রামে বাৎসরিক 'চেরনোভা রুটা' উৎসব শুরু হয়। ইউক্রেনিয় ভাষার শব্দবন্ধ 'চেরনোভা রুটা'-র আক্ষরিক অর্থ 'লাল বিলাপ'। জনপ্রিয় ইউক্রেনিয় সংগীতকার ভোলোদিমির ইভাসিয়ুক (১৯৪৯–১৯৭৯)-য়ের একটি অতি জনপ্রিয় গানের নাম 'চেরনোভা রুটা'। ইউক্রেনিয় ভাষার এই গান ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা গানের পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। পরের বছর ১৯৭২ সালেও ইভাসিয়ুকের ইউক্রেনিয় ভাষার গান 'জলপ্রপাত' সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা গান হয়েছিল। বিপুল জনপ্রিয়তা ইভাসিয়ুককে সোভিয়েত প্রশাসনের রোষ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির পরম্পরা সম্পর্কে মমত্ববোধ তাঁকে সোভিয়েত প্রশাসনের চোখে বিপজ্জনক অপরাধী করে তুলেছিল। ফলে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত গুপ্তপুলিশ কেজিবি ইভাসিয়ুককে খুন করে মরদেহ জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায়। চেরনিভতসি গ্রামই ছিল ইভাসিয়ুকের জন্মভূমি। ইউক্রেনিয়দের চোখে ইভাসিয়ুক শহিদের মর্যাদা পায়— ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার জন্য প্রাণ দেওয়া এক শহিদ। ১৯৮৯ সালে ইভাসিয়ুকের গ্রামে ইভাসিয়ুকের গানের নামে নাম দিয়ে বাৎসরিক উৎসবের সূত্রপাত হল। ইউক্রেনিয় ভাষায় সংগীত রচনা ও পরিবেশন করা শিল্পীরা এখানে জড়ো হলেন। তাঁরা এলেন ইউক্রেনের নানা কোণ থেকে, তাঁরা এলেন সোভিয়েত আমলে দেশান্তরী হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা কানাডার প্রবাসজীবন থেকে। তাঁরা ইউক্রেনিয় ভাষায় গান পরিবেশন করলেন। কোনও বিষয় বেঁধে দেওয়া ছিলনা। কিন্তু একের পর এক গানে উঠে এল ইউক্রেনিয় ভাষাকে অবদমিত করে রাখার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ, উঠে এল রুশিকরণের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নিন্দা ও বিরোধিতা। এ প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির আধিপত্যবাদী ভূমিকার সমালোচনাও উঠে এল। এদুয়ার্দ দ্রাখ গাইলেন 'ভিদ্দাইতে মোভু' (ফিরিয়ে দাও আমাদের ভাষা)। তারাস কুরচিক সাংস্কৃতিক পরম্পরা ধ্বংসের

বেদনা ও পুনরুজ্জীবনের সংকল্প নিয়ে গাইলেন 'মি যাবুলি ভসে' (আমরা সব ভুলে গেছি)। সংগঠকদের উদ্যোগ ছাপিয়ে বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একে ইউক্রেনিয় জাতীয় উৎসবে পরিণত করল।

ইতিহাসচর্চার বন্ধ কপাটও খুলতে শুরু করল। ১৯৯০ সালে ইউক্রেনিয় পাঠকদের কাছে প্রায় ৫০ বছর পর ইউক্রেনিয়ার ইতিহাস নিয়ে হ্রুসেভস্কির ধ্রুপদী কাজ আবার লভ্য হল। হ্রুসেভস্কি ইউক্রেনিয়ার ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করার তাগিদেই বলশেভিকদের সঙ্গে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউক্রেনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়ে দেয় যে তাঁর ১১ খণ্ড ইউক্রেনিয়ার ইতিহাস ছাপার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এরপর তাঁকে নজরবন্দি করে কাজের স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের পর থেকে সোভিয়েত-সংস্করণ ইতিহাস যখন থেকে জার আমলের উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যানকেই মান্যতা দেয়, তখন থেকে হ্রুসেভস্কিকে কখনও পোলদের এজেন্ট, কখনও অস্ট্রিয়ার এজেন্ট, আবার কখনও বা জার্মানদের এজেন্ট বলে খাড়া করা হয়, যখন যে সোভিয়েত নেতাদের চোখে প্রধান শত্রু সেই অনুযায়ী। হ্রুসেভস্কির কোনও লেখা কারও কাছে পাওয়া গেলে রাষ্ট্রবিরোধী কুচক্রী হিসেবে তার সোভিয়েত কারাগারে অন্তরীণ হওয়া নিশ্চিত ছিল। ১৯৮৮ সাল থেকেই ইউক্রেনিয় স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনের জোয়ারের টান হ্রুসেভস্কির প্রত্যাবর্তনের পরিসর তৈরি করছিল। ইউক্রেনিয়ার ইতিহাসের রুশ আধিপত্যবাদী বিকৃতি প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় অতীত পুনরুদ্ধারের তাগিদ হ্রুসেভস্কির কাজকে আবারও জাতীয় গুরুত্বের বলে হাজির করে দিয়েছিল। ১৯৯০ সালে প্রশাসনিক ক্ষমতার উপর কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ যখন আলগা হল, ইউক্রেনিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমির গ্রন্থাগারে হ্রুসেভস্কির ইউক্রেনিয়ার ইতিহাসের পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণ ও হ্রুসেভস্কির অন্যান্য পাণ্ডুলিপি আবার সাধারণ পাঠকের জন্য উন্মুক্ত হল। প্রায় ৫০ বছর ধরে এগুলোকে সাধারণের নাগালের বাইরে 'স্পেতসফুন্ডি'-র মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। 'স্পেতসফুন্ডি' মানে বিদেশি লেখাপত্রের বিপজ্জনক ভাণ্ডার যা কেবল কম্যুনিস্ট পার্টির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাই প্রয়োজনে দেখতে পারতেন। ১৯৯০ সালেই ইউক্রেনিয়ার বইয়ের বাজারে হ্রুসেভস্কির প্রবন্ধ, ডায়েরি ইত্যাদি নবমুদ্রিত আকারে লভ্য হতে শুরু করল, সাধারণ পাঠকরাও উৎসাহের সঙ্গে তা সংগ্রহ করতে লাগল। এরপর ১৯৯১ সালে কিয়েভের 'নাউকোভা দুমকা' প্রকাশনা থেকে হ্রুসেভস্কির ১১ খণ্ড ইউক্রেনের ইতিহাসের

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। ফ্রসেভস্কির বিপুল গবেষণা-কাজে উন্মুক্ত হওয়া বিভিন্ন সূত্র ধরে সুব্যবস্থিত নয়া গবেষণাকর্মের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে এলেন একদল নতুন গবেষক। একইসঙ্গে স্তালিনিয় সন্ত্রাসের চেপে রাখা ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়, বিশেষ করে ১৯৩৩ সালের দুর্ভিক্ষ-গণহত্যা ও গুলাগ নিয়ে ইতিহাসরচনার উদ্যোগও শুরু হল।

২৮

ইউক্রেনের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৯০ সালে ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান হলেন লিওনিদ ক্রাভচুক। তিনি যে আর এখন ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী দাবি ও প্রতীকের মধ্যে 'নোংরা, রক্তাক্ত' প্রতিক্রিয়াশীলতা খুঁজে পান না তা আমরা আগেই দেখেছি। পরিস্থিতির জল মেপে ধূর্ত ক্রাভচুক বুঝেছিলেন যে ক্ষমতার রশি হাতে রাখতে গেলে কম্যুনিস্ট মতবাদিক গোঁড়ামি বজায় রাখার চেয়ে গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধিকারের স্লোগান করায়ত্ত করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই অনুযায়ী তিনি 'গণতান্ত্রিক ব্লক'-য়ের নেতা হয়ে উঠেছিলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিলেন। ইউক্রেনিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির নয়া প্রধান স্তানিস্লাভ হুরেঙ্কো ১৯৯০ সালের অক্টোবরে বলেছিলেন যে 'ক্রাভচুক নামমাত্রেই এখনও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য রয়েছেন'।

ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের মধ্যে ইউক্রেনিয়ার সার্বভৌমত্বের পক্ষে মত জড়ো হওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবনতা কম্যুনিস্টদের হাত থেকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিল। ১৯৯০ সালের ১৬ই জুলাই ইউক্রেনিয় সার্বভৌমত্বের ঘোষণা নিয়ে ভোটাভুটিতে পক্ষে ৩৫৫ টি ও বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট পড়ল। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হল। এর ১ মাস আগেই রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতও বরিস ইয়েলতসিনের নেতৃত্বে একইভাবে সার্বভৌমত্ব ঘোষণাা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই এর ফলে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে গেল। ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের সার্বভৌমত্ব ঘোষণায় ১৯৮৯-য়ের রুখ-য়ের প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাবিত স্বাধিকার ভাবনার অনেকগুলোকেই গ্রহণ করে নেওয়া হল। যেমন, ঘোষণা করা হল যে ইউক্রেন অর্থনৈতিক স্বশাসন প্রয়োগ করছে, দরকার বোধ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে পৃথক মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রচলনের অধিকার তার আছে

এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে পৃথক সেনাদল গড়ে তোলার অধিকারও তার আছে। এতৎসত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি, ঘোষণায় বারবারই ইউক্রেনিয়াকে 'ইউক্রেনিয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রুখ-য়ের সদস্য ও মিত্ররা একে পূর্ণ স্বাধীনতা অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেখছিল, অন্যদিকে কম্যুনিস্ট-ঘনিষ্ঠরা একে সংস্কারের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে চাইছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে কিয়েভের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট আধিকারিকরা নিজেদের ক্ষমতার ক্ষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতার চরমে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং মরীয়াভাবে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আঁটো করে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতায় লাগাম পড়াতে উদ্যোগী হলেন। কিয়েভের আইনসভা ভবনের ধারেপাশে যে কোনও রকম বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হল, বিরোধী নেতা বা মুখপত্রদের দূরদর্শনে হাজির হওয়ার সুযোগ সীমায়িত করা হল এবং আঞ্চলিক প্রশাসনসভাগুলোর অধিকার কাটছাঁট করতে নতুন আইন আনা হল। কিয়েভ শহরের উপান্তে বিপুল সেনাবাহিনী জড়ো করা হল। সুপ্রিম সোভিয়েতে নির্বাচিত জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধি স্তেফান ক্ষারা-কে বানানো অভিযোগে গ্রেফতার করা হল। আশঙ্কা তৈরি হল যে সদ্যঘোষিত ইউক্রেনিয়ার সার্বভৌমত্বের সনদ যাতে কার্যকরী না হতে পারে, তার জন্যই এই কম্যুনিস্ট প্রতিআক্রমণ। ১৯৯০-য়ের শরৎ জুড়ে টানাপোড়েন বেড়ে চলল। এই অবস্থায় নির্ধারক ভূমিকা নিল ইউক্রেন জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের স্বতক্রিয়া। অক্টোবরের গোড়ায় কিয়েভের বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা শহরমাঝের খোলা জায়গা 'ময়দান'-য়ের দখল নিয়ে নেয়, একাধিক তাঁবু তৈরি করে তার মধ্যে অবস্থান করে ভুখা হরতাল শুরু করে। তাদের দাবি ছিল, ইউক্রেনিয়ার সার্বভৌমত্বের ঘোষণাকে কার্যকরী করতে হবে, কম্যুনিস্ট পার্টির আধিপত্য ঘুচিয়ে গণতান্ত্রিকীকরণ ও অর্থনৈতিক সংস্কার অবিলম্বে লাগু করতে হবে। এর অভিঘাতে গোটা ইউক্রেনিয়া জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা একই দাবিতে ছাত্র-ধর্মঘট শুরু করে। ১৬ই অক্টোবর ছাত্রদের সমর্থনে দেড় লাখ মানুষ জমায়েত হয় কিয়েভে এবং তাদের দাবি নিয়ে আইনসভা ভবনের দিকে মিছিল করে এগোতে থাকে। ছাত্র, শ্রমিক, প্রাক্তন সেনা, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী বিভিন্ন স্তরের মানুষ মিলেমিশে ছিল সেই মিছিলে। বেতার ও দূরদর্শনে এই মিছিল ও তার দাবি সম্প্রচারিত হয়। কিন্তু সরকারের কম্যুনিস্ট শীর্ষ আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসতে অস্বীকার

করে। এর দুই দিন পর, ১৮ই অক্টোবর কিয়েভের অস্ত্র তৈরি কারখানার শ্রমিকদের বড় অংশ ছাত্রদের অবস্থানে যোগ দেয় এবং ক্রমপ্রসারমান আন্দোলনে লাগাম পরাতে ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট প্রধানমন্ত্রী ভিতালি মাসোল পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভিতোল্ড ফোকিন আন্দোলনকারীদের দাবিমতো সংস্কার প্রক্রিয়া চালানোর প্রতিশ্রুতি দিলে ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়, 'ময়দান' থেকে ছাত্ররা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে।

ভিতোল্ড ফোকিনের দেওয়া অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিই কার্যকর হয়নি। বিশেষত, আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দেওযা হয়েছিল যে কম্যুনিস্ট পার্টির 'নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা'-র (যার অজুহাতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তার মনোনীত ব্যক্তি অনির্বাচিত ভাবেই জায়গা করে নিত) বিলোপ ঘটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্ত সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত করার কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৯০ সালের শেষে এসে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কম্যুনিস্ট পার্টির মুঠি থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মস্কোর কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে ইউক্রেনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অবধি সেই বদল গড়াবে কিনা তা তখনও স্পষ্ট হয়নি। ১৯৯০-য়ের অক্টোবরে তার দ্বিতীয় অধিবেশনে রুখ সরাসরি পূর্ণ স্বাধীনতাকেই আশু দাবি হিসেবে তুলে ধরে। রুখ-য়ের মূল প্রভাব-অঞ্চল পশ্চিম ইউক্রেনের গালিসিয়া ও সংলগ্ন প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘিরে নাগরিক মিছিল-সভা ও বহুবিধ কার্যক্রম-জোটবন্ধনের সক্রিয়তা জীবন্ত ছিল। কিন্তু পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ, নিপরোপেত্রোভস্ক, জাপোরিজীয়া ও কিরোভোহ্রদ-য়ে নাগরিক সক্রিয়তার এই প্রাণ ছিলনা। সেসব অঞ্চলে রুখ-য়ের থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙে আসা 'গণতান্ত্রিক মঞ্চের' প্রভাব বেশি। গণতান্ত্রিক মঞ্চ পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে তখনও কিছুটা ধোঁয়াশা বজায় রেখেছিল, জাতীয় পরিচয়ের ব্যাপারে ইউক্রেনিয় জাতিপরিচয়ের বিকল্প হিসাবে সোভিয়েত জাতিপরিচয় নির্মাণের প্রবমতাও দেখা যাচ্ছিল। ফলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাকি পুনর্গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন— এই দোলাচল ঘোচেনি। ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের সামাাজিক পরিসর অবশ্য সাধারণভাবে প্রসারিত হচ্ছিল। সরকারি ক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় ভাষা স্থান করে নিতে শুরু করেছিল। ইউক্রেনিয় ভাষা থেকে রুশ ভাষায় সরণ ঘটে যাওয়া পরিবারের নতুন প্রজন্ম বিদ্যালয়ে আবার

ইউক্রেনিয় ভাষা শিখতে শুরু করেছিল। স্বয়ং ক্রাভচুক কথাবার্তা ও জনসভার বক্তৃতায় ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।

সোভিয়েত শীর্ষনেতা গর্বাচেভের পরিকল্পনা ছিল নতুন চুক্তিসাধনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্নবীকরণ ঘটানো। কিন্তু ১৯৯১-য়ের গোড়া থেকেই তার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। ১৯৯১-য়ের মার্চ মাসে একটা গণভোটের আয়োজন করা হয়। গণভোটের বিষয় ছিল: 'সমমর্যাদাসম্পন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠন সমর্থন করছ কি?' লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া, মোলদোভা, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া এই ভোটে অংশ নিতেই অস্বীকার করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অনড় থাকে। পশ্চিম ইউক্রেনের গালিসিয়া প্রদেশের নাগরিক সংগঠনগুলো এই ভোট বয়কট করে ইউক্রেনিয়ায় বিকল্প প্রশ্নে গণভোটের প্রস্তাব দেয়, সেই বিকল্প প্রশ্ন হল: 'তুমি কি চাও যে ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র হোক?' ক্রাভচুক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সোভিয়েত কর্তাদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে ইউক্রেনের গণভোটের ব্যালটে পরিবর্তিত আকারে প্রশ্নটিকে হাজির করলেন: 'ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ঘোষণার নীতির উপর দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের সোভিয়েত সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রসংঘে যোগদান কি তুমি সমর্থন কর?' ইউক্রেনের গণভোটে ৮০ শতাংশের বেশি ভোটার অংশগ্রহণ করেছিল। গালিসিয়া প্রদেশে ৮৮ শতাংশ ভোটার গর্বাচেভ ও ক্রাভচুকের সূত্রায়িত প্রশ্নে না বলে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়েছিল। অন্যত্র ৮০.২ শতাংশ ভোটার ক্রাভচুকের সূত্রায়িত প্রশ্নে সম্মতি জানিয়েছিল। ইউক্রেন ছাড়া অন্য যে ৮টি সোভিয়েত প্রদেশে (ভোট বয়কট হওয়া ৬টি প্রদেশ বাদ দিয়ে) ভোট হয়েছিল সেখানকার ৭০.৫ শতাংশ গর্বাচেভের প্রশ্নে সায় দিয়েছিল। এর উপর দাঁড়িয়ে গর্বাচেভ ৯টি সবল প্রজাতন্ত্র ও রাষ্ট্রসংঘ হিসেবে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব আনেন। ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রতিনিধি হিসেবে ক্রাভচুক তা পত্রপাঠ খারিজ করেন, তিনি বলেন যে দুর্বল বা সবল কোনও কেন্দ্রীয় সরকারেরই দরকার নেই। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘ তাহলে কীভাবে সংগঠিত হবে সে প্রশ্ন অসমাধিতই থেকে যায়।

১৯৯১ সালের বসন্তে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিম ইউক্রেনের গালিসিয়ায় ইউক্রেনের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবিতে নাগরিক বিক্ষোভ গণভোটের পর থেকেই একটানা চলছিল। ইতিমধ্যে পূর্ব ইউক্রেনে খনি শ্রমিকরা আবার ধর্মঘট শুরু করল। ধর্মঘটী শ্রমিকরা এবার সরাসরি গর্বাচেভের

পদত্যাগ ও ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের ঘোষণাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলল। ক্রাভচুক পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন এই বলে যে পুরানো সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, তিনি চান যে ইউক্রেন সার্বভৌম রাষ্ট্রদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের অংশ হোক। কিন্তু তা কাজে এল না। ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘ থেকে উদ্ভূত ইউক্রেনিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি ও অন্যান্য ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী পার্টি ঘোষণা করল যে নতুন কোনও রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি সই হলে তারা দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটের পথে হাঁটবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা হুঁশিয়ারি দিল যে তাহলে তারাও আবার ভুখা হরতাল শুরু করবে। ক্রাভচুক ও তার পার্ষদরা নয়া রাষ্ট্রসংঘের প্রশ্ন মুলতুবি রেখে ইউক্রেনে একটি রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রীক কেন্দ্রীভূত সরকারের কাঠামো তৈরিতে মন দিলেন, সমস্ত কারখানা ও উৎপাদনশিল্পের উপর ইউক্রেনের সরকারের মালিকানা ঘোষণা করলেন এবং ইউক্রেনের জাতীয় ব্যাঙ্ক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করলেন যাতে ইউক্রেনের পৃথক মুদ্রা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ইউক্রেনের, বিশেষত পূর্ব ইউক্রেনের, রুশ জাতিপরিচয়ের মানুষরা এতে শঙ্কিত হয়ে উঠল যে ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার দিকে যাচ্ছে, যা হলে তাদের স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষতি হবে। তাই তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকিয়ে রাখার পক্ষে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টা তেমন করে দানা বাঁধতে পারেনি। ইতিমধ্যে মস্কোর ক্ষমতাকেন্দ্রে চকিত পটপরিবর্তন সবকিছু টালমাটাল করে দিল।

১৯৯১-য়ের ২০শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নতুন রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি সই হওয়ার কথা ছিল। ইউক্রেনের পরিস্থিতি বিচার করে ক্রাভচুক আপাতত সেই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে রক্ষণশীল অংশ এভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান মেনে নেওয়ার বিরোধী ছিল। এই রক্ষণশীল অংশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৯ শে আগস্ট ক্যু সংগঠিত করে মস্কোয় ক্ষমতাদখল করে জরুরী অবস্থাকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ঘোষণা করে। কৃষ্ণসাগরের কূলে তখন ছুটি কাটাচ্ছিলেন গর্বাচেভ। তাঁকে সেখানেই গৃহবন্দি করা হয়। রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রধান ইয়েলতসিন গ্রেফতারি এড়িয়ে মস্কোর সংসদভবনের সামনে সমস্ত গণতন্ত্রকামী ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী মানুষকে জড়ো হতে আহ্বান করেন। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হয়। চূড়ান্ত টানাপোড়েনের মধ্যে ট্যাঙ্কারবাহিনী ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে সমবেত জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। সেনাবাহিনীর বড় অংশ ইয়েলতসিনের পাশে দাঁড়ায়। ক্যু-য়ের

মধ্য দিয়ে ক্ষমতাদখলের চেষ্টা ভেঙে পড়ে। ইয়েলতসিনের হাতে ক্ষমতা আসে। ক্ষমতায় এসে ইয়েলতসিন রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে সাধারণ বীতশ্রদ্ধা তখন এতই সর্বব্যাপ্ত যে ইয়েলতসিনের এই সিদ্ধান্ত কোনও বিরোধিতার মুখে পড়েনি।

এই ক্যু-প্রচেষ্টার সময় ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা স্তানিস্লাভ হুরেঙ্কো ক্যু করে ক্ষমতাদখলকারীদের সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে ক্রাভচুক অবস্থান নির্দিষ্ট না করে পরিস্থিতিকে থিতোতে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার অবস্থান নিয়েছিলেন। ক্যু-য়ের ব্যর্থতা ও রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর ইউক্রেনে কম্যুনিস্ট রক্ষণশীলদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সংখ্যা আরও বাড়ল। সুযোগ বুঝে রুখ ইউক্রেনের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ভোটের জন্য চাপ তৈরি করল। ক্যু ব্যর্থ হওয়ার তিন দিন পর ১৯৯১-য়ের ২৪শে আগস্ট ইউক্রেনিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েতে ইউক্রেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার উপর ভোট হল। রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে যাওয়া কম্যুনিস্ট পার্টি রাশিয়ার মতো নিষিদ্ধকরণ এড়াতে সংঘাত এড়িয়ে চলার কৌশল নিয়ে সেই ঘোষণার পক্ষে ভোট দিল। ৩৪৬ টি ভোট পক্ষে পড়ল, মাত্র ১ টি ভোট পড়ল বিপক্ষে। তারপর ৩০ শে আগস্ট ইউক্রেনেও কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল। কম্যুনিস্ট সদস্যরা তাঁদের সুপ্রিম সোভিয়েতের পদ ধরে রেখে 'সমাজতান্ত্রিক পার্টি' নামে নতুন পার্টি তৈরি করল। জরুরী অবস্থা কালীন বিশেষ ক্ষমতা ক্রাভচুকের হাতে ন্যস্ত হল। ইউক্রেনিয় সংসদের ডেপুটি-চেয়ারম্যান ভোলোদিমির হ্রিনভ তাঁর বক্তব্যে সতর্ক করে বললেন:

> ইউক্রেনের স্বাধীনতার বিপক্ষে আমি নই। কিন্তু কেবল এই স্বাধীনতার বিধি আইন করেই যদি আমরা ভাবি সব হয়ে গেল তাহলে তা ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে। ইউক্রেনকে অ-কম্যুনিস্টকরণ করার সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্তে না এলে এই স্বাধীনতার বিধি কেবলমাত্র একটুকরো কাগজ হয়েই থাকবে। ইউক্রেনে একটি সর্বাত্মকতাবাদী কম্যুনিস্ট সমাজ গড়ে তোলা হয়েছে, ইউক্রেনের সেই সর্বাত্মকতাবাদী সমাজকে ভেঙে ধ্বংস করে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়সমূহের কেবলমাত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এমন অংশ হিসেবে এই বিধিকে আইনরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি।

সুপ্রিম সোভিয়েতে ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে গৃহিত এই স্বাধীনতার বিধি ইউক্রেনের জনগণের আকাঙ্খাকে কতটা প্রতিনিধিত্ব করছিল ? ১৯৯১ সালের ১লা ডিসেম্বর হওয়া গণভোট তার জবাব দিল। এই ভোটে ইউক্রেনিয়ার নাগরিকরা

ইউক্রেনের স্বাধীনতার পক্ষে যেমন ভোট দিয়েছিল, একই সঙ্গে স্বাধীন ইউক্রেনের প্রথম রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করেছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মূল লড়াই হয়েছিল গণতান্ত্রিক মঞ্চের ক্রাভচুকের সঙ্গে রুখ-য়ের চোরনোভিল-য়ের। সেই নির্বাচনের ফল হয়েছিল এইরকম:

১৯৯১ সালের ১লা ডিসেম্বর ইউক্রেনিয়া নির্বাচনের ফল

অঞ্চল	স্বাধীনতার পক্ষে (মোট ভোটের শতাংশ হিসেবে)	ক্রাভচুকের পক্ষে (মোট ভোটের শতাংশ হিসেবে)	চোরনোভিলের পক্ষে (মোট ভোটের শতাংশ হিসেবে)
পশ্চিম	৯৭	৩৭	৫০
মধ্য	৯৫	৬৯	১৭
পূর্ব	৮৮	৭১	১৩
দক্ষিণ	৮৭	৭১	১৪
ক্রিমিয়া	৫৪	৫৪	৫
সর্বমোট	৯০	৬২	২৩

(সূত্র: পল কুবিচেক, দি হিস্ট্রি অফ ইউক্রেন, গ্রিনউড প্রেস, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৩৭।)

দেখা যাচ্ছে যে ক্রিমিয়া ছাড়া বাকি সমস্ত অঞ্চলেই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতাকে সমর্থন করছে, ক্রিমিয়াতেও অর্ধেকের বেশি মানুষ সমর্থন করছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল দেখায় যে পশ্চিম ইউক্রেন ছাড়া বাকি অংশে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত করার ব্যাপারে রুখ-য়ের চেয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙে বেরিয়ে আসা পোক্ত আধিকারিকদের উপরই আস্থা রাখছে বেশি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ১ সপ্তাহ পর ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিম বেলারুশে ব্রেজনেভের পুরানো প্রমোদগৃহে তিন নেতা মিলিত হল— রাশিয়ার বরিস ইয়েলতসিন, ইউক্রেনিয়ার লিওনিদ ক্রাভচুক আর বেলারুশের স্তানিস্লাভ সুসকেভিচ। গোটা রাত জুড়ে ভারী মদ্যপানের প্রমোদাবকাশ কাটিয়ে ভোরে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে তাঁদের তিনটি প্রজাতন্ত্রই যেহেতু ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পত্তনে পত্তনকারীর ভূমিকা নিয়েছিল, তাই তা ভেঙে দেওয়ারও অধিকার তাঁদের আছে, সেই অধিকার প্রয়োগ করে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের অবসান ঘটাচ্ছেন। তার পরিবর্তে তাঁরা 'কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট' নামের একটা জোট প্রস্তাব করছেন যা সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রসুরক্ষা সংক্রান্ত

সম্পর্ক-সহযোগিতা বজায় রাখার কাজ করবে। এই জোট সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কোনও কাঠামো নয়, স্বেচ্ছায় যে চাইবে সেই এখানে অংশগ্রহণ করবে বলে বলা হল। এই ঘোষণার সূত্র ধরে ১৯৯১ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর সরকারিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান হল। ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র হল।

২৯

লাল জামা গায়, নীল-হলুদ জামা গায়

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনের আবির্ভাবের এই পালাবদলে কতটা বদল হল, কী বদল হল? নাকি কেবলই রাজাদের গায়ের জামার রঙ বদলাল? এখন সেটাই বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সদ্য অস্ত যাওয়া সোভিয়েত শাসনে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল কম্যুনিস্ট 'অ্যাপারাতচিক'-দের হাতে। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের দ্বারা নিযুক্ত এবং পার্টি-আমলাতন্ত্র-গোয়েন্দাবাহিনী-সেনা নিয়ে গঠিত শাসনযন্ত্রের পরিচালক-ব্যবস্থাপক এই কম্যুনিস্ট অ্যাপারাতচিকরা ছিলেন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠক-পরিচালক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ও সমবায়ের নিয়ন্ত্রক কর্তা। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকারের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এরা ছিল খড়্গহস্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের লগ্নে এই অ্যাপারাতচিকদের ভোলবদল হয়ে ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে দেখা যায়। ক্রাভচুক ও তাঁর সঙ্গীরা 'জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় গর্বাচেভ-বিরোধী অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান খুঁটি ভেঙে পড়ে। জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্টরা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক পরিচিতি গড়ায় নজর দেয় ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকারের দাবিদারদের সঙ্গে একটা আপস-বোঝাপড়ার জায়গা তৈরি করার মধ্য দিয়ে। ক্রাভচুকের নেতৃত্বাধীন এই 'জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট'-দের মোড়কে জড়ো হয়েছিল এতদকালীন কমুনিস্ট অ্যাপারাতচিকরা, ভারী শিল্প-কারখানার ও রাষ্ট্রীয় সমবায়ের কর্তারা, ভূতপূর্ব সোভিয়েত সেনার আধিকারিকরা, এককথায়, সোভিয়েত ইউক্রেনের সুবিধাভোগী 'এলিট'-রা।

ইউক্রেনের ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকারের দাবিদাররা সোভিয়েত শাসন পতনের মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপস-বোঝাপড়ায় তারাও উৎসাহী ছিল। 'নয়া ইউক্রেন' নামধারী তাদের সংযুক্ত মঞ্চের নেতা ভোলোদিমির ফিলেঙ্কো পরবর্তীকালে তাঁদের সেই সময়কার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'একটা সময় ছিল যখন স্বাধীন ইউক্রেন অর্জনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির অ্যাপারাতচিকদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে রাখতে আমরা বাধ্য ছিলাম'। (তারাস কুজিও রচিত রুটলেজ দ্বারা ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'ইউক্রেন: স্টেট অ্যান্ড নেশন বিল্ডিং' বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) ফলে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইউক্রেনিয় ভাষার প্রসার, সরকারি কাজে ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের প্রসার, প্রকাশনাক্ষেত্রে ইউক্রেনিয় ভাষার সামনে বন্ধ করে রাখা দরজাকে খুলে দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় চিহ্ন হিসেবে বিভিন্ন ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী চিহ্নকে (যেমন, নীল-হলুদ জাতীয় পতাকা, কিয়েভিয় রুস-য়ের স্মৃতিবাহী ত্রিশূলচিহ্ন, ইত্যাদি) গ্রহণ করা— এসবের বিনিময়ে তারা আপাতত কম্যুনিস্ট অ্যাপারাতচিকদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে রাখতে সম্মত ছিল কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে নইলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে ইউক্রেনও ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। পশ্চিম ইউক্রেনে ছিল ইউক্রেনিয় জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের জনভিত্তি, আবার পূর্ব ইউক্রেনে রুশ জনজাতীয় মানুষ অধ্যুষিত অঞ্চলে ছিল রুশ প্রাধান্য সমেত সোভিয়েত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ধরে রাখার ঝোঁক। এই দুই অংশকেই একসঙ্গে নিয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার অভিপ্রায় 'নয়া ইউক্রেন'-পন্থীদের ঠেলে দিয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে। এই অবস্থান থেকে তারা ইউক্রেনিয় সমাজের জনস্তর থেকে বিদ্রোহ সংগঠিত করে স্বাধীনতা-স্বাধিকার অর্জনের পথ ত্যাগ করেছিল, আপস-সমঝোতা করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিজ্ঞ অ্যাপারাতচিকদের হাতেই ক্ষমতার রশি রেখে দেওয়ার পথ নিয়েছিল।

১৯৯২ সালে স্বাধীন ইউক্রেন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্রাভচুক জয়ী হলেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রুখ-য়ের প্রার্থী ভিয়াচেস্লাভ চোরনোভিলকে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটে পিছনে ফেলে। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে ক্রাভচুক প্রত্যক্ষভাবে নতুন কোনও পার্টি তৈরি করেন নি, তবে তাঁকে ঘিরে জোট বাঁধা প্রাক্তন অ্যাপারাতচিকদের দল ক্রমশ 'ক্ষমতার পার্টি'('পার্টি অফ পাওয়ার' বা

'পার্টিয়া ভ্লাদা') নামে এক অঘোষিত পার্টি রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। দেশীয় পরিস্থিতি বিষয়ে ক্রাভচুকের পরামর্শদাতা হিসেবে একসময় কাজ করা মিখাইলচেঙ্কো বলেছিলেন, আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে ১৯৮৯-৯১ সালে ক্রাভচুক "ইউক্রেনিয় দেশপ্রেমিক" হয়ে উঠেছিল, নাহলে অবসরভাতার দিন আসা অবধি সে একজন কম্যুনিস্ট পার্টির গড়পড়তা নোমেনক্লাতুরনিক (পার্টি-নিযুক্ত অধিকারী)-ই থেকে যেত।' (তারাস কুজিও রচিত রুটলেজ দ্বারা ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'ইউক্রেন: স্টেট অ্যান্ড নেশন বিল্ডিং' বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) ক্রাভচুকের এই রূপান্তর ছিল নজর টেনে নেওয়ার মতো। কথোপকথন ও বক্তৃতায় তিনি ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন এবং তা নিয়ে প্রকাশ্যে গর্ব করতেন, ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসার করার কাজে নিয়োজিত 'তারাস শেভচেঙ্কো সোসাইটি'-র মতো একাধিক সভাসমিতির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। ক্রাভচুকের 'ক্ষমতার পার্টি' এবং জাতীয় স্বাধিকারপন্থী গণতন্ত্রী ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে স্বাধীন ইউক্রেন গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে যুদ্ধবিরতি ও সমঝোতা হয়েছিল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ইউক্রেনিয় ভাষার পৃষ্ঠপোষণা। অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল। তা হল 'দেরঝাভা'-র প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ঐকমত্য। পরম্পরাগত ইউক্রেনিয় গ্রামসমাজে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ সমাজনেতাকে 'দেরঝাভা' বলা হত। কমরেড, প্রেসিডেন্ট, কমিশার, সেক্রেটারি ইত্যাদিকে সরিয়ে রেখে এই 'দেরঝাভা' শব্দটিকে আবার ফিরিয়ে আনাও প্রাক-সোভিয়েত ইউক্রেনের ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার ঝোঁককে প্রকাশ করে। 'দেরঝাভা' বলতে তখন বোঝানো হয়েছিল একজন শক্ত হাতের নেতার কথা যিনি 'জাতীয় আত্মিক পুনর্জাগরণের' জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, জাতীয় সচেতনতাকে বিকশিত করে জাতি গড়ার কাজ পরিচালনা করবেন, সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থকে ক্ষুদ্র করে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। ক্রাভচুক ও তাঁর অঘোষিত 'ক্ষমতার পার্টির' সঙ্গীরা নিজেদের এই 'দেরঝাভা' হিসেবে হাজির করলেন ও নয়া পোষাকে শাসনযন্ত্রের উপর দখল কায়েম রাখলেন।

নয়া অবতারে শাসনের এই পর্বে প্রথমেই ক্রাভচুক ইউক্রেনিয় জাতীয়তাকে স্বীকৃতি দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিলেন। সরকারি কাজে ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইউক্রেনিয় ভাষার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য আইন হল। নীল-হলুদ ইউক্রেনিয় পতাকা রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্যাদা পেল। কিয়েভিয় রুস-য়ের স্মৃতিবাহী ত্রিশূল চিহ্ন রাষ্ট্রীয় প্রতীকে স্থান পেল। হ্রুসেভস্কির ধারা অবলম্বন করে

ইউক্রেনিয়ার জাতীয় ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ্যবই লেখা হল যেখানে কিয়েভিয় রুস-য়ের উপর উত্তরাধিকার-অধিকার দাবি থেকে শুরু করে ইউক্রেনিয় কসাকদের স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা স্থান পেল। রুশ অর্থোডক্স চার্চের বদলে কিয়েভ প্যাট্রিয়ার্কেট-য়ের ইউক্রেনিয় অর্থোডক্স চার্চের পিছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা সামিল করা হল। এই সমস্ত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ক্রাভচুক ও তাঁর 'ক্ষমতার পার্টি'-র দোসররা যেমন পশ্চিম ইউক্রেনের শক্তিশালী ইউক্রেনিয় জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের গণভিত্তিকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, তেমনই রাশিয়ার থেকে নিজরাষ্ট্রের পৃথকত্বকেও সামনে নিয়ে আসতে চাইল।

রাশিয়ার সঙ্গে তখন নবসংগঠিত ইউক্রেন রাষ্ট্রের দরকষাকষি শুরু হয়েছিল সোভিয়েত সেনা ও সমরাস্ত্রের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে। জট পেকেছিল ইউক্রেন-ভুক্ত ক্রিমিয়ায় সোভিয়েত সেনার পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্রের গুদাম ও প্রক্ষেপনকেন্দ্রগুলো নিয়ে। রাশিয়ার দাবি ছিল যে সে সব ইউক্রেনকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ইউক্রেন তার বিনিময়ে দাবি করছিল বড় পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়া তা ব্যবহার করবে না এই মর্মে লিখিত চুক্তি।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'ক্ষমতার পার্টি'-র কুশীলবরা নিজেদের ক্ষমতাকে আরও সংহত করার পথ নিয়েছিল। কম্যুনিস্ট অ্যাপারাতচিক রূপে সোভিয়েত আমলে তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা, খনি ও কৃষি সমবায়গুলোর পার্টি-নিযুক্ত হর্তা-কর্তা-বিধাতা, এখন তাঁরা সেগুলোকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অর্থসম্পদ আহরণের কলে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন। শিল্পকারখানা, খনি ও কৃষিসমবায়গুলোকে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর মালিকানাধীন সংস্থায় পরিণত করা, রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর দখলে থাকা কৃষিজমির সিংহভাগ বিক্রির জন্য খুলে দেওয়ার আইন করা হল। সেই আইনের সুযোগ নিয়ে এই ভূতপূর্ব অ্যাপারাতচিকরা বড় বড় মালিকানা কায়েম করলেন। নবগঠিত রাষ্ট্রের শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়মের অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যদুর্নীতির মধ্য দিয়ে (বিশেষ করে রাশিয়ায় খনিজ রফতানি ও রাশিয়া থেকে পেট্রোলিয়াম নিয়ে ইউরোপিয় বিভিন্ন দেশে আমদানি) বিপুল অর্থ দ্রুত পুঞ্জীভূত করে ফেললেন। পূর্ব ইউক্রেনের শিল্প ও খনি অঞ্চলগুলোয় সেই ব্রেজনেভের আমল থেকেই পার্টি-অ্যাপারাতচিকদের নানা অঞ্চলকেন্দ্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা ক্ষমতাবিন্যাসের টানাপোড়েনে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবদ্ধ ছিল। সেই

ক্ষমতাগোষ্ঠীগুলোই এখন রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও ব্যক্তিগত পুঁজির সম্মিলনে শক্তিশালী ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে দেখা দিল। ইউক্রেনে এরা 'অস্বচ্ছ গোষ্ঠী' ('ওপেক গ্রুপ') বা 'ক্ল্যান' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। পূর্বেকার ভাষিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য (রুশ ভাষা ও কম্যুনিস্ট সংস্কৃতির আধিপত্য) অংশত বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রেখে অর্থনৈতিক অধিপতি হওয়াই ছিল এদের লক্ষ্য। অবশ্য এদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ ছিল এবং দোহনের অতিউৎসাহে কারখানা, খনি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এরা ক্রমশ বেসামাল ও রুগ্ন করে তুলেছিল। তাদের সম্পদ পুঞ্জীভবন ও ভোগের বহরও ইউক্রেনিয়ার সমাজের বৈষম্যকে ক্রমাগত আরও প্রকট করে তুলছিল।

১৯৯২ সালের নভেম্বরে ইউক্রেন রাষ্ট্র তার নিজস্ব অস্থায়ী মুদ্রা 'কার্বোভানেট' ('কুপন' নামেও পরিচিত) চালু করে রাশিয়ার প্রভাবাধীন রুবল ব্যবহারকারী আর্থিক পরিসর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু ইউক্রেনের অর্থনীতিতে ভেঙে পড়ার লক্ষণ ক্রমশ প্রকট হতে থাকায় তার স্থায়ী মুদ্রা হয়ে ওঠা পিছিয়ে যেতে লাগল। পূর্ববর্ণিত দুর্নীতি ও দোহন ছাড়াও ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে স্থিতিশীল বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যর্থতা অর্থনৈতিক সংকটকে যেভাবে গভীর করে তুলছিল তার প্রতিফলন হিসেবেই কার্বোভানেট চরম মূল্যক্ষয়ের মুখে পড়ে মূল্যহীনতার দিকে ধেয়ে চলেছিল।

অঘোষিত 'ক্ষমতার পার্টি'-র ভিতরে ইতিমধ্যে ক্রাভচুকের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী দানা বাঁধতে শুরু করেছিল লিওনিদ কুচমাকে ঘিরে। লিওনিদ কুচমা সোভিয়েত আমলে ছিলেন সোভিয়েত ক্ষেপনাস্ত্র তৈরির কারখানার 'ডিরেক্টর' হিসেবে ক্ষমতাশালী 'রেড ডিরেক্টর'-দের অন্যতম। ১৯৯২-১৯৯৩ সময়কালে ক্রাভচুকের অধীনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এখন তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠল 'ইউক্রেনের শিল্পপতি ও শিল্পোদ্যোগীদের জোট' নামে একটি পার্টি, নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী যা 'এস পি পি ইউ' বলে পরিচিত হল। এই পার্টিতে জড়ো হয়েছিল পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা, যারা পুঁজিবিনিয়োগ ও ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিধি ঝেড়ে-পুঁছে বিদায় করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কনির্মাণ চাইছিল। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রভাববৃদ্ধিও ছিল তাদের অপছন্দ। ১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবার সমাসন্ন হলে এস পি পি ইউ-র পক্ষ থেকে কুচমা প্রার্থী হলেন ক্রাভচুকের বিরুদ্ধে। অর্থনীতির বেহাল অবস্থার দায়

ক্রাভচুকের কাঁধে চেপে বসায় তিনি ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী স্লোগানকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে ও কুচমাকে রুশ-আধিপত্যবাদের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। কুচমা রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল খুব কম। ক্ষমতার পার্টি ও তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলা গণতন্ত্রী বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের সম্পর্কে ব্যাপক মানুষের মোহভঙ্গ-হতাশা হয়ত এর প্রধান কারণ। তাই পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের তুলনায় পশ্চিম ইউক্রেনে ভোটদানের হার ছিল আরও কম।

রাষ্ট্রপতি কুচমা রাশিয়ার হাতে ক্রিমিয়ার কৃষ্ণসাগর কূলের পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করলেন, একাধিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করলেন। অর্থনীতির বেহাল অবস্থা সামাল দিয়ে ১৯৯৬ সালে স্থায়ী ইউক্রেনিয় মুদ্রা 'হ্রিভনিয়া' চালু করলেন এবং সেই বছরেই ইউক্রেন রাষ্ট্রের নতুন সংবিধান গৃহীত হল। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে অবশ্য তিনি সমঝোতার কৌশলই নিলেন। রুশ বা সোভিয়েত শাসনের কোনও ব্যবস্থা বা প্রতীককে ফিরিয়ে না আনার পক্ষে বিপুল জনমতকে উপেক্ষা করার পথ তিনি নেননি। ১৯৯৪ সালে ইউক্রেন জুড়ে সংগঠিত একটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মাত্র ৭.১ শতাংশ এবং সোভিয়েত প্রতীক পুনর্ব্যবহারের পক্ষে মাত্র ৩.২ শতাংশ মানুষ মত দিয়েছে। (তারাস কুজিও রচিত রুটলেজ দ্বারা ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'ইউক্রেন: স্টেট অ্যান্ড নেশন বিল্ডিং' বইয়ের ২২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) সুতরাং নতুন সংবিধান ও নতুন মুদ্রায় ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতীয়তার অধিকার ও প্রতীকগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। ইউক্রেনিয় সংবিধানে ঘোষণা করা হল যে ইউক্রেন হল ইউক্রেনিয় জাতিসত্তার রাষ্ট্র, যেখানে রুশ জাতিসত্তার মানুষরা অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জাতীয় সংগীত হিসেবে ইউক্রেনিয় স্বাধিকার আন্দোলনের গান 'ইউক্রেনিয়া এখনও মরে নি'-কেই স্বীকৃতি দেওয়া হল। 'হ্রিভনিয়া'-র বিভিন্ন মূল্যের নোটে কিয়েভিয় রুস-য়ের মহান ভোলোদিমির, আঠারো শতকের কসাক হেটমান ইভান মাজেপা এবং ইউক্রেনিয় জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ হ্রুসেভস্কি-র ছবি ছাপা হল। কিয়েভিয় রুস-য়ের উত্তরাধিকার বিষয়ে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের দাবিকে মান্যতা দিয়ে 'হ্রিভনিয়া'-য় ছাপা হল: 'জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আমরা ইউক্রেনিয়রা ৫ বছরের শিশু নই, বরং অন্তত ১,০০০ বছরের প্রবীণ'। কৃতী নাগরিকদের জন্য

রাষ্ট্রীয় খেতাবও চালু হল ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদের প্রতীকস্বরূপ ব্যক্তিদের নামে— কিয়েভিয় রুস রাজপুরুষ য়ারোস্লাভ মুদরির নামে খেতাব রাষ্ট্রগঠনে অসাধারণ ভূমিকা নেওয়া ব্যক্তির জন্য এবং কসাক হেটমান বোহদান খেলেমনিতস্কি-র নামে খেতাব ইউক্রেন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীর জন্য। ১৯৯১ সাল অবধি কিয়েভ শহরের যে প্রধান চত্বরে লেনিনের প্রধান মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার স্থানে ইউক্রেনের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারকমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তও সরকারিভাবে গৃহীত হয়। সর্বোপরি, ইউক্রেনিয় ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল।

নতুন সংবিধানে একদিকে ছিল জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে এই সমঝোতা, অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক প্রাধিকার ও ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবনের নকশা। পার্লামেন্ট বা নির্বাচিত আইনসভার উপর রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে কুচমা নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই কারণে আইনসভা-সদস্যরা দীর্ঘদিন সংবিধান গ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে রেখে গৃহীত হওয়ার আগে তার সংস্কার দাবি করছিলেন। কুচমা তখন হুমকি দেন যে গণভোট করিয়ে তিনি এমন আইন পাশ করিয়ে নেবেন যে আইনসভা বা পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে তার অস্তিত্বকেই নাকচ করে দেওয়া হবে। এই হুমকির মুখে আত্মসমর্পণ করে আইনসভা ১৯৯৬-য়ের ২৮-শে জুন সংবিধান গ্রহণে সম্মতি দিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি কুচমা এই সংবিধানের বলে আইনসভা-প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিজের পছন্দমতো বাছার, নিয়োগ করার ও যে কোনও সময় বরখাস্ত করার অধিকারী হন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আধিকারিকদের— যেমন, বিচারপতি, রাষ্ট্রীয় অভিশংসক (স্টেট প্রসিকিউটর), রাষ্ট্রচালিত সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের প্রধান এবং বেসরকারিকরণ দপ্তরের প্রধান— ইচ্ছেমতো বাছা, নিয়োগ করা ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা ন্যস্ত হয় রাষ্ট্রপতির হাতে। এহেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের নির্ধারক পদগুলোতে কুচমা-অনুগামী পূর্ব ইউক্রেনের পুঁজিপতি-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের দখল কায়েম হল যাদের উত্থান সেই সোভিয়েত আমলের অ্যাপারাতচিক ও কম্যুনিস্ট পার্টির আধিকারিকদের মধ্যে থেকেই হয়েছিল। কুচমা ও ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণে তাঁর সঙ্গীদের ক্রমবর্ধমান দাপটে ইউক্রেনে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক, মতপ্রকাশ ও স্বাধীন ক্রিয়ার পরিসর যতটুকু তৈরি হয়েছিল তাও সংকুচিত হতে থাকল। নির্বাচন হত, তবে তা জনমত প্রকাশিত

করার বদলে রাষ্ট্রপতি-মতে জনঅনুমোদনের বৈধতার ছাপ দিয়ে নেওয়ার এক নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক সরকারি কর্মীদের রাষ্ট্রীয় হুমকির মুখে রাখা, যে কোনও বিরোধীকে সত্য-মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়ে নিরস্ত করা, সরকারি কর্মীদের উপর রাষ্ট্রপতির শিবিরের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ বা একধরনের বাধ্যতা তৈরি করা, রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে বিতরিত নির্দেশের মধ্য দিয়ে সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনাকে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, দরকারমতো অর্থ বিলিয়ে ও প্রলোভন ঝুলিয়ে ভোট কেনার উদ্যোগ এবং সর্বশেষে প্রয়োজনমতো ভোটগণনায় কারচুপি — এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনে অনুকূল ফল উৎপাদন করাকে যন্ত্রচালনার মতো মসৃণ করে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার শীর্ষে বসা রাজনৈতিক এলিটরা অবস্থানগত সুবিধা খাটিয়ে ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ পুঞ্জীভবনের কাজ আরও ত্বরান্বিত করেছিল। ফলে ১৯৯০-য়ের দশকের শেষে এসে ইউক্রেনের রাজনীতিচর্চায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রায় নির্মূল হতে বসেছিল। ১৯৯৯ সালে ইউক্রেন জুড়ে হওয়া এক সমীক্ষায় 'ইউক্রেনে কি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে?' প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ১৭ শতাংশ 'হ্যাঁ' উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, আর প্রায় ৯০ শতাংশ দুর্নীতি-স্বজনপোষণকে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছিল। কাছাকাছি সময়ে হওয়া আর একটি সমীক্ষায় প্রায় ৭৬ শতাংশ মত দিয়েছিল যে ইউক্রেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে তারা অসন্তুষ্ট, কিন্তু ৪৭.২ শতাংশ গণতন্ত্রের বিপক্ষে রায় দিয়ে বলেছিল যে পার্লামেন্ট ও নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না এমন এক কড়া ধাঁচের নেতার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়াই দেশের এগোনোর জন্য জরুরী। (পল কুবিচেক রচিত গ্রিনউড প্রেস দ্বারা প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রি অফ ইউক্রেন' বইয়ের ১৪৮-১৪৯ পাতায় উদ্ধৃত) সুতরাং ইউক্রেনে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ দেখাচ্ছিল না, বরং সোভিয়েত আমলের মুষ্টিমেয় কর্তৃক শাসনের চরম কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও প্রসারই অবধারিত বলে মনে হচ্ছিল।

অন্যদিকে শক্তপোক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকা আঞ্চলিক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী অর্থনৈতিক উৎপাদন-বন্টন-বাণিজ্য ব্যবস্থাকে দোহন করে যেভাবে ব্যক্তিগত-পারিবারিক সমৃদ্ধির পিছনে একচোখ হরিণের মতো ছুটছিল তা দেশের অর্থনীতি জুড়ে বিপুল কালোবাজারি ব্যবস্থা (একটি হিসাব মতে সমস্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের ৯০ শতাংশই কালোবাজারে সম্পন্ন হত), উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন ক্ষয়, গণবন্টন ব্যবস্থার ক্রমরুগ্নতা ও বিপুল দুর্নীতি জারি

করেছিল। বেতনভূক বা মজুরিভূক মানুষদের আর্থিক ক্ষমতা ও জীবনধারণের মান তলানির দিকে যাত্রা করেছিল। বেরোজগারির সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। রোজগারের খোঁজে মরীয়া হয়ে দেশ ছেড়ে ইউরোপের অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা ছিল ক্রমবর্ধমান। তার মধ্যে জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো দেশে অদক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া ছেলে-মেয়েরা যেমন আছে, তেমনই বিপুল ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আছে ঘর-গৃহস্থালির কাজ করে নয়তো বেশ্যালয়ে দেহ বেচে যাহোক রোজগার করতে প্রস্তুত মরীয়ার দল। স্বাধীনতা, দেশগঠন, জাতিগঠন নিয়ে স্বপ্নগুলো ক্রমশ বেরঙিন অর্থহীন হয়ে উঠছিল।

অর্থনৈতিক পরিমাপকের বিচারেও ইউক্রেনের ১৯৯০-য়ের দশককে দেখতে গেলে আমরা দেখব:

ইউক্রেনে ১৯৯০-য়ের দশক

অর্থনৈতিক পরিমাপক ▶ বছর ▼	মুদ্রাস্ফীতি (শতাংশ)	জি ডি পি-র পতন	মোট কর্মসংস্থান (১৯৮৯ ভিত্তিবছর ধরে, অর্থাৎ ১৯৮৯-য়ের মোট কর্মসংস্থানকে ১০০ ধরে)
১৯৯১	১৬১	−১১.৬	৯৮.৩
১৯৯২	২৭৩০	−১৩.৭	৯৬.৩
১৯৯৩	১০১৫৫	−১৪.২	৯৪.১
১৯৯৪	৪০১	−২৩.০	৯০.৫
১৯৯৫	১৮২	−১২.২	৯৩.৩
১৯৯৬	৪০	−১০.০	৯১.৩
১৯৯৭	১০	−৩.০	৮৮.৮
১৯৯৮	২০	−১.৯	৮৭.৯
১৯৯৯	১৯	−০.৪	৮৫.৮

সূত্র: ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক অফ রিকন্সট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রদত্ত তথ্য, এ্যান্ডার্স অ্যাসলুন্ড-য়ের 'বিল্ডিং ক্যাপিটালিজম: মার্কেটস অ্যান্ড গভার্নমেন্ট ইন রাশিয়া অ্যান্ড ট্রানজিসনাল ইকনমিজ (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস,২০০১)' থেকে উদ্ধৃত।

উপরের সারণিতে নজর রাখলে দেখা যাবে যে ক্রাভচুক আমলে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ অবধি সময়কালে মুদ্রাস্ফীতি ও জি ডি পি-পতন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল আর একইসঙ্গে কর্মসংস্থান কমছিল। ১৯৯৪-য়ের পর কুচমার আমলে

মুদ্রাস্ফীতি ও জি ডি পি পতনের হার কমলেও তা অব্যাহত ছিল এবং কর্মসংস্থান হ্রাসের তীব্রতায় কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবার সমাসন্ন হল। জীবন-জীবিকার সংকটে জেরবার মানুষের রোষে কুচমার পুনঃনির্বাচিত হওয়া মুশকিল বলে মনে হচ্ছিল। কুচমার বিরোধী প্রার্থী রুখ-য়ের নেতা ভিয়াচেস্লাভ চোরনোভিল-য়ের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন নির্বাচনে কুচমার পরাজয় ঘটিয়ে বদল আনতে পারে এমন প্রত্যাশা গড়ে উঠল। ঠিক সেই সময়েই এক যান দুর্ঘটনায় ভিয়াচেস্লাভ চোরনোভিল প্রাণ হারালেন। অপ্রমাণিত হলেও বড় সংখ্যক ইউক্রেনিয় মনে করে যে কুচমার নির্দেশে এই 'দুর্ঘটনা' সাজানো হয়েছিল প্রতিপক্ষকে সরানোর জন্য। এরপর কুচমা যথারীতি পুনঃনির্বাচিত হলেন।

পুনঃনির্বাচিত কুচমা অর্থনৈতিক ভরাডুবি সামাল দেওয়ার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব প্রধান ভিক্তর ইউসচেঙ্কো-কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন। জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রধান হিসেবে কাজ করার সময় ইউসচেঙ্কো সৎ ও সংস্কারমুখী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সেইসব অর্থনৈতিক সংস্কার লাগু করার উদ্যোগ নিলেন যা গত দশ বছর ধরে কায়েমী স্বার্থের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আটকে রেখেছিল। রাশিয়া থেকে আমদানি করা জ্বালানি তেল ও গ্যাস নিয়ে বেআইনি পুনঃরপ্তানির চক্র, যা ছিল কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীগুলোর কালো টাকা জমানোর সবচেয়ে বড় কল, তা ভাঙার জন্য পদক্ষেপ নিলেন। বেসরকারিকরণের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বেচে মুনাফা করার দুর্নীতি-স্বজনপোষণে ইতি টানার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে কালোবাজারি কমানো ও সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক বোঝা কমানোর চেষ্টা করলেন। স্থগিত হয়ে থাকা পেনশন ও মজুরি চালু করার ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘদিন পর ২০০০ সালে এসে ইউক্রেন আবার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মুখ দেখল।

অন্যদিকে, ১৯৯০-য়ের দশক জুড়ে ইউক্রেনিয় ভাষার পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া বহাল ছিল। এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের বিস্তার। বহু পরিবারে বাবা-মা-রা যেখানে ইউক্রেনিয় ভাষা ভুলে গিয়েছিলেন, শিশুরা স্কুলে ইউক্রেনিয় ভাষা শিখে তার ব্যবহারকারী হয়ে উঠছিল। গোটা ইউক্রেন জুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষায় ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহারের প্রসার বোঝার জন্য নিচের দুটো মানচিত্রের দিকে তাকানো যাক:

১৯৯০-১৯৯১ সালে বিদ্যালয়ে ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমে শিক্ষা

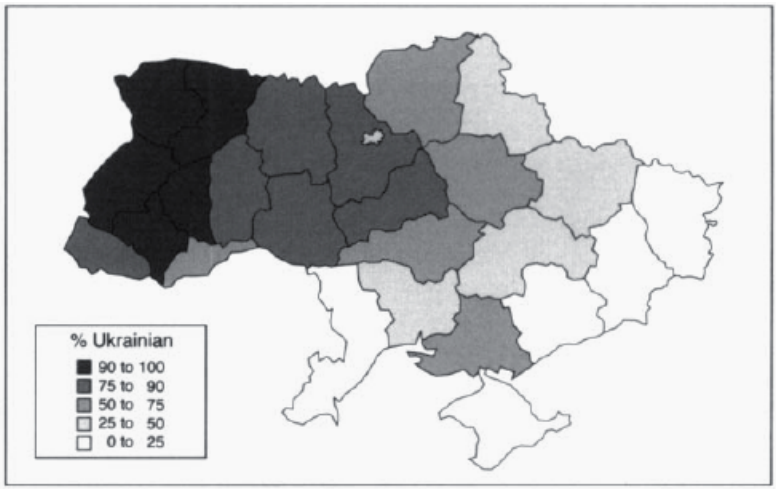

১৯৯৪-১৯৯৫ সালে বিদ্যালয়ে ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমে শিক্ষা

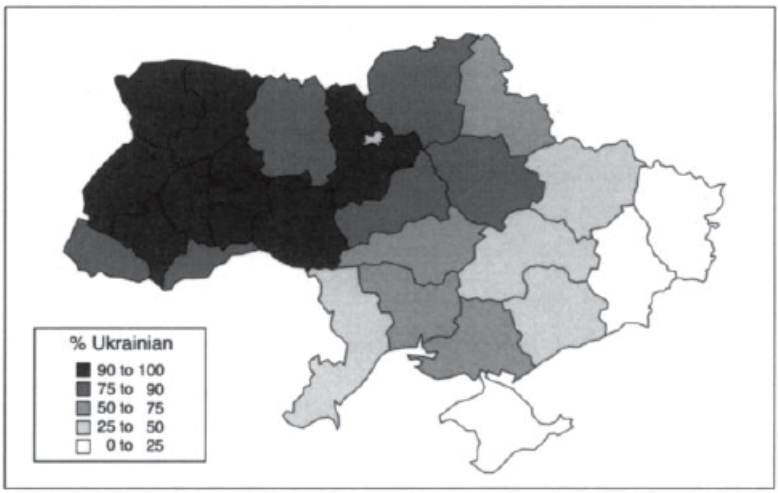

সূত্র: ইউক্রেনিয়ার সরকারের জাতিসত্তা, পরিযায়ী ও ধর্মসম্প্রদায় বিষয়ক দপ্তর।

দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯০ দশকের প্রথম অর্ধ অর্থাৎ ক্রাভচুক আমলেই ইউক্রেনিয় ভাষামাধ্যমে শিক্ষা ক্রমবিস্তারিত হয়ে দেশের অধিকাংশ প্রদেশে ৫০ শতাংশের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম ও মধ্য ইউক্রেনের অধিকাংশ জায়গায় তা ৯০

শতাংশের উপর দাঁড়িয়েছে। এমনকি পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে যেখানে সোভিয়েত শাসনের সত্তর বছরেরও বেশি সময়কালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ইউক্রেনিয় ভাষাকে মুছে ফেলা হয়েছিল, সমাজে কথায়-কাজে রুশ ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল, সেখানেও অধিকাংশ জায়গায় ইউক্রেনিয় ভাষায় বিদ্যালয়শিক্ষা শূন্য থেকে বাড়তে বাড়তে ৫০ শতাংশ ছুঁতে চলেছিল। প্রাথমিক শিক্ষায় ইউক্রেনিয় ভাষার এই পুনরুজ্জীবনের দ্রুতি সম্ভবপর হয়েছিল পশ্চিম ইউক্রেনে শিক্ষাব্যবস্থায় ও সামাজিক ব্যবহারের অন্যান্য পারিসরে ইউক্রেনিয় ভাষার টিকে থাকার কারণে। ইউক্রেনিয় ভাষায় পাঠ্যবই ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী তাই একেবারে নতুন করে তৈরি করতে হয়নি। আর সহায় হয়েছিল ইউক্রেনিয় জাতিপরিচয়ের মানুষদের ভাষা-অবদমনের শিকার হওয়ার যন্ত্রণাবোধ ও ভাষাআবেগ ও স্বাধিকারের বোধ জাতীয়-পরিচয়াকাঙ্খী আন্দোলনের ধারায় সজীব হয়ে থাকায়।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরে গ্রন্থ প্রকাশনা ও সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন মাধ্যমেও ইউক্রেনিয় ভাষা নিজস্ব জায়গা করে নিচ্ছিল। গোরবাচেভ আমলে গুপ্ত প্রকাশনা বা 'সামিজদাত'-য়ে সক্রিয় লেখক-কবি-শিল্পীরা ১৯৯১-পরবর্তী বছরগুলোয় রাষ্ট্রীয়-নিষেধাজ্ঞা-মুক্তভাবে কাজ করার পরিসর পেয়ে ইউক্রেনিয় ভাষার বহু প্রকাশনাসংস্থা, বেতার ও দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র এবং সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছিল। বেশিরভাগেরই পরিধি ও সক্ষমতা ছিল সীমিত, অনেকগুলোই ছিল ক্ষণজন্মা, কিন্তু ভাষা ও জাতীয়তার স্বাধিকারের প্রশ্নে আবেগ ও উদ্যোগের সজীবতা ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯৯২ সালে ক্রাভচুক-সরকারের নিয়ে আসা নতুন তথ্যসম্প্রচার আইনে রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাইরেও বেসরকারি মালিকানায় সংবাদপত্র প্রকাশ, বেতার ও দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র চালানো আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার এক বছরের মধ্যে ৪৯৯টি বেসরকারি দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র এবং ৩৪৩টি বেসরকারি বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র নথিভুক্ত হয়, যারা অংশত বা সম্পূর্ণত ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার করে কাজ শুরু করে। এদের মধ্যে অনেকগুলোই অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। (তথ্যসূত্র: আদ্রিয়ানা হেলবিগ, ওকসানা বুরানবায়েভা ও ভানজা স্লাদিনিও রচিত এবং ২০০৯ সালে গ্রিনউড প্রেস দ্বারা প্রকাশিত 'কালচার অ্যান্ড কাস্টমস অফ ইউক্রেন' গ্রন্থ) রুশ ভাষায় প্রকাশনা, সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র সংখ্যায় গুটিকয় হলেও, ধারে-ভারে ও প্রচারব্যাপ্তিতে ছিল অনেক বেশি। এর কারণ দীর্ঘ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় তাদের প্রতিষ্ঠান ছিল অনেক মজবুত এবং আর্থিক ক্ষমতাও ছিল

অনেক বেশি, ফলে প্রভাববিস্তারের ক্ষমতাও ছিল বেশি। রাশিয়া থেকে সরাসরি রপ্তানি করা রুশভাষার বই, সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন সম্প্রচারও তাদের প্রাধান্য ধরে রেখেছিল।

জায়মান ইউক্রেনিয় ভাষার সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন মাধ্যম আবার প্রখর রাষ্ট্রীয় বৈরিতার সম্মুখীন হয় যখন ১৯৯৪ সাল থেকে সমস্ত প্রচারমাধ্যমের উপর কড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি-সেনসরশিপ ফিরে এল। ১৯৯৪ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুখে রাষ্ট্রপতি ক্রাভচুক তাঁর জনপ্রিয়তার নিম্নগামীতা সামলে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার তাড়নায় তাঁর বিরোধী প্রার্থী কুচমার পক্ষে প্রচার করা এইচ-আর-এ ভি-আই-এস দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্রের সম্প্রচার-অনুমতি বাতিল করে তা বন্ধ করে দেন। কেবল একটি দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্রকে বন্ধ করে দেওয়া নয়, একইসঙ্গে কড়া সেনসরশিপ কায়েম করা হল সমস্ত প্রচারমাধ্যমের উপর। ইউক্রেনিয় ভাষার প্রচারমাধ্যমগুলো যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিমত্তা ও আর্থিক বলে দুর্বল, তাদের হাতে-পায়ে বেড়ির বঁধন আরও কষে পড়ল। ক্রাভচুক নির্বাচনে হেরে কুচমা জিতলেও অবস্থা শুধরাল না তো বটেই, বরং আরও খারাপ হল। পরিকল্পিতভাবে অর্থ সংস্থান আটকে দেওয়া ও হয়রানি করার মধ্য দিয়ে বেসরকারি প্রচারমাধ্যমগুলোকে শুকিয়ে নির্মূল করার পথ নেওয়া হল। সরকারি আধিকারিক, এমনকি খোদ রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে নির্দেশ আসতে শুরু করল কোন খবর ছাপা যাবে, কী বার্তা প্রচার করতে হবে তা নিয়ে। নির্দেশ অমান্য করা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা সম্পাদকদের সরাসরি বিভিন্ন সাজানো আইনি মোকদ্দমায় ফাঁসিয়ে বা সাজানো অভিযোগে গ্রেফতার করে বাধ্যতার পাঠ দেওয়া হল। ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবার সমাসন্ন হলে এই প্রক্রিয়া তুঙ্গে উঠল। সেই সময়ে সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস' তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে ইউক্রেনে এমন কোনও বড় সংবাদ মাধ্যম নেই যেখানে প্রকৃতই স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চা করা হয়।

১৯৯৯ সালে নির্বাচনে কুচমা আবার জিতলেন। তারপরই রাষ্ট্রক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করে নিজের হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে উদ্যোগী হলেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমানো ও তাদের আইনি অধিকার খর্ব করার প্রস্তাব দিয়ে তিনি গণভোট আহ্বান করলেন। প্রায় গোটা পার্লামেন্ট ও পার্লামেন্টের বাইরেও বিপুল মানুষ সেই প্রস্তাবের বিরোধী হলেও কুচমা ও তাঁর সঙ্গীদের 'ভোট করিয়ে নেওয়া'-র কলাকৌশলে

দেখা গেল যে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট কুচমার পক্ষে পড়েছে। গণভোটে যে ব্যাপক প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বেশিরভাগ ইউক্রেনিয়রই কোনও সংশয় ছিল না। এই কলাকৌশল প্রয়োগকালে সংবাদমাধ্যমে কেবলমাত্র নির্দেশমাফিক বার্তা প্রচার নিশ্চিত করার জন্য সংবাদমাধ্যমের উপর রাষ্ট্রীয় হুমকি-খবরদারি আরও তীব্র হল। এমনকি সাংবাদিকদের তুলে নিয়ে গিয়ে মারধোর করার ঘটনাও ঘটতে শুরু করল। এই পর্যায়েই ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে হিওরহি গঙগাদজো নিখোঁজ হয়ে গেলেন। গঙগাদজো ছিলেন একজন ইউক্রেনিয়-ভাষী সাংবাদিক, সরকারি নিয়ন্ত্রণকে পাশ কাটিয়ে স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চা করার জন্য তিনি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্তর্জালে 'ইউক্রেইনস্কা প্রাভদা' নামে একটি সংবাদ-পত্রিকা চালাতেন। এই পত্রিকায় সরকারের নীতি ও কাজকে সমালোচনা করে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার দুই মাস বাদে কিয়েভ শহরের ঠিক বাইরে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল যে গঙগাদজোকে খুন করে তাঁর গলা-কাটা দেহ কারা যেন ফেলে দিয়ে গেছে। সন্দেহ পেকে উঠেছিল যে বছরখানেক আগে চোরনোভিলের মতো গঙগাদজোকেও খুন করেছে রাষ্ট্রীয় ঘাতকরা। কিন্তু চোরনোভিলের মতো এবার আর তা অপ্রমাণিত সন্দেহ হয়ে রয়ে গেল না। কুচমার দেহরক্ষীদের একজন কুচমার দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় কুচমার কিছু কথোপকথন গোপনে রেকর্ড করেছিলেন, তিনি তা পর্লামেন্টের সদস্য ও কুচমার সমালোচক ওলেকজান্ডার মোরোজ-য়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ২০০০ সালের শে নভেম্বর মোরোজ তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। সেখানে একটি কথোপকথনে শোনা যায় যে কুচমা গঙগাদজোকে অপহরণ করে খুন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। গোটা ইউক্রেন জুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। খুন-অপহরণ-গাজোয়ারি সহ কুচমা ও তাঁর দলবলের বহু দুর্নীতি-স্বজনপোষণের অভিযোগ 'কুচমাগেট' নামে খোলাখুলি আলোচনা ও ক্ষোভের বস্তু হয়ে ওঠে, তার রেশ দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ২০০০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠী কুচমা-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাতে প্রকাশ্য রাস্তায় জমায়েত করতে শুরু করে। ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাধীন সংগঠন, ছোট ব্যবসায়ী, এমনকি কিছু বড় ব্যবসায়ীরাও প্রতিবাদে পথে নামে। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে 'কুচমাহীন ইউক্রেন' নামে একটি আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে ওঠে। যেখানেই বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হয়, পুলিসবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর-গ্রেপ্তারি করে তা ছত্রখান

করে দিতে থাকে। পার্লামেন্টের সদস্যরাও খোলাখুলি এই বিক্ষোভের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি।

ইতিমধ্যে ২০০১ সালের আর একটি ঘটনা গণবিক্ষোভকে আরও উসকে দেয়। ঘটনাটি পশ্চিম ইউক্রেনে ল্‌ভিভ শহরে ঘটে। শহরের একটি কাফেতে ইউক্রেনিয় গান গাওয়ার জন্য ইহোর বিলোজির নামে এক যুবকের উপর দুজন রুশ জাতিপরিচয়ের যুবক হামলা চালায় ও বিলোজিরকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। সমাজে রুশ-ইউক্রেনিয় বৈরিতার ছাই-চাপা আগুন যেন শিখা মেলে ঝলসে ওঠে এই ঘটনায়। জার শাসন ও সোভিয়েত শাসনের দীর্ঘ পর্যায়ে রুশ আধিপত্যবাদ যেভাবে ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছোট করে হেয় প্রতিপন্ন করে দেখত, 'পশ্চাৎপদ-গাঁইয়া-নির্বোধ'-দের ভাষা-সংস্কৃতি হিসেবে গালি দিত, সে মনোভাব সোভিয়েত শাসন পতনের পর এক দশকে রুশ জাতিপরিচয়ের বেশিরভাগ মানুষদের মনোভাব থেকেই মুছে যায়নি, বরং এই এক দশকে ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বেশ কয়েক ধাপ অগ্রগতি তাদের মনে উষ্মা ও অসহিষ্ণুতা জমিয়ে তুলেছিল। রুশ আধিপত্যবাদী এই মনোভাবকে কুচমা ও তাঁর পূর্ব ইউক্রেনের কায়েমী ক্ষমতা-আঁকড়া গোষ্ঠীরা উৎসাহিতই করতেন। ফলে দুই রুশ যুবকের বিলোজিরকে পিটিয়ে খুন করার ঘটনা কুচমা ও তাঁর ক্ষমতা-আঁকড়া শিবরের রুশ-আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে ইউক্রেনিয়দের ক্ষোভের আগল খুলে দিল। বিলোজিরের মৃতদেহের শেষকৃত্য করার জন্য যে মিছিল বেরোল, তাতে স্রোতের মত ব্যথিত বিক্ষুব্ধ মানুষ এসে সামিল হয়ে তাকে বেদনা, রাগ ও প্রতিকার আদায়ের শপথের জনসমুদ্রে পরিণত করল। সরকার-বিরোধী এমন স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ার ল্‌ভিভ শহর আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। শহরের একটি কাফের ঘটনাকে তা গোটা দেশের বিষয় করে তুলল এবং সরকারের দুর্নীতি-স্বজনপোষণ বিরোধিতার আন্দোলনের সঙ্গে ইউক্রেনিয় আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গম ঘটিয়ে দিল।

কুচমা ও তাঁর কায়েমী ক্ষমতা-আঁকড়া গোষ্ঠীদের শিবিরের মধ্যে ২০০১ সালের শুরু থেকেই ফাটল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল। প্রথম তা হয় ইউলিয়া তিমোশেঙ্কোর সেই শিবির ছেড়ে কুচমা-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৯০-য়ের দশকে দুর্নীতি-কালোবাজারির আখড়া খনিজ তেল-গ্যাস ও জ্বালানি আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কুশীলব হিসেবে ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো 'গ্যাস-রাজকুমারী' নামে পরিচিতি ও রাজকীয় ধনসম্পদ আয়ত্ত

করেছিলেন। তারপর সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেন। কুচমা তাঁকে ইউসচেঙ্কোর অধীনে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ২০০১-য়ের জানুয়ারিতে অতীত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কুচমা তাঁকে হঠাৎই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তিমোশেঙ্কোকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু আদালতে তিমোশেঙ্কোর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। জেল থেকে বেরিয়ে তিমোশেঙ্কো তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কুচমা-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং অচিরেই কুচমা-বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে, ইউসচেঙ্কোর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া পূর্ব ইউক্রেনের কায়েমী ক্ষমতা-আঁকড়া গোষ্ঠীদের দুর্নীতি-স্বজনপোষণের ঘুঘুর বাসায় ঘা দেওয়ায় ইউসচেঙ্কোকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কুচমা বরখাস্ত করেন ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে। বরখাস্ত হওয়ার আগে ইউসচেঙ্কো কুচমা-বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে বিবৃতিতে সই করেছিলেন। এখন বরখাস্ত হওয়ার পর তিনিও কুচমা-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং কুচমা-বিরোধী বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, মঞ্চ ও আন্দোলনকে একত্রিত করে 'আমাদের ইউক্রেন' (নাশা ইউক্রেইনা) নামে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে তুললেন। ২০০২ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পার্টি-ভিত্তিক ভোটে 'আমাদের ইউক্রেন' পার্টি হিসেবে সর্বাধিক ভোট ও সর্বাধিক আসন পেলেও, অর্থবল ও প্রশাসনিক চাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রার্থী-ভিত্তিক ভোটে কুচমা শিবিরের প্রার্থীদের জিতিয়ে এনে কুচমা তাঁর দখল বজায় রাখলেন। নির্বাচনে দুর্নীতি নিয়ে কুচমা-বিরোধীরা বিক্ষোভে নামলে পুলিস নামিয়ে কড়া হাতে তা দমন করা হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের ভিতরে কুচমা-শিবির ও তার বিরোধীদের মধ্যে তীক্ষ্ণতর হতে থাকা বিরোধ ও অসহযোগিতা পার্লামেন্টকে অচল করে দেয়। সব কিছু অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রপতি কুচমা রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের মুঠিতে আঁকড়ে রাখেন। এই পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবার সমাসন্ন হয় এবং তা ঘিরে কুচমা-বিরোধী আন্দোলন শিখর স্পর্শ করে 'কমলা বিপ্লব'-য়ের জন্ম দেয়। এখন সেই 'কমলা বিপ্লব'-য়ের পর্বে প্রবেশ করা যাক।

৩০

কমলা বিপ্লব

২০০৪-য়ে পুনর্বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘনিয়ে এলে কুচমা ইউক্রেনের পূর্বগৃহীত সংবিধান পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। সংবিধানে কোনও একজন পরপর সর্বাধিক দুইবার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে পারেন বলে নির্ধারিত করা হয়েছিল। কুচমা সেই নির্ধারণ বাতিল করে দিতে চান যাতে তিনি টানা তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হয়ে জয় হাসিল করতে পারেন। কুচমার সবরকমের চেষ্টা সত্ত্বেও পার্লামেন্ট বা আইনসভা এই সংবিধান বদলের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কুচমা তখন উদ্যোগী হন তাঁর শিবিরের 'নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার' যন্ত্র ব্যবহার করে এমন কাউকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিতিয়ে আনতে যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে থেকে দোর্দণ্ড প্রয়োগে বিরোধীদের চূর্ণ করতে পারবে। কুচমার সেই পছন্দের প্রার্থী হল ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ। পূর্ব ইউক্রেনের ডোনেৎস্ক থেকে উঠে আসা, কালোবাজারি ব্যবসা ও গুণ্ডাবাহিনী পালনের মধ্য দিয়ে এলাকাদখল ও ক্ষমতাদখলের সংঘাতে হাত পাকানো, ডনের মতো মেজাজ নিয়ে চলা এই বাহুবলীপ্রবরকে কুচমা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন ইউসচেঙ্কোকে সরানোর পর, এখন তাঁকে রাষ্ট্রপতি করতে উদ্যোগী হলেন। ইয়ানুকোভিচ যে কেবলমাত্র দুর্নীতি-স্বজনপোষণ এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষীগত করে যথেচ্ছাচারের চক্র পরিচালনাতেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, রুশ জাতিগর্বী হিসেবে অপরাপর জাতির প্রতি বিদ্বেষেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কৈশোরে এলাকাদখলের মারামারি-খুনখারাপিতে জড়িয়ে তিনি দুইবার জেল খেটেছিলেন, তাঁর কথাবার্তা জেলে চালু বিদ্বেষপূর্ণ গালাগাল দিয়ে সাজানো থাকত। তাঁর যে কোনও বিরোধী, বিশেষ করে ইউক্রেনিয় জাতীয় স্বাধিকারবাদীদের তিনি 'কোজলি' বলে উল্লেখ করতেন। 'কোজলি' শব্দটি গালাগাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'ছাগল' বা 'বেজন্মা' বোঝাতে। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে

জনসভার পর জনসভায়, এমনকি পশ্চিম ইউক্রেনের জনসভায়ও তিনি নির্বিকারে কোজলি শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন কেবলমাত্র তাঁর বিরোধী রাজনীতিকদের বোঝাতেই নয়, সাধারণভাবে ইউক্রেনিয় জাতিপরিচয়ের মানুষদের বোঝাতেও। ইয়ানুকোভিচ গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছিলেন ইউক্রেনিয়ার পূর্ব সীমানার ওপারে রাশিয়া থেকে। রাশিয়ায় তখন রাষ্ট্রপতি পুতিনের হাতে ক্ষমতার ক্রম-কেন্দ্রীভবন জারি হয়েছে। পুতিনের সরকার তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের সহযোগী ও রুশ প্রভাববলয়ের মধ্যে ইউক্রেনিয়াকে বাঁধার উপযোগী হিসেবে ইয়ানুকোভিচকে যোগ্য বিবেচনা করে তাঁর হয়ে প্রচারে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি স্বয়ং পুতিন পূর্ব ইউক্রেনে এসে ইয়ানুকোভিচের হয়ে প্রচারসভা করেছিলেন। ইয়ানুকোভিচ ও পুতিন যৌথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইয়ানুকোভিচ জিতলে ইউক্রেনিয়ার রুশ জাতিসত্তার মানুষদের রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। রাশিয়ার বিভিন্ন উৎস থেকে ইয়ানুকোভিচের নির্বাচনী তহবিলে প্রায় ৩০ কোটি ডলার অনুদান এসেছিল।

ভিক্তর ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে কুচমা-বিরোধী আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন ভিক্তর ইউসচেঙ্কো। ভিক্তর ইউসচেঙ্কোর সপক্ষে নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'পোরা'। ইউক্রেনিয় ভাষায় 'পোরা!' শব্দের মানে হল 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!'। কুচমা-বিরোধী আন্দোলনের জমিতে বিগত কয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সার্বিয়া ও জর্জিয়ায় একই সময়ে একই ধরনের অগণতান্ত্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সাফল্য পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগসাজস বজায় রেখে তারা কাজ করছিল।

সদ্য অতীতে কুচমার বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়তে গিয়ে চোরনোভিলকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল দুর্ঘটনায়। তারপর কুচমার সমালোচনা করায় খুন হতে হয়েছিল গঙগাদজোকে। সেই স্মৃতি জাগিয়ে তুলে এবার প্রাণহরণের চেষ্টার মুখে পড়লেন ইউসচেঙ্কো। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনী প্রচার চলার মধ্যেই ইউসচেঙ্কো হঠাৎ খাদ্য-বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন। ইউক্রেন থেকে বের করে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এক চিকিৎসালয়ে তাঁকে ভর্তি করা হল। সেখানকার ডাক্তাররা জানালেন যে তাঁর

খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছিল, যা একমাত্র পরিকল্পিতভাবেই ঘটতে পারে। কুচমার অধীন নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তর সম্প্রতি ইউসচেঙ্কোকে আহারে আপ্যায়িত করেছিল, বিষপ্রয়োগ সেখানেই করা হয়েছে বলে সন্দেহ ঘোরতর হল। এর পিছনে পূর্ব ইউক্রেনের ক্ষমতা-মাফিয়াদের দল ও রুশ গোয়েন্দা সংস্থারও হাত আছে বলে সন্দেহ জেগে উঠল। বেশ কয়েক সপ্তাহ নিবিড় চিকিৎসার পর ইউসচেঙ্কোর মৃত্যু-সম্ভাবনা কাটল, কার্যক্ষম হয়ে তিনি ইউক্রেনে ফিরলেন, কিন্তু এই বিষক্রিয়ার চিহ্ন হিসেবে তাঁর সারা গায়ে স্থায়ী ক্ষতচিহ্নের দাগ রয়ে গেল। ইতিমধ্যে ইয়ানুকোভিচ ও তাঁর শিবির ইউসচেঙ্কোর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে গেছে তাদের গোটা প্রচার জুড়ে। পরের পর জনসভায় ইয়ানুকোভিচ ইউসচেঙ্কোকে তুলে ধরেছেন 'ঘৃণ্য চরমপন্থী ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদী' হিসেবে। বিষক্রিয়ার নামে তিনি সাজানো অভিনয় করছেন বলা হয়েছে। মার্কিনী সরকারের বোড়ে হিসেবে তিনি ইউক্রেন দখল করতে চাইছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ইউসচেঙ্কোর স্ত্রীর জন্ম মার্কিনদেশে অভিবাসী ইউক্রেনিয় পরিবারে, সেই সূত্রে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা 'সি আই এ'-র চর বলে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। এমন মরীয়া আক্রমণ প্রকারান্তরে দেখায় যে তাঁদের 'নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার যন্ত্র' সত্ত্বেও নির্বাচনে জেতা নিয়ে তাঁরা বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

নভেম্বরে নির্বাচন হল। কুচমা-শিবিরের 'নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার' যন্ত্র যথারীতি কাজ করল, তবে এবার বিশেষ করে পশ্চিম ও মধ্য ইউক্রেনে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করল কুচমা-বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা সংগঠিত নির্বাচন-পর্যবেক্ষক ও সমীক্ষকের দল। ভোটগ্রহণের পর ভোটগণনার শেষ ও ফলঘোষণা তখনও হয়নি, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন ইয়ানুকোভিচকে তাঁর 'জয়লাভ'-য়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন, ইয়ানুকোভিচের শিবিরের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করে দেওয়া হল যে তাঁরা তিন পয়েন্টের ফারাকে নির্বাচন জিতে গেছেন। কী করে তাঁরা আগাম জানলেন? নাকি গণনা কারচুপি করে এহেন ফল উৎপাদন করার নির্দেশ সরকারি ভোটকর্মীদের উপর আরোপ করা হল? এই সন্দেহই জোরদার হল যখন দেখা গেল যে দুইদিন পর ২৪ শে নভেম্বর সরকারি নির্বাচনী দপ্তর থেকে ঠিক ওই তিন পয়েন্ট ব্যবধানেই ইয়ানুকোভিচকে জয়ী ঘোষণা করা হল।

এহেন কারচুপির আশঙ্কায় ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন পোরা আগে থেকেই গণপ্রতিবাদ সংগঠিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বহু ইউক্রেনিয় ও আন্তর্জাতিক

নির্বাচন-পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন নির্বাচনে কারচুপি ও অসৎ উপায় অবলম্বনের উদাহরণ তুলে এনেছিল। সেসবকে সামনে রেখে কিয়েভের কেন্দ্রীয় চত্বর 'ময়দান নেজালেঝনোস্তি'-তে (এই ইউক্রেনিয় নামের অর্থ হল 'স্বাধীনতার ময়দান', সোভিয়েত শাসন অবসানের পর এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এখানেই ১৯১৭ সালে ইউক্রেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার জনসমাবেশ হয়েছিল।) প্রতিবাদী মানুষ জড়ো হতে থাকলেন। প্রায় লাখ মানুষ কমলা পোষাক বা কমলা উড়নিতে গা ঢেকে ময়দানে জমায়েত হলেন। ইউসচেঙ্কোর নির্বাচনী প্রতীক ছিল কমলা রঙ। প্রতিবাদী জমায়েত তার প্রতিবাদের রঙ হিসেবে এই কমলা রঙকেই গ্রহণ করল। ভিক্তর ইউসচেঙ্কো ও ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো সেই জমায়েতে হাজির হয়ে আবেদন রাখলেন ভুয়ো নির্বাচনী ফল প্রত্যাহার হয়ে যথার্থ নির্বাচন না হওয়া অবধি ময়দান ছেড়ে না যেতে। প্রতিবাদীদেরও আশঙ্কা ছিল যে একবার ময়দান ছেড়ে গেলে সরকারের পুলিশবাহিনী ময়দান ঘিরে ফেলে আর জমায়েত হতে দেবেনা। তাই তারা ময়দানে তাঁবু তৈরি করে, গণআহারের ব্যবস্থা সংগঠিত করে প্রতিবাদ-সমাবেশকে স্থায়ী অবস্থানের চেহারা দিল।

পরের দিন, ২৫শে নভেম্বর ইউসচেঙ্কোর নির্বাচনী শিবির একগুচ্ছ কথোপকথনের রেকর্ডিং সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করল যার মধ্যে গোপনে রেকর্ড করা হয়েছিল কুচমার সরকারের বিভিন্ন শীর্ষ আধিকারিকদের নিজকণ্ঠে দেওয়া নির্দেশ যেখানে সরকারি ভোটকর্মীদের ইয়ানুকোভিচের পক্ষের ভোট বাড়িয়ে দেখানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রেকর্ডিংগুলো সরকারের নিজের সুরক্ষা দপ্তরেরই করা। এই সাক্ষ্যপ্রমাণ জমা দিয়ে ইউসচেঙ্কো শিবির আবেদন করেছিল যাতে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষিত নির্বাচনী ফলকে বাতিল ঘোষণা করে নতুনভাবে যথার্থ নির্বাচন করার নির্দেশ দেয়।

পশ্চিম ইউক্রেনেরও বিভিন্ন শহরে একইসঙ্গে ভুয়ো নির্বাচন বাতিলের দাবিতে গণ সমাবেশ ও অবস্থান শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কিয়েভের উদ্দেশ্যে রওনা হয় কিয়েভ ময়দানের কেন্দ্রীয় অবস্থানে যোগ দেওয়ার জন্য।

ইয়ানুকোভিচ বিষোদ্গার করলেন যে কমলাপন্থীরা বেআইনি পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্র করছে। ইয়ানুকোভিচের সমর্থক পূর্ব ইউরোপের কিছু নেতা হুঙ্কার করলেন যে ইয়ানুকোভিচের জয় ছিনিয়ে নেওয়া হলে তাঁরা পূর্ব ইউক্রেনে গণভোট করে ইউক্রেন ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক দেশ প্রতিষ্ঠার পথ নেবেন। ট্রেন এবং বাসবোঝাই করে পূর্ব ইউক্রেন থেকে সশস্ত্র 'ইয়ানুকোভিচ-সমর্থক'-দের দল কিয়েভে পাঠানো শুরু হল বেআইনি অবস্থান

ভণ্ডুল করার জন্য, উৎসাহবর্ধক হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বিনা পয়সায় ভোদকার বোতল। অন্যদিকে পুলিস ও মিলিটারি পশ্চিম ইউক্রেনের সড়ক ও রেলপথে তল্লাশি করে 'কমলাপন্থী'-দের কিয়েভে পৌঁছানো আটকাতে ব্যবস্থা নিল। এই পরিস্থিতিতে কিয়েভের ময়দানে প্রায় লাখ মানুষের অবস্থানের উপর ঘনিয়ে উঠল সরকারি-বেসরকারি গুণ্ডা বাহিনীর হামলাদারির আশঙ্কার কালো মেঘ।

রাষ্ট্রপোষিত হিংসার কালো মেঘের তলায় ময়দানের নাগরির জমায়েত অহিংসা ও জীবনীশক্তির অপূর্ব বিভায় নিজেকে ভাস্বর করে তুলল। ময়দানের অবস্থানের প্রতিটি দিন শুরু ও শেষ হত সর্বধর্ম সমন্বয়কারী প্রার্থনায়, যার মধ্য দিয়ে সকল ধর্মমতের ও সকল জাতিপরিচয়ের মানুষদের সমমর্যাদায় সহাবস্থানের অভিপ্রায় তুলে ধরা হত। মাঝের সময়টায় ছোট-বড় অস্থায়ী তাঁবু ধরানো চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুরু হত নানা কার্যক্রম— কোথাও গানের দল বাদ্য সহযোগে ইউক্রেনিয় লোকগান বা সদ্যরচিত আধুনিক গান গাইছে, কোথাও পথনাটিকার অভিনয় হচ্ছে, কোথাও গোল হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা চলছে, কখনও বা কোনও বক্তার বক্তৃতায় সবার মনোযোগ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও কর্তব্য আলোচনার বিরামহীন ঘূর্ণির মধ্যেই নাচ-গান-আবৃত্তি-অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ। রাষ্ট্রের মোতায়েন করা সেনাবাহিনী ময়দান চত্বর ঘিরে পাথুরে মুখ করে আগ্নেয়াস্ত্র আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। উপরতলার নির্দেশ এলেই কি তারা এই অহিংস জমায়েতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? কিন্তু তাদের চাকরি উপরতলার নির্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র চালানো হলেও, তাদেরও তো নাগরিক সত্তা আছে। তাই তাদের বৈরিতাভাব দূর করার জন্য, নাগরিক সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত করার জন্য ময়দানের জমায়েত থেকে মেয়ের দল তাদের কাছে গিয়ে হাতে সৌহার্দ্যের গোলাপফুল তুলে দিচ্ছে. গানের দল তাদের মনোরঞ্জন করার জন্য গান গেয়ে শোনাচ্ছে। গণভোজের আয়োজন যখন হচ্ছে, তখন অযাচিতভাবে তাদের হাতেও খাবার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

স্বতক্রিয়ার এই উচ্ছল তরঙ্গ বিপক্ষের হিংস্র পশুশক্তি সম্পর্কে ভয়কে ফিকে করে দিল, হিংসাকে হিংসা দিয়ে মোকাবিলা করার ভয়ার্ত প্রতিক্রিয়াকেও জাগরূক হতে দিল না। এর আগে এই ময়দানেই ২০০১ সালে কুচমা-বিরোধী জমায়েতের সময় সেনা-পুলিস ও সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর প্ররোচনায় পা দিয়ে একদল প্রতিবাদী ছাত্র পাল্টা হিংসার পথ (সেনা-পুলিস-গুণ্ডাদের লক্ষ্য করে মলোটভ ককটেল ছোঁড়া) নিলে তা অজুহাত করে আন্দোলনকারীদের

উপর নির্মম হিংস্র দমন নামিয়ে আনা হয়েছিল, প্রতিবাদ আন্দোলন ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহু বিভিন্নের একসঙ্গে সমবেত হওয়া একযোগে ক্রিয়া করা প্রত্যেকের মনে এমন এক শক্তির অনুভব জন্ম দিয়েছে যাতে রাষ্ট্রের তাক করে রাখা অস্ত্র কোনও টোল ফেলতে পারছে না। সমবেত মানুষ বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন উপায়ে নাচ-গান-কথা-র মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করছে মস্করা করছে কুচমা-ইয়ানুকোভিচ ও তাঁদের ক্ষমতা-আঁকড়া গোষ্ঠীদের নিয়ে। এতদিন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের হিংসাত্মক শক্তির সওয়ার হয়ে যারা মহাশক্তিধর সেজে ছিলেন, এই ব্যঙ্গ-মস্করার সামনে তাদের সেই সাজ খসে পড়ে নিতান্ত বেআব্রু কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।

ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'পোরা!'-র কর্মীরা ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামের নীতি ও কৌশল হিসেবে অহিংসা নিয়ে আলোচনা করছেন। আরও বেশি মানুষের মন আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে আসার উপায় আলোচনা করছেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্তর্জাল ব্যবহার করে দেশের ভিতরে বাইরে নিজেদের বক্তব্য নিজেদের যুক্তি-তর্ক প্রচার করে সমর্থন-সহমর্মিতা জড়ো করছেন।

তরুণ বা বয়স্ক কবি ও গীতিকাররা নতুন গান, নতুন কবিতা লিখে পরিবেশন করছেন। ট্রান্সকারপাথিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আসা 'হ্রিনজহোলি' (ইউক্রেনিয় ভাষায় এর অর্থ 'স্লেজগাড়ি') নামের এক তরুণ গানের দল ইউক্রেনিয় ভাষায় একটা গান বেঁধে গাইল: 'রাজম নাস বোহাতো' (একসঙ্গে আমরা অনেক)। নিমেষের মধ্যে তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কমলা বিপ্লবের মূলগান হয়ে উঠল। গানের কথাগুলি এইরকম:

জালিয়াতি আর না!
আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া আর না!
অসৎ বোঝাপড়া আর না!
আর নয় মিথ্যার বেসাতি!
ইউসচেঙ্কো, ইউসচেঙ্কোই
আমাদের রাষ্ট্রপতি
অবশ্যই! অবশ্যই! অবশ্যই!
একসঙ্গে আমরা অনেক! আমাদের হারাতে পারবে না!
আমরা নই আবর্জনা!
আমরা নই 'কোজলি'!
আমরা ইউক্রেনের পুত্র ও কন্যা!

এখনই, নয়তো আর হবে না!

অনেক হয়েছে অপেক্ষা!

একসঙ্গে আমরা অনেক! আমাদের হারাতে পারবে না!

গানটির কথাগুলো খেয়াল করলে দেখা যায় যে নির্বাচনী জালিয়াতি অতিক্রম করে ইউসচেঙ্কোর রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন আশু দাবি হলেও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে গভীরতর আরও অনেক বিক্ষোভ-অসন্তোষ-অপমানবোধ। বিক্ষোভ ক্ষমতা-আঁকড়া রাজনীতিকদের দুর্নীতি, অসৎ বোঝাপড়া, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে কলকাঠি নাড়া এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। ইউক্রেনিয় ভাষা ও জাতিপরিচয়ের জন্য সইতে হওয়া অপমানের যন্ত্রণা নিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করা আত্মসম্মানের ঘোষণা যে ইউক্রেনিয়ার পুত্র-কন্যারা আবর্জনা নয়, 'কোজলি' (স্মরণীয় যে ছাগল বা বেজন্মা বোঝায় যে 'কোজলি' শব্দ, তা দিয়েই ইয়ানুকোভিচ ইউক্রেনিয়দের সম্বোধন করতে অভ্যস্ত ছিলেন) নয়। আর গানের ধুয়ো হিসেবে ফিরে ফিরে এসেছে যে পঙক্তি, যা গানের নামপরিচয়ও হয়ে উঠেছে, তা বোধহয় কমলা বিপ্লবের মূল অনুভূতিটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে— আমাদের শক্তি আমাদের একসঙ্গে হওয়ায়, একাকী প্রত্যেকে ক্ষুদ্র কিন্তু একসঙ্গে অনেক, একসঙ্গে হওয়ার মধ্য দিয়ে যে শক্তির বোধন তাকে পরাজিত করার ক্ষমতা হিংস্রতম রাষ্ট্রশক্তিরও নেই।

কমলা বিপ্লবের প্রকৃত বিপ্লবী মুহূর্তটি এইখানে। একটি নির্বাচনী জালিয়াতিকে উল্টে দিতে সে সমর্থ হল কি হল না, রাষ্ট্রক্ষমতায় কী বদল সে আনতে পারল, সেখানে তার বিপ্লবের মুহূর্তটি নেই, তার বিপ্লবের মুহূর্তটি নাগরিক সমাজের নিজস্ব শক্তি উদ্বোধন করে দেওয়ার এই বিরল মুহূর্তটিতেই উদ্ভাসিত। নাগরিক সমাজ রাজনৈতিক অভিপ্রায় নিয়ে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা বেড়ি অতিক্রম করে একসঙ্গে এসে স্বতক্রিয়ার পরিসরে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে যে শক্তিকে নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি করে তার জোরে কুটিলতম রাষ্ট্রশক্তিরও মোকাবিলা করা যায়— এই উদ্বোধনই আসলে কমলা বিপ্লব। গত একশ বছরে যে দেশের সমাজ নাগরিক ক্ষমতাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা আধুনিক রাষ্ট্রের উত্থান দেখেছে, হিটলারি ও স্তালিনীয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে সেই আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর সবচেয়ে নির্মম সর্বাত্মকতাবাদী রূপের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, তারপরও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের নাগপাশে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থেকেছে, সেই ইউক্রেনে ইতিহাসের জাদুদণ্ড হঠাৎ যে নাগরিক ক্ষমতার বন্ধনহীন মুক্ত উচ্ছাসের মুহূর্ত নিয়ে এল, সেই অপার বিস্ময় হল কমলা বিপ্লব।

কিয়েভের ময়দানের জমায়েত নাগরিকের সংখ্যা রাষ্ট্রীয় সেনা-পুলিসের ও পোষা গুণ্ডাবাহিনীর সব বাধা অগ্রাহ্য করে দশ লাখ ছুঁয়ে ফেলল। কুচমা-ইয়ানুকোভিচ ও তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রসুখী সামরিক প্রধানরা কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। যারা ভয় পেতে অস্বীকার করছে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে তাদের ভয় দেখান যায়না। গোটা ইউরোপের নজর কেড়ে নেওয়া দশ লাখ অহিংস প্রতিরোধকারীর উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ার শক্তিও তাঁদের হল না। তাঁদের শিবিরের মধ্যেও ফাটল বাড়ছিল। বহু সুযোগসন্ধানী আমলা-কর্তা-সেনাপ্রধানরা পালাবদলের আঁচ পেয়ে ইউসচেঙ্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিল। কিয়েভের ধনশালী ও ক্ষমতাশালীরাও ইউসচেঙ্কোর সাথে আলাপ-আলোচনা করে চাইছিলেন যে ইউসচেঙ্কোর রাষ্ট্রপতি পদে আরোহণ সম্পন্ন হোক, এবং কমলা বিপ্লব তার মধ্যেই সীমায়িত থাকুক, তার বাইরে আর কোনও ওলটপালট যেন না হয়। ইউসচেঙ্কোও তেমনটাই চাইছিলেন।

কুচমা-ইয়ানুকোভিচের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণের রশিগুলো ক্রমশ আলগা হয়ে পড়ছিল। এমনকি তাঁদের সীমান্তপারের পৃষ্ঠপোষক পুতিন ও রুশ রাষ্ট্রও কমলা বিপ্লবের অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে হতবুদ্ধি হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

২৯ শে নভেম্বর কুচমা নতুন নির্বাচনের আবশ্যকতা স্বীকার করে নিলেন, ফলে পরোক্ষে আগের নির্বাচনের জালিয়াতিকেও স্বীকার করে নিলেন। ক্ষমতার উপর থেকে পিছলে যেতে থাকা মুঠোকে সামাল দিতে তিনি ইউসচেঙ্কোর কাছে সমঝোতা প্রস্তাব হাজির করলেন। কুচমা প্রস্তাব দিলেন যে নতুন নির্বাচন হওয়া অবধি তিনিই রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী পদে ইয়ানুকোভিচকে সরিয়ে ইউসচেঙ্কো বসবেন। ইউসচেঙ্কো সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন। ১লা ডিসেম্বর পার্লামেন্ট সদস্যরা ভোট করে ইয়ানুকোভিচ নেতৃত্বাধীন সরকারকে বরখাস্ত করে দিলেন। এরপর ৩রা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করল যে আগের নির্বাচন বাতিল এবং যথাশীঘ্র নতুন নির্বানের সুষ্ঠ আয়োজন করতে হবে। কুচমা ও ইউসচেঙ্কোর শিবির থেকে ক্ষমতা-আঁকড়া সুযোগসন্ধানীর দল অধিকাংশই ইতিমধ্যে শিবিরত্যাগ সেরে ফেলেছে। সরকারি নির্বাচনী আয়োগে দ্রুত বড়সড় রদবদল সম্পন্ন হল। তারপর হল নতুন নির্বাচনের আয়োজন। ইউক্রেনের ইতিহাসে এই নির্বাচনেই সবচেয়ে বেশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদল নির্বাচনের উপর নজর রেখেছিল। নির্বাচনের শেষ দিন অবধি কিয়েভের ময়দানে স্বচ্ছ নির্বাচন ও প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার রক্ষার দাবি নিয়ে জমায়েত, সংখ্যায় কমে এলেও, বজায় ছিল।

২০০৫ সালের ১০-ই জানুয়ারি নির্বাচনের ফল ঘোষণা হল। ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে ইউসচেঙ্কো নির্বাচিত হলেন। ২৩ শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি নতুন সরকার গড়লেন, ময়দান জমায়েতে জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠা ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন।

কিয়েভের স্বাধীনতা ময়দানের অস্থায়ী তাঁবুগুলো উঠে যাওয়া এবং একসঙ্গে হওয়া নাগরিকরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের মুহূর্তের অবসান হল। নির্বাচনী জালিয়াতি রদ ও সরকার বদল হলেও কমলা বিপ্লবের অভিপ্রায় পূর্ণ হল না, নাগরিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করা কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের উদ্বোধন হল না। অচিরেই ইউসচেঙ্কো ও তিমোশেঙ্কো— এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ ও শিবির ভাগাভাগি দেখিয়ে দিল যে ক্ষমতা আঁকড়া গোষ্ঠীদের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠা নিয়ে দলাদলি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বহাল থেকে গেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার কুক্ষীগতকরণের অবসান হয়নি। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রমকেন্দ্রীভবনের শক্তি ও নাগরিকদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার শক্তির মধ্যে নতুন এক যুদ্ধবিরতি রেখা টানা হয়েছে মাত্র। ইউসচেঙ্কো-তিমোশেঙ্কো বিরোধিতার ফাটল দিয়ে সরকারের পতন ঘটল এবং ২০০৬ সালে সুযোগসন্ধানী ইয়ানুকোভিচ সরকারের মাথায় উঠে এল, যদিও এক বছরের মধ্যেই তিমোশেঙ্কো আবার তাঁকে সরিয়ে নিজের নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন করলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অলিন্দে ক্ষমতা-আঁকড়া রাজনীতিকদের রঙ্গ নিত্যনৈমিত্তিক প্রাত্যহিকতায় বইতে লাগল। আবার অপেক্ষা! অপেক্ষা আবার কবে কখন নাগরিকদের একসঙ্গে হয়ে রাজনৈতিক অভিপ্রায় নিয়ে স্বতক্রিয়ার অভাবিত নতুন পরিসর প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে আবার উন্মুক্ত করে গেয়ে ওঠে:

একসঙ্গে আমরা অনেক! আমাদের হারাতে পারবে না!

সেই অপেক্ষা নিয়ে ইউক্রেনের ইতিকথায় এখানেই এখনকার মতো ইতি টানা যাক।

নিপরো নদীর দুপাশে কিয়েভ শহর, একদিকে বহু প্রাচীন কিয়েভ গুহা মঠের চূড়া, অন্যদিকে হাল আমলের অট্টালিকা। ২০০৮ সালে আদ্রিয়ানা হেলবিগ-য়ের তোলা ছবি।

ইউক্রেনের এক হ্রিভনিয়া ব্যাঙ্কনোটের উপর মহান ভোলোদিমিরের প্রতিকৃতি। কিয়েভিয় রুস-য়ের প্রচলিত মুদ্রা ছিল হ্রিভনিয়া। ১৯৯৬ সালে স্বাধীন ইউক্রেন রাষ্ট্রে ইউক্রেনের জাতীয় ব্যাঙ্ক আবার হ্রিভনিয়া নামে ব্যাঙ্কনোট চালু করে।

কিয়েভিয় রুস-য়ের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন: সম্ভবত ১১ শতকের শেষদিকের সর্পকবচ। বাঁদিকেরটিতে গ্রিক ভাষায় খোদাই করা, ডানদিকেরটায় পুরানো ইউক্রেনিয় ভাষায় খোদাই করা।

চোঙাকৃতি কাঠের সীলমোহর, নোভগোরোদ এলাকা থেকে প্রাপ্ত, সম্ভবত বাণিজ্যদ্রব্যের থলির উপর ব্যবহৃত হত। লেখাটা পুরানো ইউক্রেনিয় ভাষায়। পুরাতাত্ত্বিকরা এর সময় ধার্য করেছেন ৯৭০ থেকে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শনের একটি।

নেরেদিতসার গির্জার দেওয়ালের প্রাচীরচিত্র: ‘ধনীর নরকবাস’। নরকের দানবের সঙ্গে ধনীর কথোপকথন পুরানো ইউক্রেনিয় ভাষায় ছবির উপরদিকে লেখা আছে। এই ছবিটি ‘শেষ বিচার’ নামক প্রাচীরচিত্রাবলীর একটি অংশ। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে আঁকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে গির্জাটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। আলোকচিত্রটি তার আগে তোলা। ব্যক্তিগত সম্পদসঞ্চয়ের বিরোধী নৈতিকতা যে সাধারণ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এর থেকে আন্দাজ করা যায়।

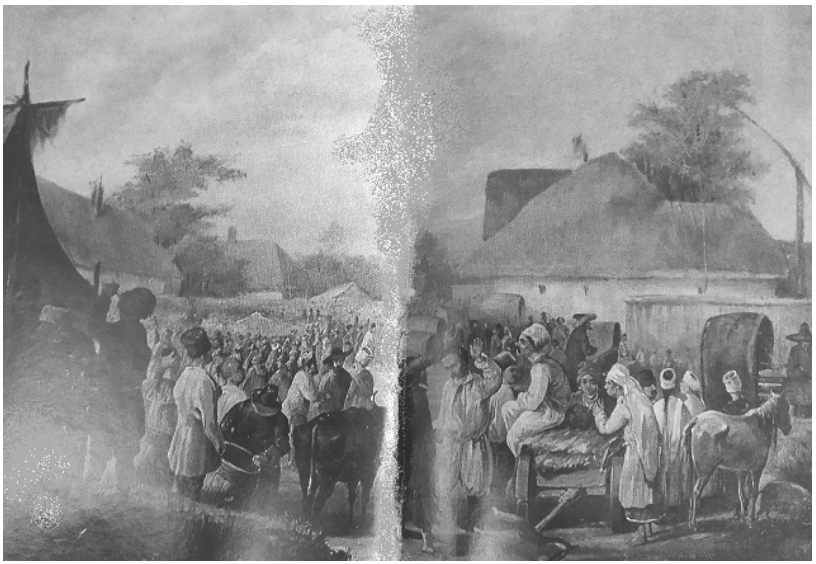

ইউক্রেনের গ্রামীণ মেলা, ১৮৩৬ সালে ভাসিলি তিমমে-র করা লিথোগ্রাফ থেকে।

ইউক্রেনিয় কসাক— ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত নিকোলাই গোগোল-য়ের "তারাস বুলবা" গ্রন্থে ইয়েভগেনি কিবরিক কৃত চিত্রায়ন।

১৯৯১ সালে ইউক্রেন পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ইউক্রেনের খারকিভ শহরে নির্মিত শেভচেঙ্কো স্মৃতিস্তম্ভ। উপরে শেভচেঙ্কোর মূর্তি, নিচে ইউক্রেনের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে স্বাধীনতা-যোদ্ধার দল।

মিখাইল হ্রুসেভস্কি

হ্রুসেভস্কির "ইউক্রেনের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

১৯১৭ সালে কিয়েভের প্রধান সরণী খ্রেসচাতিকে ইউক্রেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার সমাবেশে জনসমুদ্র। এখানে স্বাধীন ইউক্রেনের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে হ্রুসেভস্কি বক্তব্য রেখেছিলেন।

১৯১৭ সালে ইউক্রেনিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর শিল্পী হিওরহি নারবুত সেই রাষ্ট্রের শীলমোহর, ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদির নকশা করেছিলেন। ইউক্রেনিয় ভাষায় সাংস্কৃতিক পত্রিকা "নাাশে মাইনুলে" প্রকাশ করারও উদ্যোগও সেসময় নেওয়া হয়। "নাাশে মাইনুলে" কথাটার মানে "আমাদের অতীত"। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত সেই পত্রিকার প্রচ্ছদ,যাও শিল্পী হিওরহি নারবুতের আঁকা।

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.

Народе Україні!

Українська Центральна Рада.

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

১৯১৮-র ৯ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় রাডা কর্তৃক ইউক্রেনিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ইউক্রেনিয় ভাষায় লেখা এই বিজ্ঞপ্তি শুরু হয়েছে এইভাবে: "আজকের দিন থেকে ইউক্রেনিয় গণ প্রজাতন্ত্র স্বাধীন হল, সব অধীনতা ঘুচিয়ে ইউক্রেনিয় জনগণের মুক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল।"

১৯৩৩ সালে স্তালিন-আরোপিত ক্ষুধার মহামারীর বলি। খারকিভে খাবার ভিক্ষে করতে আসা জনৈক গ্রামের লোক অনাহারে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে খারকিভ শহরের প্রান্তে একটি বাড়ির পিছনে। খারকিভের কারখানায় প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আলেকজান্ডার ওয়েনারবার্জার গোপনে ক্ষুধার মহামারীর বেশকিছু ছবি তুলে সোভিয়েত প্রশাসকদের নজর এড়িয়ে অস্ট্রিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। এই ছবিটি তাদের একটি।

খারকিভ শহরের ঠিক বাইরে ক্ষুধার মহামারীতে মৃতদের জন্য খোঁড়া গণকবর। ১৯৩৩ সাল।

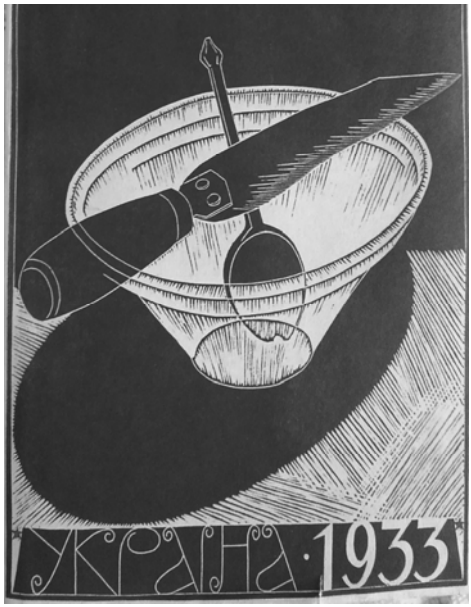

স্তালিন-আরোপিত ক্ষুধার মহামারীকে স্মরণ করে শিল্পী মিকোলা বোনদারেঙ্কোর করা লিনোকাট।

১৯৩২-১৯৩৩-য়ে স্তালিন-আরোপিত ক্ষুধার মহামারীর বলিদের স্মৃতিরক্ষায় সোভিয়েত শাসন অবসানের পর ইউক্রেনের কিয়েভ শহরে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ।

স্তালিনের গুলাগে বন্দি ও প্রহরী। ছবিটি গুলাগে দীর্ঘদিন বন্দি থাকা ও গুলাগেই প্রাণ হারানো আন্না সিয়েসলিকোওস্কা-র আঁকা।

স্তালিন, ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ আমলে ইউক্রেনিয়ায় ইউক্রেনিয় ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে রুশ ভাষা চাপানো হয়েছিল। গর্বাচেভ আমলে কিঞ্চিৎ ছাড় দিয়ে রুশ ও ইউক্রেনিয় দ্বিভাষিকতার নীতি ঘোষণা করা হয়। সেসময় রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা ও সেনসরশিপ এড়িয়ে বেআইনি ভাবে প্রকাশিত প্রতিবাদী প্রকাশনা সামিজদাত-য়ে প্রকাশিত হয়েছিল এই ব্যঙ্গচিত্রটি, যার শিরোনাম: রাষ্ট্রীয় দ্বিভাষিকতার স্বরূপ। ছবিতে সোভিয়েত সরকারি প্রতীক সম্বলিত টুপি পরা বিপুলায়তন ব্যক্তিটির হাতে ধরা বইয়ে রুশ ভাষায় লেখা আছে "দেশীয় ভাষা", আর তার দেহের ভারে কনুইয়ের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত ক্ষুদ্র দেহের মানুষটির হাতে ধরা বইয়ে একই কথা লেখা ইউক্রেনিয় ভাষায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা: ইউক্রেনিয় পরিবারের মহিলারা যুদ্ধের বলি পুরুষের দেহ বোঝাই গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে ঘরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা: জার্মান নাজিদের মৃত্যুশিবিরে ইহুদি বন্দি।

১৯৩৯-য়ের হিটলার-স্তালিন গোপন চুক্তি বা মলোটভ-রিবেনট্রপ সমঝোতা-র বিরুদ্ধে ১৯৮৯ সালে এস্তোনিয়ায় গণ বিক্ষোভ। ১৯৩৯-য়ের ২৩ শে আগস্ট হওয়া এই গোপন চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে একদিক থেকে স্তালিন পশ্চিম ইউক্রেন, বাল্টিক দেশসমূহ ও পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে এবং হিটলার পশ্চিম পোল্যান্ড দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীপক্ষে থাকার সুবাদে সোভিয়েত রাষ্ট্র দখলে নেওয়া দেশগুলোকে নিজের দখলেই রেখে দেয়। এই দখলদারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ৫০ বছর পর বাল্টিক দেশগুলো উত্তাল হয়ে ওঠে, তারই এক ঝলক উপরের ছবিতে: '১৯৩৯ মলোটভ-রিবেনট্রপ বোঝাপড়া' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সমবেত জনতা। এই বিক্ষোভের আঁচ পশ্চিম ইউক্রেনেও সঞ্চারিত হয়ে সেখানেও সোভিয়েত আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

১৯৮৯, ২৩ শে আগস্টের‘বাল্টিক শৃঙ্খল’। এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া— এই তিন বাল্টিক দেশজুড়ে ৫২০ কিলোমিটার লম্বা পথের দুধারে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে অবিচ্ছিন্ন মানবশৃঙ্খল গড়ে তুলে সোভিয়েত দখলদারির অবসান দাবি করেছিল হাজার হাজার মানুষ। উপরের ছবিতে তালিন-য়ের অধিবাসীদের গড়া মানবশৃঙ্খলের অংশ দেখা যাচ্ছে। তিনটি দেশের মানুষের বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সামনে সেইসব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিও এর বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের অনিবার্যতা সেইদিনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম ইউক্রেনে এর প্রভাবে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন নতুন প্রাণ পেয়েছিল।

১৯৮৮ সালে ইউক্রেনের ডোনেতস্ক-য়ের কয়লাখনির শ্রমিকদল। ১৯৮০-র দশক জুড়ে খনি শ্রমিকদের স্বাধীন আন্দোলন পূর্ব ইউক্রেনে সোভিয়েত শাসনের ভিত আলগা করে তুলেছিল।

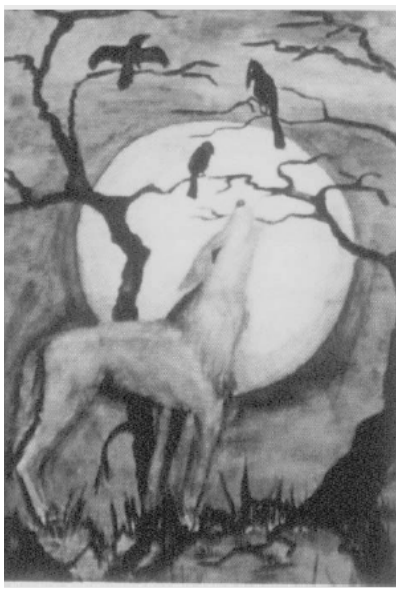

১৯৮৬-র চেরনোবিল পরমাণু বিপর্যয়ের স্মৃতিতে ইউক্রেনিয় শিল্পীর আঁকা ছবি।

১৯৩০-য়ের দশকে স্তালিন আমলের সোভিয়েত ইউক্রেনে ইউক্রেনিয়ার গ্রামীণ লোকগানের ভ্রাম্যমান গায়ক কোবজারি-দের জড়ো করে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়েছিল। কোবজারিরা তাঁদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র কোবজা বাজিয়ে গান করতেন পথে-ঘাটে হাটে-মেলায়। ইউক্রেনিয় ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধিকার আকাঙ্খীদের কাছে কোবজা হয়ে উঠেছিল ইউক্রেনিয় শিল্প-পরম্পরার অন্যতম প্রতীক। সোভিয়েত শাসন অবসানের পর ইউক্রেনে কোবজারিদের স্মৃতিতে কোবজাবাদনের নানা অনুষ্ঠান সংগঠিত হত। খারকিভ শহরে ২০০২ সালের তেমনই এক অনুষ্ঠানে একজন কোবজাবাদক কোবজা বাজাচ্ছেন।

প্রাক-সোভিয়েত ইউক্রেনের একটি ধর্মীয় লোকউৎসব হল 'ইভানা কুপালা'। সোভিয়েত আমলে তা নিষিদ্ধ করা হয়। সোভিয়েত ইউক্রেন ছেড়ে অন্যদেশে অভিবাসী হওয়া ইউক্রেনিয়দের মধ্যে এই লোকউৎসবের আচার টিকে ছিল। সোভিয়েত শাসনের অবসানের পর ইউক্রেনে পুনর্বার এই লোকউৎসব পালন শুরু হয়। ছবিতে কিয়েভের বাসিন্দাদের ২০০৮ সালে ইভানা কুপালা পালন করতে দেখা যাচ্ছে।

কিয়েভের ‘স্বাধীনতা ময়দানে’ কমলা বিপ্লবের গণজমায়েত। উপরের ছবিটি ২০০৪ সালের ২৪-শে নভেম্বরের এবং নিচের ছবিটি ওই সালেরই ২-রা ডিসেম্বরের। নিচের ছবিতে জমায়েত হওয়া মানুষের মাথার উপর কমলা বেলুনের রাশি।

ব্যবহৃত বইয়ের তালিকা

১. অ্যান অ্যাপেলবম; রেড ফেমিন: স্তালিনজ ওয়ার অন ইউক্রেন; অ্যালেন লেন; ২০১৭।

২. অ্যান অ্যাপেলবম; গুলাগ: এ হিস্ট্রি; অ্যালেন লেন; ২০০৩।

৩. আদ্রিয়ানা হেলবিগ, ওকসানা বুরানবায়েভা, ভানজা স্লাদিনিও; কালচার অ্যান্ড কাস্টমস অফ ইউক্রেন; গ্রিনউড প্রেস; ২০০৯।

৪. আলেকজান্ডার স্কিরদা; নেস্টর মাখনো: অ্যানার্কিজ কসাক, দি স্ট্রাগল ফর দি সোভিয়েতস ইন দি ইউক্রেন,১৯১৭-১৯২১; এ কে প্রেস; ২০০৪।

৫. আলেক্সেই মিলার; দি ইউক্রেনিয়ান কোয়েশ্চেন: দি রাশিয়ান এম্পায়ার অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি; সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০৩।

৬. এদিতা এম বোজানোওস্কা; নিকোলাই গোগোল: বিটুইন ইউক্রেনিয়ান অ্যান্ড রাশিয়ান ন্যাশনালিজম; হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০৭।

৭. জর্জ ও লিবের; সোভিয়েত ন্যাশনালিটি পলিসি, আরবান গ্রোথ অ্যান্ড আইডেনটিটি চেঞ্জ ইন দি ইউক্রেনিয়ান এস এস আর, ১৯২৩-১৯৩৪; কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৯২।

৮. জেফরি জে রসমান; ওয়ার্কার রেজিসটেন্স আন্ডার স্তালিন: ক্লাস অ্যান্ড রেভলুশন অন দি শপ ফ্লোর; হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০৫।

৯. জেহান এম ঘেইথ, ক্যাথেরিন আর জোলুক; গুলাগ ভয়েসেজ: ওরাল হিস্ট্রিজ অফ সোভিয়েত ইনকারসেরেশন অ্যান্ড এক্সাইল ; প্যালগ্রেভ; ২০১১।

১০. টিমোথি স্নাইডার; ব্লাডল্যান্ডস: ইউরোপ বিটুইন হিটলার অ্যান্ড স্তালিন; বেসিক বুকস; ২০১০।

১১. তারাস কুজিয়ো; ইউক্রেন: স্টেট অ্যান্ড নেশন বিল্ডিং; রুটলেজ; ১৯৯৮।

১২. নাতালিয়া কোনোনেঙ্কো; ইউক্রেনিয়ান মিনসট্রেলস...অ্যান্ড দি ব্লাইন্ড শ্যাল সিঙ; এম ই শার্প, নিউ ইয়র্ক; ১৯৯৮।

১৩. নেস্টর মাখনো; দি স্ট্রাগল এগেইনস্ট দি স্টেট অ্যান্ড আদার এসেজ; এ কে প্রেস; ১৯৯৬।
১৪. যোসেফ স্তালিন; ওয়ার্কস; ফরেন ল্যাঙগুয়েজেস পাবলিশিং হাউস; ১৯৫৪।
১৫. রবার্ট কঙকোয়েস্ট; দি হারভেস্ট অফ সরো: সোভিয়েত কালেক্টিভাইজেশন অ্যান্ড দি টেরর ফেমিন; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৮৬।
১৬. রোনাল্ড কোয়ালস্কি; দি রাশিয়ান রেভলুশন ১৯১৭-১৯২১; রুটলেজ; ১৯৯৭।
১৭. লেভ কোপেলেভ; টু বি প্রিজারভড ফরএভার (আনথনি অস্টিন দ্বারা ইউক্রেনিয় থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত); লিপিনকট, নিউ ইয়র্ক; ১৯৭৭।
১৮. লিন ভায়োলা; পিজান্ট রিবেলস আন্ডার স্তালিন: কালেক্টিভাইজেশন অ্যান্ড দি কালচার অফ পিজান্ট রেজিসটেন্স; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৯৬।
১৯. লিন ভায়োলা ও ভি পি দানিলভ সম্পাদিত; দি ওয়ার এগেইনস্ট দি পিজান্ট্রি, ১৯২৭-১৯৩০: দি ট্রাজেডি অফ দি সোভিয়েত কান্ট্রিসাইড (স্টিভেন শাবাদ কর্তৃক রুশ থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত); ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০৫।
২০. নিকোলাই গোগোল; তারাস বুলবা; ১৮৪২।
২১. পল কুবিচেক; দি হিস্ট্রি অফ ইউক্রেন; গ্রিনউড প্রেস; ২০০৮।
২২. ভালেনতিনা বোরিসেঙ্কো; এ ক্যান্ডেল ইন রিমেমব্রেন্স: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দি ইউক্রেনিয়ান জেনোসাইড অফ ১৯৩৩-১৯৩৪ (মার্ক তারনাওস্কি দ্বারা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত); ইউক্রেনিয়ান উওমেনস লিগ অফ আমেরিকা; ২০১০।
২৩. ভাসিলি গ্রসমান; এভরিথিঙ ফ্লোজ (রবার্ট চ্যান্ডলার, এলিজাবেথ চ্যান্ডলার, আন্না আসলানিয়ান কর্তৃক রুশ থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত); ভিনটেজ বুকস; ২০১১।
২৪. ভাসিলি গ্রসমান; এ রাইটার অ্যাট ওয়ার: ভাসিলি গ্রসমান উইথ দি রেড আর্মি (আনতনি বিভর ও লুবা ভিনোগ্রাদোভা দ্বারা সম্পাদিত ও ইংরেজিতে ভাষান্তরিত); দি হারভিল প্রেস, ২০০৫।
২৫. ভেরেনা ফ্রিৎজ; স্টেট বিল্ডিং: এ কমপারেটিভ স্টাডি অফ ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ অ্যান্ড রাশিয়া; সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০৭।
২৬. ভ্লাদিমির লেনিন; কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড-৩৩; প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো; ১৯৬৫।
২৭. মওরিন পেররি; দি কাল্ট অফ আইভান দি টেরিবল ইন স্তালিনজ রাশিয়া; প্যালগ্রেভ; ২০০১।
২৮. মার্ক ফেরো; দি গ্রেট ওয়ার, ১৯১৪-১৯১৮; রুটলেজ; ২০০২ সংস্করণ।

২৯. মিখাইল এ মোলচানভ; পলিটিকাল কালচার অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডেনটিটি ইন রাশিয়ান-ইউক্রেনিয়ান রিলেশনস; টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০২।
৩০. মিরোন দোলোত; একসিকিউশন বাই হাঙ্গার: দি হিডেন হোলোকাস্ট; ডাবলু ডাবলু নর্টন; ১৯৮৫।
৩১. সাইমন ফ্র্যাঙ্কলিন; রাইটিং, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার ইন আর্লি রুস, মি.৯৫০-১৩০০; কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০০২।
৩২. সেরহি প্লোখি; আনমেকিং ইমপেরিয়াল রাশিয়া: মিখাইলো হ্রুসেভস্কি অ্যান্ড দি রাইটিং অফ ইউক্রেনিয়ান হিস্ট্রি; ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো প্রেস; ২০০৫।
৩৩. সেরহি প্লোখি; দি কসাক মিথ: হিস্ট্রি অ্যান্ড নেশনহুড ইন দি এজ অফ এম্পায়ারস; কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১২।
৩৪. হেনরিক ক্রাসিনস্কি (কাউন্ট); দি কসাকস অফ ইউক্রেন; পার্টরিজ অ্যান্ড ওকি (লন্ডন); ১৮৪৮।

নির্ঘন্ট

অর্থনৈতিক সংকট (১৯৯০-য়ের দশক): ২৭৩-২৭৫;
অ্যান অ্যাপেলবম: ১২৬;
অ্যাপারাতচিক: ২৬৬, ২৬৭;
অস্বচ্ছ গোষ্ঠী (ওপেক গ্রুপ): ২৭০;

আইভান জিউবা ('আন্তর্জাতিকতাবাদ নাকি রুশিকরণ', ১৯৬৫): ২৩০-২৩১;
আইভান দ্রাখ: ২৪০;
আকটিভ: ১১৪;
আনাসতাসিয়া মাকসিমিভনা কুচেরুক (স্মৃতিকথন): ১২৮;
আন্দ্রি মেলনিক: ১৮৯;
আবলিয়াজিজ উমেরোভিচ রামজানোভ (স্মৃতিকথন): ২০৬-২১১;
'আমাদের ইউক্রেন' ('নাশা ইউক্রেন'): ২৮১;
আর্থার কোয়েসলার: ১৮৬;

ইউক্রেনিয়করণ (১৯২৩): ৮৪-৯১, ৯৫;
ইউক্রেনিয় কম্যুনিস্ট পার্টি: ৭৪, ১৭০-১৭১, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৯, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০, ২৬৩, ২৬৬;
ইউক্রেনিয় গির্জা সংগঠন: ২৪৪;
ইউক্রেনিয় ভাষা: প্রাচীন প্রোটো-ইউক্রেনিয় ভাষা: ৯, ২২, ২৩; মধ্য ইউক্রেনিয় ভাষা: ১৯, ৪১; ইউক্রেনিয় ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্র: ৫৮-৫৯, ৮৮-৯১, ২২৭, ২২৮-২২৯, ২৭৭-২৭৮; ইউক্রেনিয় ভাষার উপর রুশ আধিপত্য: ১৪-১৫, ২০, ৪৩-৪৫, ৫০-৬০, ১৬৯, ২২১; ভাষাসরণ: ৪২-৪৩, ১৭৯, ২২৭, ২৬০-২৬১; সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি: ২৪৯;
ইউক্রেনিয় ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন প্রয়াস: ২৩০-২৩৩, ২৩৯-২৪০, ২৪১-২৫০, ২৫২, ২৫৫-২৫৭, ২৭৫-২৭৮, ২৮০;
ইউক্রেনিয় জাতীয়তা: ৪৬-৫২, ৭০;
ইউক্রেনিয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত দমন অভিযান: ৯৫-৯৬, ১৬৫-১৬৯, ১৭৮, ১৮৮;
ইউক্রেনিয় জাতীয় কংগ্রেস (১৯৩৯): ১৮৮;
ইউক্রেনিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি: ২৬২;
ইউক্রেনিয় লেখক সংঘ: ২৪৪, ২৪৫;
ইউক্রেনিয় লোকশিল্প, লোকশিল্পী: ২৮, ৩৮, ৪০-৪১, ৮৯;
ইউক্রেনিয় সংস্কৃতি ও ইকোলজি সংঘ: ২৪২;

ইউক্রেনিয় সংবিধান (১৯৯৬): ২৭২;
ইউক্রেনিয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা (১৯৯০): ২৫৮;
ইউক্রেনিয় স্বাধীন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীদের সংঘ: ২৪২;
ইউক্রেনিয় হেলসিঙ্কি সংঘ: ২৪১, ২৪৫, ২৫৩, ২৬২;
'ইউক্রেনের ইতিহাস' (মিখাইলো হ্রুসেভস্কি প্রণীত): ২৫-২৭, ৪৬, ৪৯-৫২, ৮৭, ২৫৬;
ইউক্রেনের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের জন্য গণআন্দোলন: ২৪৪;
ইউক্রেনের জনসংখ্যা-ক্ষয় (১৯৪০-য়ের দশক): ২১৭;
ইউক্রেনের স্বাধীনতা ঘোষণা: ২৬৩;
ইউক্রেনের স্বাধীনতা প্রশ্নে গণভোট (১৯৯১): ২৬১;
ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো: ২৮০-২৮১, ২৮৫, ২৯০;
ইজরায়েল: ২০৫;
ইভান মাজেপা: ৩৮-৩৯, ৪৭;
ইভান কোটলিয়ারেভস্কি: ৪১;
ইলিয়া এহরেনবুর্গ: ২০০;
ইহুদি: ৩৬, ৬০, ১৮৫, ১৯০, ১৯৩, ২০১ ;
ইয়ারোস্লাভ: ১১;

ঈদ্দিস ভাষা: ৬০ ;

এন কে ভি ডি (সোভিয়েত গুপ্ত-পুলিশ): ১০৬, ১৭০;
এনস্যাটজগ্রুপেন (নাজি ঘাতক-বাহিনী): ১৯৩;
এমস ডিক্রি (১৮৮৬): ৪৩ ;
এস্তোনিয়া: ১৮৬, ২৩৪, ২৫১;
এস পি পি ইউ (ইউক্রেনের শিল্পপতি ও শিল্পোদ্যোগীদের জোট): ২৭০;

ও ইউ এন (অর্গানাইজেশন অফ ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনালিস্টস): ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২০২;
ও জি পি ইউ (সোভিয়েত গুপ্ত-পুলিশ): ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১৩১, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৭, ১৬২, ১৬৭, ১৭৬;
ওডেসা: ৮০;
ওলগা মেন (হোলোদোমোরের সময়কার সন্তানখাদক মায়েদের সাক্ষাৎকার): ১৩০;
ওলহা সিমবালিউক (স্মৃতিকথন): ১২৩;
ওলেস হোনচার: ২৩১-২৩২ ('দি ক্যাথিড্রাল' উপন্যাস), ২৩৯;

কনস্তানতিনোপল: ১০;
কমলা বিপ্লব: ২৮১, ২৮২-২৯০;
কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস: ২৬৪;
কসাক: ২৭-৪০, ৪৬;
কসাক হোস্ত : ৩৩;
কাগানোভিচ: ৯৫;
কার্বোভানেট (কুপন): ২৭০;
কাপিটন ভাসিলিয়েভিচ ক্লেপিকভ (বিদ্রোহী রুশ শ্রমিক, কবি): ১৮০-১৮৪;
কিয়েভ: শহর পত্তনের অতিকথা: ৯; ৩৬, খ্রেসচাতিক সরণিতে ১৯১৭-র জমায়েত: ৫৫; ৬৯, ৭৪, ১৭২, ১৯৩, ২৩৬, ২৪২, ২৪৫, ২৫৪, ২৮৩, ২৮৯;

কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়: ৮৬, ৮৮, ২৪৩;
কিয়েভ-মোহিলা আকাদেমি: ২৪৩;
কিয়েভ তারাস শেভচেঙ্কো ১ নং লেবার স্কুল: ৮৯;
কিয়েভিয় রুস: ১০-১২, -য়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ: ১০, ২৭; -য়ের উপর মঙ্গোল হানা: ১২, ১৮, ২৩, ২৪, ২৬; -য়ের ইতিহাস বিতর্ক: ১৩-২৬, ১৮৭, ২৪২;
কিরিলো শোপিন: ১১৭;
কুরেন: ২৯, ৩১;
কুলাক (সংজ্ঞা): ৯৭-৯৮;
কুলাক-নিশ্চিহ্নকরণ/ নিকুলাকীকরণ (dekulakization): ৯৫, ৯৭, ৯৮-১০৬, ১৩৩-১৪০;
কুচমাগেট: ২৭৯;
'কোজলি': ২৮২;
কৃষক প্রতিরোধ-আন্দোলন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে: ৫৪-৫৫; নিকুলাকীকরণ ও রাষ্ট্রীয় খামার (কোলখোজ) গঠনের বিরুদ্ধে: ১০৭-১১৯, ২১৫;
কৃষকদের কাছ থেকে ফসল অধিগ্রহণ, ১৯১৯-১৯২১: ৭৪-৭৭;
কোবজা, কোবজার, কোবজারি: ৪১, ১০৫-১০৬;
কোবজার হত্যা: ১০৬;
কোমসোমল: ৮৯, ৯৭, ১২০, ১২২, ১৪৪, ১৬৪;
কোমেনজামি: ৭৫;
কোস: ৩১;
ক্রিমিয়া: ৮০, ১৯১, ২০৬, ২৭১;
ক্রুশ্চেভ: ২০১, ২১৮, ২২৫-২২৮;
ক্রেভো ঐক্যচুক্তি, ১৩৮৫: ৩২;
ক্লিউচেভস্কি, 'রুশ ইতিহাসের ধারা': ২৬;
ক্ষমতার পার্টি (পার্টি অফ পাওয়ার): ২৬৭, ২৬৯, ২৭০;
কাঁচি সংকট (অর্থনৈতিক 'সিজার ক্রাইসিস'): ৯৩-৯৪;

খারকিভ: ৫৫, ৮৮, ১৭২;
খারকিভ লিপিবিধি: ৮৮;

গণতান্ত্রিক মঞ্চ: ২৫৪, ২৫৮, ২৬০;
গালিসিয়া: ২৬১;
গালিসিয়া-ভোলহিনিয়া রাজতন্ত্র: ৩২;
গুলয়াই-পোল্যি: ৬৬;
গুলাগ/ লেবার ক্যাম্প: ১২২, ১৬৭, ১৭০, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ২০৬-২১১, ২১২-২১৪, ২২১, ২২৫, ২২৭;
গুলাগে বন্দিদের প্রতিরোধ: ২১৩-২১৪;
গ্রিন ওয়ার্ল্ড: ২৪৫;
গ্লাসনস্ত : ২৩৩;

চেকা (বলশেভিক গুপ্তপুলিশ): ৭৪, ৭৭;
চেরনোবিল পরমাণু বিপর্যয়: ২৩৫, ২৩৬-২৪০;
চেরনোভা রুটা (লাল বিলাপ): ২৫৫;

জর্জিয়া: ২৪৬;
জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট: ৮৫;
জাপোরোজীয় কসাক: ৩১, ৪০;
জার পিটার ১: ৩৯;
জার নিকোলাস ২: ৫৫;
জারিনা ক্যাথরিন ২: ৪০;
জার্মান নাজি বাহিনী: ১৮৯;

জি পি ইউ (সোভিয়েত গুপ্তপুলিশ): ৯২;
জোরিভ চুক্তি, ১৬৪৯: ৩৭;

ট্রটস্কি: ৯৫;

ডনবাস: ৫৯, ১৭২;
ডিরেক্টরি: ৬৮-৬৯;
ডেমোক্রাটিজাতসিয়া: ২৩৩;
ডোনেৎস্ক: ৫৯;

তাতার: ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪-৩৫; -দের গণ-নির্বাসন: ২০৫-২০৭, ২২৬;
তারাস কুরচিক: ২৫৫;
তারাস শেভচেঙ্কো: ৪৭-৪৮, ৮৯-৯০, ১০৬, ২২১;
তারাস শেভচেঙ্কো ইউক্রেনিয় ভাষা সমাজ: ২৪৪;
তেতিয়ানা পাভলিচকা (স্মৃতিকথন): ১২৭;
তোভারিস্তভো লেভা (সিংহ সমাজ): ২৪২;
ত্রোইকা: ৯৮, ১৩৪, ১৪১;

দাঝবোহ: ২৩২;
দুর্ভিক্ষ: ১৯২১: ৭৮-৮১; ১৯২৮-১৯২৯: ৯৬; ১৯৪৬: ২১৬;
দেরঝাভা: ২৬৮;

নয়া অর্থনৈতিক কৌশল (NEP): ৮২-৮৪;
'নয়া ইউক্রেন' সংযুক্ত মঞ্চ: ২৬৬;
নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প: ১৩২;
নাজি দখলে ইউক্রেন: ১৯২-২০২;
নাজি দখলের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে প্রতিরোধ: ২০২;
নাজি পরিকল্পনা (ইউক্রেন বিষয়ে): ১৯১-১৯২;
নাদিয়া মালিসকো (স্মৃতিকথন): ১২৭;
নিকোলাই গোগোল: জন্মদিনপালন, ১৮৫০: ১৩-১৪; ২০, তারাস বুলবা: ২৮-৩০, ৩৩;
নিস্তালিনিকরণ: ২০১, ২২৫-২২৬;
নেস্তর মাখনো: ৬৬-৬৮, ৭০, ৭৩;
ন্যাশনালিতে, ন্যাশনালিটি, নারোদ-নোস্ত : ১৫-১৬;

পদকুলাচনিকি: ৯৮;
পরিবার আইন: ১৯৩৬: ২১৭; ১৯৪১: ২১৮; ১৯৪৪: ২১৮-২১৯;
পাভলো স্কোরোপাদস্কি: ৬৬;
পার্টিজান বাহিনী: ১১১;
পাশা আঞ্জেলিনা (স্মৃতিকথন): ১১১;
পিটার্সবুর্গ/ পেত্রোগ্রাদ: ৫৪;
পিতিরিম সোরোকিন (স্মৃতিকথন): ১২৯;
পুতিন: ২৮৩;
পেট্রো হ্রিহোরেঙ্কো (স্মৃতিকথন): ৮৮, ১০৮-১০৯;
পেত্রো সেলেস্ত : ২২৯;
পেরেইয়াস্লাভ চুক্তি, ১৬৫৪: ৩৭;
পেরেসত্রোইকা: ২৩৩, ২৪৪;
পোল আধিপত্য: ৩২-৩৪;
পোল-ইউক্রেন সংঘাত, ১৯১৮: ৬১;
পোল-কসাক সংঘাত: ৩৫-৩৭;
পোল রাজতন্ত্র: ৩২;
পোল্যান্ড: ১৮৬, ১৮৯, ১৯০;
'পোরা' ছাত্রসংগঠন: ২৮৭;

প্লুহ (লাঙল): ৮৭;
পঁচিশ হাজারি শ্রমিকদল: ৯৯, ১০৩;
ফিনল্যান্ড: ১৮৬;
ফেলিক্স আর্কাদিয়েভিচ সেরেব্রভ (স্মৃতিকথন): ২১৫;

বরিস ইয়েলতসিন: ২৬৪;
বলশেভিকদের ক্ষমতাদখল: ৫৮, ৬১-৬২, ৬৪, ৭১-৭৪;
বলশেভিক মতবাদ: ৬২-৬৪, ৮৫, ১৬২-১৬৫ (সর্বাত্মকতাবাদী রূপ), ২২২-২২৪ (উৎপাদন অতিকথা);
বলশেভিক মতবাদে কৃষকদের স্তরভেদ: ৭৫
বানদুরা: ৮৯, ১০৫;
বারোক ঘরানার সাহিত্য: ৪১;
বাল্টিক দেশের সোভিয়েত শাসন বিরোধী আন্দোলন: ২৩৪-২৩৫, ২৪৬, ২৫১-২৫২;
বাল্টিক (মানব)শৃঙ্খল: ২৫২;
বাবস্কি বান্টি ('মাগীদের দাঙ্গা'): ১১৪-১১৫;
বাবি ইয়ার (নাজিদের করা ইহুদি গণহত্যা): ১৯৩;
বিশ্বযুদ্ধ: প্রথম: ৫৩, ৬৮; দ্বিতীয়: ১৯০-২০৪;
বিশ্বযুদ্ধ (দ্বিতীয়) পরবর্তী সোভি-য়েতের ইউক্রেন পুনর্দখল: ২০৪;
বেরদিচেভের ইহুদি গণহত্যা: ১৯৫-২০০;
বেরলোভিচ (স্মৃতিকথন): ১০৯;
বেলারুশ: ১৮৬, ১৮৭;
বুখারিন: ৯৫;
বোহদান খেমেলনিতস্কি: ৩২, ৩৫-৩৭, ২৭২;
ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস সিরিল অ্যান্ড মেথোডিয়স: ৪৭;
ব্রেজনেভ: ২২৮-২২৯;
ব্রেস্ত লিতভস্ক চুক্তি: ৬৬;

ভসেভোলোদ বেলিয়াতস্কি: ৯২-৯৩, ১১৮;
ভাইকিং: ১০;
ভাখিল সোকিল: ১৭৫;
ভালেনতিন মোরোজ: ২৩২;
ভাসিলি গ্রসমান: ১৩২; 'এভরিথিঙ ফ্লোজ' উপন্যাসের অংশ: ১৩৩-১৬১; ইহুদি গণহত্যার বর্ণনা: ১৯৩-২০০; স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিবেদন: ২০৩-২০৪;
ভি আই পিচেতা: ১৮৭;
ভিক্তর ইউসচেঙ্কো: ২৭৫, ২৮১-২৮৫, ২৮৭, ২৮৯-২৯০;
ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ: ২৮২, ২৮৩, ২৮৯, ২৯০;
ভিতালি মাসোল: ২৬০;
ভিতোল্ড ফোকিন: ২৬০;
ভিয়াদচেস্লাভ চেরনোভিল: ২৫৩;
ভুখা হরতাল (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের, ১৯৯১): ২৬২;
ভোরকুটা শিবিরের বন্দির স্মৃতিকথন: ২১৪;
ভোলোদিমির: ১১;
ভোলোদিমির ইভাশকো: ২৪৯;
ভোলোদিমির ইভায়িসুক: ২৫৫;
ভোলোদিমির ফিলেঙ্কো: ২৬৬;

ভোলোদিমির সেচেরবিতস্কি: ২৩৭, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৯;
ভোলোদিমির হ্রিনভ (সংসদে ভাষণ): ২৬৩;

মলোটভ: ৮০, ১২১;
মলোটভ-রিবেনট্রপ বোঝাপড়া (হিটলার-স্তালিন চুক্তি), ১৯৩৯: ১৮৫-১৮৬, ২৩৪,২৫২;
ময়দান আন্দোলন, ১৯৯০: ২৫৯-২৬০;
মস্কো ক্যু, ১৯ আগস্ট ১৯৯১: ২৬২;
মার্কস, লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার: ৬২-৬৩;
মাখনোভিস্ট আন্দোলন: ৬৮-৬৯;
মিকোলা প্যাট্রিনচুক (স্মৃতিকথন): ১২৪;
মিকোলা কোস্তোমারভ: ৪৭;
মিখাইল গোর্বাচেভ: ২৩৩,২৪২, ২৬১;
মিখাইলো হ্রুসেভস্কি: ১৯-২৬, ২৭, ৪৯-৫২, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ৮৬-৮৭, ৯০-৯১, ১৬৬-১৬৭, ২৪২, ২৫৬, ২৬৮;
মিরোন দোলোত (স্মৃতিকথন): ৯৯, ১০৩, ১১৩-১১৪;
মিসচেঙ্কো (স্মৃতিকথন): ১২৮;
মেনশেভিক লিফলেট: ৭১;
মেনোরাহ (স্মৃতিসৌধ): ২০১;
মোলদোভা: ২৫১;
ম্যাক্সিম গোর্কি: ৭৯, ১৩২;

যুদ্ধ-সাম্যবাদ: ৮২;
যাগোদা (ও জি পি ইউ কর্তা): ১০২;

রবিবারের স্কুল: ৪৯;
'রাজম নাস বোহাতো' ('একসঙ্গে আমরা অনেক' গান): ২৮৭;
রাদিয়ানস্কি স্ট্যাটিস্টিক: ১৭৫;
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: ১৯৯১: ২৬৪; ১৯৯৪: ২৭০-২৭১; ১৯৯৯: ২৭৫; ২০০৪: ২৮৪-২৮৫; ২০০৫: ২৮৯-২৯০;
রাষ্ট্রীয় সমবায় খামার (কোলখোজ): ৯৭, ১৭৩, ২১৪-২১৫, ২২৮; –সংক্রান্ত সোভিয়েত ডিক্রি, ১৯৩২: ১২১;
রুখ: ২৪৫, ২৪৬, প্রথম অধিবেশন: ২৪৬-২৪৭, ২৫৩-২৫৫, ২৫৮-২৬০, ২৬৭;
রুশ জাতিদম্ভ: ১৩, ১৮৬;
রুশ জাতীয়তাবাদ: ১৬-১৭;
রুশ জারতন্ত্র: ১৩, ১৭, ৪২-৪৩, ৫৩-৫৪;
রোমানিয়া: ১৮৬;

ল্ভিভ: ১৯১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৫২, ২৫৩;
লাতভিয়া: ১৮৬, ২৩৪, ২৫১;
লাবলিন ঐক্যচুক্তি, ১৫৬৮: ৩২;
লারিসা ভেনঝিক (স্মৃতিকথন): ১২৯-১৩০;
লালফৌজ: ৬৫, ৬৯, ৭৪, ৭৭, ৯২, ১২০, ১৬২, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ২০৩-২০৪, ২২৭-২২৮;
লিওনিদ কুচমা: ২৭১, ২৭৫, ২৮১, ২৮২, ২৮৯;
লিওনিদ ক্রাভচুক: ২৪৬, ২৫০, ২৫৮, ২৬১, ২৬৪, ২৬৮;
লিথুয়ানিয় রাজতন্ত্র: ৩২;
লিথুয়ানিয়া: ১৮৬, ২৩৪, ২৫১;
লেনিন: ৬২, ৬৩, ৬৫, ৮০-৮২, ৮৪, ২৩০, ২৭২;
লেভ কোপেলেভ: ১০৩, ১২৩;

লেভকো লুকিয়ানেঙ্কো: ২৪১;

শিল্পায়ন: ৫৯, ১৭৬, ১৭৮; -সংক্রান্ত সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৭২-১৭৩; -য়ের ভাষা-সংস্কৃতি ও নগরায়নের উপর প্রভাব: ১৭৪;
শিস্তদেসিয়াতনিকি (ষাটের প্রজন্ম): ২৩০;
শ্রমিক ধর্মঘট ও প্রতিরোধ: ১৯৩২: ১৭৬-১৭৮; ডনবাস ১৯৮৯: ২৪৭-২৪৯; ২৫৪-২৫৫;

সন্তানোৎপাদনের জন্য নারীগর্ভ দখল, ১৯৪৫-১৯৫৫: ২১৯-২২১;
সর্ব-স্লাভবাদ: ১৬
সর্ব-ইউক্রেনিয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৯১৭: ৫৬-৫৭;
সাইমন পেটলিউরা: ৬৮;
সাজুদিস (লিথুয়ানিয় পপুলার ফ্রন্ট): ২৫১;
সামভিদাভ/ সামিজদাত: ২৩০;
সামিলো ভেলিচকো: ৪১;
সামোভিদেত: ৪১;
সিচ: ৩১-৩২;
সুইডেন: ২৩৮;
সেন্ট্রাল রাদা: ৫৬-৫৮, ৬১;
সেগেঁই ওর্দঝোনিকিদজে: ৬৫;
সেগেঁই কিরভ: ১৬৯;
সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘ: ১৬৬, ২৩৯;
স্ট্যাটিস্টিকা ইউক্রেনি: ১৭৫;
স্তানিস্লাভ হুরেঙ্কো: ২৬৩;
স্তালিন: ৬২, ৯৫, ১০২, 'সাফল্যে মাথা ঘুরে যাওয়া'- ১১২, ১২০, ১২১, ১৩২, ১৪৯, ১৬২, ১৬৯, ১৭১, ১৮৫, ১৮৮, ২০০, ২১৯, মৃত্যু-২২৫;
স্তালিন-শাসনে বিভিন্ন জনজাতির গণনির্বাসন: ২১১-২১২, ২২৬;
স্তেপান বান্দেরা: ১৮৯, ১৯০;
স্পেতসফুন্ডি: ২৫৬;

হাঙ্গেরি: ২২৭-২২৮;
হিওরহি গঙগাদজো: ২৭৯;
হিটলার: ১৮৫;
হিমলার: ১৯২;
হেটমান: ৩২;
হেটমানরাজ: ৩৭;
হেড্রিচ: ১৯২;
হেলসিঙ্কি বোঝাপড়া: ২৩২;
হোলোদোমোর (অভুক্ত রেখে গণহত্যা, ১৯৩২-১৯৩৪): ১২০-১৩১, ১৪১-১৬১; -য়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান: ১৩১;
হ্রিনজহোলি: ২৮৭;
হ্রিভনিয়া: ২৭১;
হ্রিহরি কির্তকা-ওস্নোভিয়ানেঙ্কো: ৪২;
হ্রিহোরি সিমিয়া (স্মৃতিকথন): ১২৮;
হ্রিহোরি স্কোভোরোদা: ৪১;
'হ্রোমাদা' ছাত্রসংগঠন: ২৪৩;
হ্লাফিরা ইভানোভা (স্মৃতিকথন): ১২৭।